কাজী আবদুল ওদুদ

শাশ্বত বঙ্গ

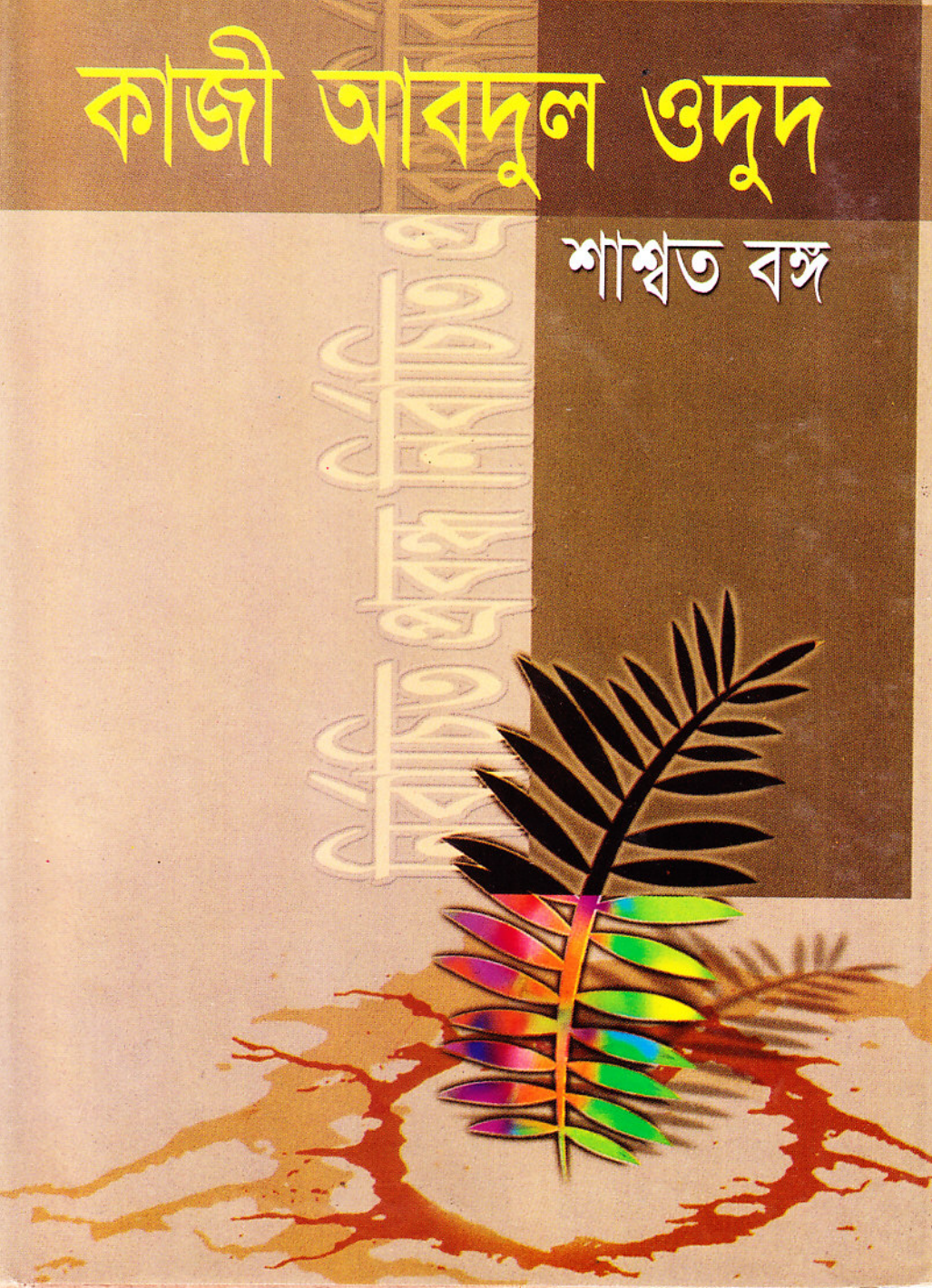

নির্বাচিত প্রবন্ধ

(শাশ্বত বঙ্গ)

কাজী আবদুল ওদুদ

ভূমিকা : রুহুল আমিন বাবুল

বই পড়তে যে ভালবাসে তাঁর শত্রু কম।

—চার্লস ল্যাম্ব :

দি স্কাই পাবলিশার্স

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সিঙ্গাপুর পরিবেশক ॥ শহীদ ট্রাভেল্‌স অ্যান্ড ট্যুরস প্রাঃ লিঃ
১৮১ কিচেনার রোড, ০১-১২/১৩ নিউ পার্ক হোটেল শপিং আর্কেড, সিঙ্গাপুর ২০৮৫৩৩
উত্তর আমেরিকায় পরিবেশক ॥ মুক্তধারা জ্যাকশন হাইট, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্য পরিবেশক ॥ সঙ্গীতা লিমিটেড ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
FAX : 020 72475941

প্রকাশকাল : বইমেলা ২০১২

প্রকাশক : মো: মিজানুর রহমান, দি স্কাই পাবলিশার্স, ৩৮/২ক বাংলাবাজার
(মান্নান মার্কেট, ৩য় তলা) ঢাকা ১১০০
অক্ষরবিন্যাস : কমপিউটার ল্যান্ড, ৪৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস ৩৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা ১১০০
প্রচ্ছদ : মোবারক হোসেন লিটন
সেল : ০১৭১৪৩৯১০৯০, ০১৯২৫৭৬০৭৬৬, ০১৬৭০৭৩৫৮০৮, ০২৭১১১৯৭৯

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র

ISBN 984-826-172-9

সূচিপত্র

নিবেদন	১১
ভূমিকা	১৩
কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ	১৫
রস ও ব্যক্তিত্ব	২৩
ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি	২৮
সংস্কৃতির কথা	৩৩
কোরআনের আল্লাহ	৪০
ইকবাল	৪৩
রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ	৫১
বিষাদসিন্ধু	৫৫
নজরুল ইসলাম	৫৮
মুসলমানের পরিচয়	৭০
ব্যর্থতার প্রতিকার	৮৫
রামমোহন রায়	৯৮
গ্যেটে	১২০
বাংলার জাগরণ	১৩৪
সম্মোহিত মুসলমান	১৪৭
শতবর্ষ পরে রামমোহন	১৫৪
জীবনপঞ্জি	১৫৯

নিবেদন

'শাশ্বত বঙ্গের অনেকগুলো লেখা পূর্বে বেরিয়েছিল এইসব বইতেঃ নবপর্যায় (১৩৩৩ সাল), রবীন্দ্রকাব্যপাঠ (১৩৩৪ সাল), নব-পর্যায় দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৩৬ সাল), সমাজ ও সাহিত্য (১৩৪১ সাল), হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ (১৩৪৩ সাল), আজকার কথা (১৩৪৮ সাল), নজরুল-প্রতিভা (১৩৫৫ সাল)। সূচীপত্রে সে-সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ দেখতে পাওয়া যাবে। এর প্রথম ৭৯ পৃষ্ঠার লেখাগুলো এর পূর্বে বই আকারে বেরোয়নি, তবে তার অল্প কয়েকটি দিয়ে কয়েক মাস পূর্বে 'স্বাধীনতা-দিনের উপহার' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এর শেষের দিকের 'গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ' লেখাটিও পূর্বে কোনো বইতে প্রকাশ করা হয়নি। দেশ-বিভাগের পরের লেখাগুলো বইয়ের প্রথম দিকে দেখতে পাওয়া যাবে।

এর অন্তর্ভুক্ত 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্ব-ভারতীতে প্রদত্ত নিজাম-বক্তৃতা-স্বত্বাধিকার বিশ্বভারতীর। এটি শাশ্বত-বঙ্গে প্রকাশের অনুমতি দিয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ লেখককে অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। 'রস ও ব্যক্তিত্ব' লেখাটি এর অন্তর্ভুক্ত দিয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিও-র কর্তৃপক্ষও তুল্যরূপে লেখকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

১৩৩২ সালে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের সূচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' নামে একটি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়, তার মূলমন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি'। কয়েকজন মুসলমান অধ্যাপকের উপরে ন্যস্ত হয়েছিল এর পরিচালনার ভার—শাশ্বত বঙ্গের লেখক তাঁদের অন্যতম। বুদ্ধির মুক্তি, অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগ্য থেকে মুক্ত দান বাংলার মুসলমান সমাজে (হয়ত বা ভারতের মুসলমান সমাজে) এ ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। কিন্তু সেদিনে বিস্ময়কর হয়েছিল বাংলার শিক্ষিত মুসলিম তরুণের উপরে এর প্রভাব—একটি জিজ্ঞাসু ও সহৃদয়-গোষ্ঠীর সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছিল এর দ্বারা। দৃশ্যত এর প্রেরণা এসেছিল মুস্তফা কামালের উদ্যম থেকে, কিন্তু তারও চাইতে গূঢ়তর যোগ এর ছিল বাংলার বা ভারতের একালের জাগরণের সঙ্গে আর সেই সূত্রে মানুষের প্রায় সর্বকালের উদার জাগরণ-প্রয়াসের সঙ্গে। শাশ্বত বঙ্গের অনেক লেখায় রয়েছে সেই স্মরণীয় দিনগুলির স্বাক্ষর, বিশেষ করে 'বুদ্ধির মুক্তি' আর তার আনুষঙ্গিক 'ব্যাপক মানব-হিত' মানুষের সভ্য জীবনের এই মহাপ্রয়োজনের

কষ্টিপাথরে বারবার সেসবে যাচাইয়ের চেষ্ট হয়েছে বাংলার ও ভারতের একালের জাগরণের মূল্য ও মর্যাদা, আর বারবার আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয়েছে দেশের শিক্ষিত-সমাজের অনবধানতার জন্য সেই অমূল্য প্রচেষ্টার বিড়ম্বনা-ভোগের সম্ভাবনা সম্বন্ধে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই আশঙ্কিত বিড়ম্বনা-ভোগ এড়িয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। দেশের একালের জাগরণের এক পরিণতিরূপেই আমাদের লাভ হলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা, কিন্তু সেই স্বাধীনতা-লাভের পুণ্যক্ষণে দেশের (ভারতবর্ষে ও পাকিস্তানের) অগণিত লোকে যে আত্মিক অপঘাত ঘটলো তাতে সেই অশেষপ্রতিশ্রুতিপূর্ণ স্বাধীনতাও আজো হয়ে আছে রাহুগ্রস্ত।

তবে এমন লাঞ্ছনা শুধু আমাদের দেশের ভাগ্যেই ঘটেনি, বৃহত্তর জগতেও কোলে চলেছে এক অদ্ভুত বিপর্যয়, যার ফলে দেশে দেশে ব্যাপক প্রবণতা জেগেছে কঠিন অপ্রেম আর সংঘর্ষের দিকে; একালের বুদ্ধিজীবীদেরও অনেকের পক্ষপাত সংঘবদ্ধতা, অধিকার-ঘোষণা, আর প্রচারবহুলতার দিকেই–বিচার, প্রেমপ্রীতি, আত্মবিকাশ, এসব আজ তাঁদের চোখে অনেকখানি অবিশ্বাস্য চিন্তাধারা।

এই পরিবেশে 'বুদ্ধির মুক্তি'র কথা সমাদৃত হবে সে-সম্ভাবনা অল্প। আজ বরং মুষ্টিমেয়ের বুকে অনির্বাণ থাকুক এই প্রত্যয় যে তাইই মানুষের জন্য পথ, চিরন্তন ধর্ম, যা পূর্ণরূপে সত্যাশ্রয়ী আর সবার জন্য কল্যাণবাহী,–আর সব বড়জোর আপদ্ধর্ম, অন্য কথায়, বিপথ। মানুষ অপ্রেম চিন্তার আবিলতা থেকে রক্ষা পাক, এই হোক আজ প্রত্যেক দায়িত্ববোধসম্পন্ন নর ও নারীর অন্তরতম প্রার্থনা।

অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮

ভূমিকা

কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪—১৯৭০) প্রথম জীবনে উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্য জীবনে প্রবেশ করলেও যুক্তিধর্মী প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। 'শাশতবঙ্গ' (১৯৫১) তাঁর বিখ্যাত গদ্য রচনা-গ্রন্থ। তাঁর জন্ম ফরিদপুর জেলার বাগমারা গ্রামে। তিনি ১৯১৩ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৯১৫ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই.এ ও ১৯১৭ সালে বি.এ পাস করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ পাস করেন ১৯১৯ সালে। ১৯২০ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে তিনি বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দীর্ঘদিন অধ্যাপনার পর তিনি কলকাতায় বদলি হন এবং সেখানে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের অধীনে টেক্স বুকস কমিটির সম্পাদকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনকল্পে ১৯২৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্যতম স্তম্ভ ও নেতা। এই সংগঠনের পত্রিকা 'শিখা'য় (১৯২৭) তাঁর মুক্তচিন্তা ও যুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন লেখার জন্যে ঢাকার নবাব পরিবার কর্তৃক নিগৃহীত হয়ে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করেন কলকাতায়। রাজা রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জার্মান কবি গ্যেটেকে তাঁর জীবন চেতনার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁদের জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, অনুশীলন ও অনুসরণ এবং সেই সঙ্গে বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজে মুক্তচিন্তা ও অসাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণা জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর 'শাশতবঙ্গ' গ্রন্থের বিভিন্ন রচনায় এসব চিন্তাচেতনার প্রতিফলন ঘটেছে।

জীবনের প্রাথমিক পর্বে মুক্তচিন্তার অধিকারী কাজী আবদুল ওদুদের সাহিত্যিক আদর্শ ছিলেন গ্যেটে, যাঁর কাব্যের ধ্রুপদী আদর্শ, গম্ভীর ভাবমূলক রচনাকৌশল, শুভবোধ, মনন ও বিশ্বাত্মাচেতনা তাঁকে প্রগাঢ়রূপে আকৃষ্ট করেছিল। পরবর্তী সময়ে তাঁর সাহিত্য-প্রেরণা ছিল রবীন্দ্র-কাব্যজগৎ। রবীন্দ্র-জীবনদর্শন তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কবি গুরুর জীবন ছিল তাঁর কাছে পরম আকর্ষণের বস্তু, রবীন্দ্র-কাব্য ছিল তাঁর প্রাণের শান্তি, মনের আরাম। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দুই বাংলা এবং দুই বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে যে ব্যাপক সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়নি, তার নিশ্চিত সমাধান-সূত্র নিহিত রয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্যদর্শনে। 'শাশতবঙ্গ'সহ তাঁর অনেক রচনায় এ চেতনা জমাট বেঁধে আছে।

কাজী আবদুল ওদুদ রচিত প্রবন্ধাবলির বিষয় ছিল গভীর ও গম্ভীর, ভাষা ও তদনুসারী। যুক্তিতন্ময়তা, রচনাশৈলীর মনোরম ভঙ্গিমা, ভাষার সাধু আকর্ষণীয়তায় তার প্রবন্ধগুলো পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং সেই সঙ্গেই রসিকচিত্তে আনে পাঠ্যান্তের পরম তৃপ্তি। বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর যে নিবিড় পরিচয়

ছিল, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁর প্রবন্ধগুলো। কেবল বাংলার সাহিত্য বা সংস্কৃতিই নয়, বিদেশি সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও ছিল তাঁর সমান পাণ্ডিত্য, যার ফলে উভয় ধারার সাহিত্য ও সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তিনি বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরেছেন পাঠক সমীপে, এখানেই কাজী আবদুল ওদুদের কৃতিত্ব সর্বাধিক। এই কৃতিত্বের একটা বড় অংশের দাবিদার তাঁর 'শাশতবঙ্গ' গ্রন্থখানি।

'নদীবক্ষে' (১৯১৮) কাজী আবদুল ওদুদের বিখ্যাত উপন্যাস ও ছোটগল্পগ্রন্থ 'মীর পরিবার' (১৯১৮)। রবীন্দ্রকাব্য পাঠ (১৯২৭), নবপর্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড (১৯২৯), সমাজ ও সাহিত্য (১৯৩৪), হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ (১৯৩৬), আজকার কথা (১৯৪১), কবিগুরু গ্যেটে (১৯৪৬), শাশতবঙ্গ (১৯৫১), স্বাধীনতা দানের উপহার (১৯৫১), কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ-প্রথম খণ্ড (১৯৫৫), বাংলার জাগরণ (১৯৫৬), হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম (১৯৬৬), কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ-দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬৯) প্রভৃতি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। তাঁর সম্পাদিত 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' একখানি জনপ্রিয় বাংলা অভিধান।

উনিশ শতকে বাংলায় যে নবজাগরণ সূচিত হয়েছিল তার যথার্থ মূল্যায়ণ পাওয়া যায় কাজী আবদুল ওদুদের প্রবন্ধে। 'বাংলার জাগরণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত হয়েছে এভাবে—'তারপর রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তার যে রূপ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্কীর্ণতা ভেঙে তাকে বৃহত্তর করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু তাঁর আদর্শের অনুপ্রেরণা এ পর্যন্ত বাংলার জাতীয় জীবনে কমই অনুভূত হয়েছে। এখন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়ত্বের আদর্শই দেশের জনসাধারণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে, বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কবি, তাও আবার সূক্ষ্ম-শিল্পী গীতিকবি, তাই যে মহামানবতার গান তিনি গেয়েছেন আমাদের দেশের স্থূল-প্রকৃতি জনসাধারণের জীবনে কত দিকে তার স্পন্দন জাগবে তা ভেবে পাওয়া দুষ্কর।

সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন কাজী আবদুল ওদুদ। মানবতার উপাসক ছিলেন তিনি, কোনো রকমের ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি তাঁর মধ্যে ছিল না। বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্য রচয়িতাদের সঙ্গে তাঁর ছিল হার্দিক সম্পর্ক। বিশ শতকে ঢাকায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি একজন সজাগ বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও লেখক হিসেবে সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে নিজের প্রজ্ঞা এবং সংবেদনশীলতাকে সক্রিয় রেখেছিলেন। তাঁর গদ্য রচনা প্রাঞ্জল ও বিশ্লেষণধর্মী। মুক্ত বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতার ছাপ তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় বিদ্যমান। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর 'শাশতবঙ্গ' গ্রন্থখানি অনন্য।

রুহুল আমিন বাবুল
বি.এ (অনার্স), এম.এ.
বাংলাভাষা ও সাহিত্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা
১ জুলাই ২০০৯

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ

কালিদাসপ্রীতি রবীন্দ্রনাথ লাভ করেছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মচরিতে' কালিদাসের ভাষা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছে, বিশেষ করে যেখানে তিনি হিমালয়ের শোভা-সৌন্দর্যের বর্ণনার চেষ্টা করেছেন।

মহর্ষির কালিদাসপ্রীতি তাঁর বিখ্যাত পুত্রদের প্রায় প্রত্যেকেই সংক্রামিত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শকুন্তলার অনুবাদ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করে' রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছেন, আর নবমেঘোদয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের সানুরাগ 'মেঘদূত'-আবৃত্তি কিশোর-রবীন্দ্রনাথের চিত্ত যে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকরা তা জানেন।

কিন্তু প্রতিভার স্বধর্ম স্বীকরণ-অনুকরণ নয়। রবীন্দ্রনাথের গভীর কালিদাসপ্রীতিতে তাঁর সেই স্বীকরণ-বৃত্তি কার্যকরী হয়েছে। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের বিচার এক উপাদেয় সাহিত্যিক বিষয়, কিন্তু সহজসাধ্য নয় আদৌ, কেননা কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ দুই কালের দুই মহাভাবুক ও মহাশিল্পী। এ-বিষয়ে মাত্র কিছু কিছু ইঙ্গিত দিতে আমরা চেষ্টা করবো।

প্রথমেই চোখে পড়ে কালীদাসের সৌন্দর্য-বোধে ও রস-বোধে আর রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-বোধে ও রস-বোধে পার্থক্য। এ- বিষয়ে মিলও তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট। এই দুই কবিই পৃথিবীর শোভা-সৌন্দর্যের একান্ত অনুরাগী: কালিদাস ইন্দ্র-সারথি মাতলির মুখে বলেছেন—অহো উদাররমণীয়া পৃথিবী; তার সঙ্গে আত্মিক যোগ রয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের অগণিত উক্তির :

> শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে,
> চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে.....(কবির পুরস্কার)
> মাটির সুরে আমার সাধন—
> আমার মনকে বেঁধেছে রে
> এই ধরণীর মাটির বাঁধন। (গান)

বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে দুই কবির চোখেই পৃথিবীর মহিমা যেন অন্যনিরপেক্ষ—পৃথিবীর যিনি স্রষ্টা ও নিয়ন্তা তাঁর কথা অনেকখানি বিস্মৃত হয়ে এঁরা উপভোগ করেছেন পৃথিবীর শোভা-সৌন্দর্য। এক্ষেত্রে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকৃতপ্রেমিক ওয়ার্ডসোয়ার্থের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য সুস্পষ্ট, কেননা, ওয়ার্ডসোয়ার্থ

প্রকৃতির অপরূপতার সঙ্গে অভিন্নভাবে দেখেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তার মহিমা। মায়াবাদী হিন্দুর কুলে এই দুই কবির জন্ম যেন অদ্ভুত। কিন্তু হিন্দুর মায়াবাদকে হিন্দু অহিন্দু উভয়েই অসঙ্গত-রকমে বড় করে' দেখেছেন। প্রাচীন হিন্দু যে শুধু— এমনকি মুখ্যত—মায়াবাদী ছিলেন না তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বাৎস্যায়ন, 'চাণক্য আর বিশেষভাবে ব্যাস— তাঁর মহাভারতের সংখ্যাহীন নায়ক-নায়িকা দোষে গুণে এমন প্রাণবন্ত যে তেমন বিচিত্র প্রাণবন্ত নরনারী— সৃষ্টি জগতের খুব কম সাহিত্যেই সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু কালিদাসের ও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-বোধে ও রস-বোধে এতখানি মিল সত্ত্বেও খুব বড় পার্থক্য ফুটে উঠেছে এইখানে যে কালিদাস যথেষ্ট ভোগবাদী— অবশ্য সবল সেই ভোগ তাই অসুন্দর নয়— কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাদী; কালিদাসের সৌন্দর্য-বোধ ও রস-বোধের চাইতে সূক্ষ্মতর রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-বোধ ও রস-বোধে। এ সম্পর্কে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছি:

বালেন্দুবক্রাণ্যবিকাশভাবাদ্বভুঃ পলাশান্যতিলোহিতানি।
সদ্যো বসন্তেন সমাগতানাং নখক্ষতানীব বনস্থলীনাম॥ ১

আসসাদ মিথিলাং স বেষ্টয়ন্ পীড়িতোপবন- পাদপাং বলৈঃ।
প্রীতিরোধমসহিষ্ট সা পুরী স্ত্রীব কান্তপরিভোগমায়তম॥২

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুব্ধ কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী;
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে—তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র.....
ঘিরি তার চারিপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত

---

১. বালচন্দ্রের মত বক্র অবিকশিত অতিলোহিত পলাশরাজি সদ্যঃ-বসন্তসমাগতা বনস্থলীরূপা নায়িকাদের অঙ্গে নখক্ষত্রসমূহের মত শোভা পাইতে লাগিল। কুমারসম্ভব, তৃতীয় সর্গ।

২. তিনি (দশরথ) মিথিলায় উপনীত হইয়া সৈন্যদলসহ মিথিলা বেষ্টন করিয়া উহার উপবন ও পাদপরাজি পীড়িত করিতে লাগিলেন; মিথিলা তাঁহার প্রীতির অত্যাচার সহ্য করিল যুবতী যেমন সহ্য করে প্রগাঢ় প্রিয়-সম্ভোগ। রঘুবংশ, একাদশ সর্গ।

সর্বাঙ্গ চুম্বিল তার; সেবকের মতো
সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে, ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনের মতো রহিল পড়িয়া।
অরণ্য রহিল স্তব্দ, বিস্ময়ে মরিয়া।
ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি
উঠিল অনঙ্গদেব।
সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমি' পরে
জানুপাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে পুষ্পধনু, পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপাচার
তৃণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে॥ (বিজয়িনী)

কালিদাসের ভোগবাদ রবীন্দ্রনাথ যেন সজাগ ভাবেই 'শোধিত' করে' নিয়েছেন। 'কুমারসম্ভবে'র শেষের অনেকগুলো সর্গ কালিদাসের রচনা নয় এই প্রচলিত মত তিনি অতি মনোজ্ঞ ভাবে সমর্থন করেছেন এই সনেটে—

যখন শুনালে কবি দেবদম্পতিরে
কুমারসম্ভবগান, —চারি দিকে ঘিরে
দাঁড়াল প্রথমগণ, —শিখরের' পর
নামিল মন্থর শান্ত সন্ধ্যামেঘস্তর,-
স্থগিত বিদ্যুৎলীলা, গর্জন বিরত,
কুমারের শিখী করি পুচ্ছ অবনত,
স্থির হয়ে দাঁড়াইল পার্বতীর পাশে
বাঁকায়ে উন্নত গ্রীবা! কভু স্মিত হাসে
কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ, —কভু দীর্ঘশ্বাস
অলক্ষ্যে বহিল, —কভু অশ্রুজলোচ্ছ্বাস
দেখা দিল আঁখি প্রান্তে—যবে অবশেষে
ব্যাকুল শরমখানি নয়ন নিমেষে
নামিল নীরবে, —কবি, চাহি দেবী পানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে। (চৈতালি)

"সহসা অসমাপ্ত গানে" থামবার ধরন যে সাধারণত কালিদাসের নয় তার পর্যাপ্ত প্রমাণ তাঁর রচনায় রয়েছে। তবে তিনি প্রকৃতই সৌন্দর্যরসিক, তাই এমন সুকুমার রুচি এক্ষেত্রে তাতে আরোপ করা সঙ্গত ও শোভন দুইই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'ঋতুসংহার' সনেটটিও এমন শোভন 'শোধনে'র দৃষ্টান্ত, কেননা মূল 'ঋতুসংহার' প্রকৃতির আবেগপ্রাবল্যের স্তোত্রও বটে আনন্দস্তোত্রও বটে।

কিন্তু কালিদাসের ভোগবাদের এই উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের অনুরোধে না উল্লেখ করে' উপায় নেই যে অন্যান্য বড় প্রতিভার মতো কালিদাসকেও দুই একটি লক্ষণের দ্বারা বুঝে ফেলার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। এই ভোগবাদী কবি আশ্চর্যভাবে ত্যাগবাদীও। মহারাজ অজের রাজ্যভোগ আর দিগ্‌বিজয়ী রঘুর সন্ন্যাসের কৃচ্ছ সাধনা এই দুয়ের যে ছবি তিনি পাশাপাশি দাঁড় করিয়েছেন তা মনোরম। আমরা কয়েকটি শ্লোকের বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত করছি :

যুবা নৃপতি প্রজাদের পর্যবেক্ষণের জন্য আরোহণ করলেন ধর্মাসন। বর্ষীয়ান নৃপতি চিত্তের একাগ্রতা বিধানের জন্য নির্জনে পরিগ্রহ করলেন কুশাসন। একজন চারপাশের রাজাদের বশীভূত করলেন প্রভু-শক্তির দ্বারা। অপরজন সমাধিযোগের অভ্যাসের দ্বারা বশীভূত করলেন দেহস্থ পঞ্চ মরুৎ। তরুণ নৃপতি ভস্মসাৎ করলেন জগতের শত্রুদের সব আয়োজন। বর্ষীয়ান নৃপতি ভস্মসাৎ করতে প্রবৃত্ত হলেন স্বকর্মসমূহকে জ্ঞানময় বহ্নির দ্বারা।

প্রকৃত মহত্ত্বের ছবি আঁকতেও কালিদাসের অশেষ আগ্রহ; ভারত রাজ্যলোভী না হয়ে রামের অনুপস্থিতিকালে দীর্ঘকাল রাজ্য পরিচালনা করেন, এজন্য কবি তাঁকে বলেছেন, 'অসিধারব্রত' অভ্যাসকারী—শ্রিয়ং 'যুবাপ্যঙ্কগতামভোক্তা' অঙ্কগতা স্ত্রীকে যুবক হয়েও তিনি ভোগ করেননি।'[৩]

একই সঙ্গে ভোগ ও ত্যাগ রবীন্দ্রনাথেও বিদ্যমান, কিন্তু কালিদাসের সঙ্গে এক্ষেত্রে তাঁর পার্থক্য সূক্ষ্ম এবং গভীর। তরুণ নৃপতির রাজ্যশাসন আর প্রবীণ নৃপতির আত্মশাসনের যে ছবি কালিদাস এঁকেছেন তা থেকে এবং তাঁর আরো বহু উক্তি থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে কালিদাসের চোখে সংসার ও সন্ন্যাস যেন দুই স্বতন্ত্র জগৎ, একটিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে' তবেই যেন অন্যটিতে প্রবেশ-পথ পাওয়া যায়। যেন কালিদাস বলতে চান : যতদিন মানুষ সংসারে আছে ততদিন সে মুখ্যত ভোগধর্মী; অবশ্য মহৎদের জন্য এই ভোগ স্থূল চর্বচোষ্যাদি ভোগের সঙ্গে সঙ্গে—কখনো সে-সব অতিক্রম করে— কীর্তি-ভোগ বা যশ:-ভোগও বটে; 'নন্দিনী'কে রক্ষার জন্য রাজা দিলীপ সিংহকে বলেছেন :

---

৩. রঘুবংশ, ত্রয়োদশ সর্গ।

আমাকে যদি মনে কর তোমার অবধ্য তবে আমার যশ:-শরীরের প্রতি দয়ালু হও, একান্তবিধ্বংসী পাঞ্চভৌতিক এই পিন্ডে আমার মতো লোকের একান্ত অনাস্থা। লোকোপবাদে সীতাকে বর্জন কালে রামের হয়ে কবি বলেছেন :

লোকোপবাদ নিবৃত্তির অন্য উপায় নেই দেখে রাম পত্নীত্যাগে বদ্ধপরিকর হলেন। যশ যাঁদের ধন তাঁরা নিজেদের দেহ থেকে যশকে অধিকতর মূল্যবান জ্ঞান করেন, ভোগসুখের সামগ্রীর (স্রক্‌চন্দনবনিতার) তো কথাই নেই।

কিন্তু এইসব কীর্তিমানদের জীবনেও কালে কালে এমন সময় উপস্থিত হয় যখন ভোগ যশ সবের কথা একেবারে বিসর্জন দিয়ে এঁরা রত হন যোগে-আত্মায় পরমাত্মা দর্শনের ব্রতে। এ আত্মায় পরমাত্মাদর্শনের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তরূপে কালিদাস এঁকেছেন কৈলাসে ধ্যানরত মহাদেবের মূর্তি :

মনো নবদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তি হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্।
যমক্ষরং ক্ষেত্রবিদো বিদুস্তমাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্॥[৪]

আত্মায় পরমাত্মা দর্শনের বা উপলব্ধির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও সচেতন, এ সম্পর্কে তাঁর নৈবেদ্যে'র এই কবিতা স্মরণ করা যেতে পারে :

হে রাজেন্দ্র, তোমা কাছে নত হতে গেলে
যে ঊর্ধ্বে উঠিতে হয়, সেথা বাহু মেলে
লহ ডাকি সুদুর্গম বন্ধুর কঠিন
শৈলপথে, —অগ্রসর করো প্রতিদিন
হে মহান্ পথে তব বরপুত্রগণ
গিয়াছেন পদে পদে করিয়া অর্জন
মরণ-অধিক দুঃখ। ওগো অন্তর্যামী,
অন্তরে যে রহিয়াছে অনির্বাণ আমি
দুঃখে তার লব আর দিব পরিচয়।
তারে যেন ম্লান নাহি করে কোনো ভয়
তারে যেন কোনো লোভ করোনা চঞ্চল।
সে যেন জ্ঞানের পথে রহে সমুজ্জল,
জীবনের কার্যে যেন করে জ্যোতি দান,
মৃত্যুর বিশ্রাম যেন করে মহীয়ান।

---

৪. (সংযমী মহাদেব) দেহের নবদ্বার হইতে নিবৃত্ত সমাধিনিয়ন্ত্রিত মন হৃদয়-অধিষ্ঠানে স্থাপিত করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষগণ যাহাকে অবিনাশী বলিয়া জানেন সেই আত্মাকে স্বীয় আত্মার মধ্যে অবলোকন করিতেছেন। কুমারসম্ভব, তৃতীয় সর্গ।

কিন্তু তবু কালিদাসের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার বড় পার্থক্য এই যে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত গুহ্যসাধনাবাদী মরমী নন, 'বিকাশধর্মী মানবতা'-পন্থী ভগবানে বা পরমাত্মায় তাঁর যতখানি আনন্দ তার চাইতে হয়ত তাঁর বেশি আনন্দ মানুষের জাগতিক জীবনের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধনায়। এ সম্বন্ধে তাঁর বহু উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে, কয়েকটি উদ্ধৃত করছি :

সেই তো আমি চাই।
সাধনা যে শেষ হবে মোর
সে ভাবনা তো নাই।
ফলের তরে নয়তো খোঁজা
কে বইবে সে বিষম বোঝা
যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে
আবার ফুল ফোটাই। (গীতালি)

পান্থ তুমি পান্থ জনের সখা হে
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া। (গীতালি)

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,—
হে চির-সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রী।

এই বিকাশধর্মী মানুষের পরিণামে নির্বাণলাভ বা ব্রহ্মপদ লাভ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অশ্রদ্ধেয় হয়ত নয় কিন্তু বেশি আনন্দ তাঁর এই কথা ভাবায় যে মানুষ স্বীয় সৃষ্টিধর্মগুণে এই সংসার-ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সাহায্যকারী :

তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার। (বলাকা)

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে সুপ্রাচীন সোহহম্ তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তাও এই সম্পর্কে স্মরণীয়, তার মতে সোহহমের এ অর্থ নয় যে মানুষ ঈশ্বর, বরং এই অর্থ যে মানুষকে হতে হবে ঈশ্বরের মত সুন্দর ও শক্তিমান অর্থাৎ সৃষ্টিধর্মী।

তাঁর এই বিখ্যাত বাণীও এই সম্পর্কে স্মরণীয় : যা শাস্ত্র তাই বিশ্বাস্য নয়, যা বিশ্বাস্য তাই শাস্ত্র।[৫]

কালিদাসের কালে, অথবা তার কিছু পূর্বে, ভারতবর্ষে প্রবল হয়েছিল বেদপন্থী ও বেদবিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষ। কালিদাস বেদপন্থী-বর্ণাশ্রমধর্মের শক্তিমান সমর্থক, তার আদর্শ নৃপতিরা বর্ণাশ্রমধর্মের সজাগ প্রহরী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যুগে ভারতবর্ষ যে সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করেছিল তা আরো ব্যাপক ও গভীর, তা হচ্ছে প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের সংঘর্ষ। এই বিরাট সংঘর্ষ সমস্ত চেতনা দিয়ে অনুভব করবার শক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর চিন্তাধারার ও আদর্শের অপূর্ব মর্যাদা তাই থেকে।

রবীন্দ্রনাথ যেন সেকাল ও একালের মধ্যবর্তী সেতু। তাঁর আদর্শ যে কালিদাসের আদর্শের চাইতে ব্যাপকতর, একালের মানুষের জন্য বেশি সত্য ও সার্থক, তা সহজেই বোঝা যায়, কেননা একালের মানুষের চিন্তায় বড় ব্যাপার কোনো ধরনের 'মরমী' সাধনায় তেমন নয় যেমন বিকাশধর্মী মানবতা। কিন্তু জীবনাদর্শে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের চাইতে সমৃদ্ধতর বলেই তাঁকে যে কালিদাসের চাইতে স্বভাবত শ্রেষ্ঠতর কবি জ্ঞান করা হবে তা সত্য নয় কেননা কবির সত্যকার কৃতিত্ব অঙ্কনকুশলতায়। অবশ্য শ্রেষ্ঠ অঙ্কনকুশলতার সঙ্গে শ্রেষ্ঠ চিন্তাভাবনাও স্বভাবতই যুক্ত থাকে, কিন্তু কবির চিন্তাভাবনার মর্যাদা তাঁর অঙ্কনকুশলতার মর্যাদা থেকেই। এর সুপরিচিত দৃষ্টান্ত দান্তে। ধর্মাদর্শে তিনি রোমান ক্যাথলিক, কিন্তু বিশিষ্ট আদর্শবাদী হয়েও মহত্ত্বস্খলিত জীবনের ছবি আঁকার কাজে তিনি এমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন যে সেজন্য জগতের কাব্যরসিকদের চিরশ্রদ্ধেয় হতে পেরেছেন। কালিদাসও জীবনের অর্থপূর্ণ আলেখ্য অঙ্কনে আশ্চর্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন— বিশেষ করে' তাঁর শকুন্তলায়— তাই তিনিও জগতের রসিকদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। কবি হিসাবে এমন শ্রদ্ধার্হ যে রবীন্দ্রনাথও হয়েছেন সে বিষয়ে আমরা, তাঁর একালের স্বভাষীরা, নিঃসন্দেহ। কিন্তু এই দাবির যথার্থতার বিচারক আমরা নই— কাল। কালিদাসের মতো সেই কালজয়ী কবি প্রতিষ্ঠা যে যে কারণে রবীন্দ্রনাথের লাভ হবে বলে' আমাদের ধারণা তা সংক্ষেপে বিবৃত করা যায় এইভাবে :

কালিদাসের রচনায় রয়েছে অপূর্ব লালিত্য ও গাম্ভীর্য; রবীন্দ্রনাথের রচনাও তুল্যরূপে ললিত ও গম্ভীর। হয়তো এক্ষেত্রে কালিদাসই রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট পথপ্রদর্শক। কিন্তু বিদ্যা এক্ষেত্রে যোগ্য শিষ্যে ন্যস্ত হয়েছিল।

---

৫. সমাজ—অযোগ্য ভক্তি

কালিদাস আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষে, সেই স্বাধীন ভারতবর্ষে ছিলো মহাবিক্রম নৃপতিকুল। কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নায়করা তাই শক্তিমান সৈনিক— অমিতপরাক্রম। রবীন্দ্রনাথের জন্ম পরাধীন ভারতবর্ষে । কিন্তু সেই হীন দশায়ও ভারতবর্ষের অন্তরে জেগেছিল নবশক্তির উল্লাস— বিরাট জগতে শ্রদ্ধেয় হবার স্বপ্ন। রবীন্দ্রনাথ সেই জাগরণের কবি, তাই তাঁর নায়করা ব্যবসায়ে বীর-সৈনিক না হলেও প্রকৃতপক্ষে বীরত্ব-ধর্মী, পরাজয় স্বীকার করা তাদের স্বভাব নয়, জীবনে নব নব মহিমার সম্ভাবনায় উদ্‌বোধিত হওয়া তাদের জন্মগত অধিকার।

কালিদাস সৃষ্টি করেছেন শকুন্তলাকে; অপূর্ব সেই নারী-মূর্তি— বোধ হয় শিল্পে নারীসৃষ্টির চরম— একাধারে সে উর্বশী আর লক্ষ্মী, মর্ত্য আর স্বর্গ, বসন্ত আর হেমন্ত। রবীন্দ্রনাথও সৃষ্টি করেছেন এক চিরবন্দনীয় মাতৃমূর্তি— আনন্দময়ীকে—জগতের সাহিত্যে হয়ত অদ্বিতীয় মাতৃমূর্তি; কিন্তু শকুন্তলার মতো একই সঙ্গে মহিমা ও মোহনতা সেই মূর্তিতে নেই, তাই শিল্পসৃষ্টি হিসাবে শকুন্তলার গৌরব বেশি। কিন্তু এক পরমমোহন শিল্প-সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথও করেছেন, সেটি হচ্ছে তাঁর নিজের অন্তরাত্মা—প্রকৃতির অযুত লীলায় অপরূপভাবে চঞ্চল, অথচ এত যে লীলাচাঞ্চল্য, সৌন্দর্যের পরমসূক্ষ্ম অনুভূতি, সব অজানার উদ্দেশ্য স্তবনিবেদন :

আমর সব চেতনা সব বেদনা
রচিল এ যে কী আরাধনা...[৬]

গম্ভীর ও অকুল স্তবনিবেদন জগতে ঢের হয়েছে, কিন্তু এমন মোহন স্তবনিবেদন হয়ত আর কোনো দ্বিতীয় কবির দ্বারা সম্ভবপর হয়নি।

আষাঢ়, ১৩৫৩

---

৬. নটীর পূজা

রস ও ব্যক্তিত্ব

ব্যাপক অর্থে মানুষের সমস্ত লিপিবদ্ধ চিন্তাভাবনাকে সাহিত্য বলা যায়। কিন্তু সাধারণত আমরা বিজ্ঞানকে সাহিত্যের অন্তর্গত করে' দেখি না। দর্শন ও ইতিহাসকে যদিও সাহিত্য থেকে পৃথক করা খুব বেশি কঠিন তবু এসবও সাধারণত আমরা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করি না।

বাংলায় এই সংকীর্ণ অর্থে সাহিত্যের প্রচলিত নাম রস-সাহিত্য। নামটি এক হিসাবে বেশ ভাল কেননা এই সংকীর্ণ অর্থে সত্যকার সাহিত্য তাই যা রসোত্তীর্ণ। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক অনুসন্ধান ও বিচার অথবা ঐতিহাসিক তথ্য সাহিত্যে অবাঞ্ছিত অথবা অপ্রয়োজনীয়; তবে, প্রকৃত সাহিত্যে এসব অতিক্রম করে' থাকা চাই রস অর্থাৎ মানুষের মনের বিশেষ ও গভীর অনুভূতির পরিচয়।

আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে এই রস বা অনুভূতিকে মোটামুটি কয়েক ভাগে ভাগ করে' দেখা হয়েছে, যথা, হাস্য রৌদ্র বীভৎস করুণ ইত্যাদি। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকদের সেই রসের নয় বিভাগ যে একালে আমাদের খুশী করতে অক্ষম তা বলাইবাহুল্য, কেননা, মানুষের মন যে অত্যন্ত জটিল, সুতরাং তার অনুভূতিও বহু বিচিত্র, এ বিষয়ে এযুগে আমরা অতিশয় সচেতন। তবে রস, অর্থাৎ অনুভূতির বিশেষ পরিচয়, যে সাহিত্যের এক অতি বড় ব্যাপার সে-সম্বন্ধে প্রাচীনদের নির্দেশ শিরোধার্য। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' তাঁদের দেওয়া সাহিত্যের এই সংজ্ঞা বাস্তবিকই মূল্যবান নির্দেশ।

কিন্তু একালে আমাদের সাহিত্যিক চিন্তাভাবনা যেমন মূল্যবান রস তেমনি মূল্যবান অন্য একটি ব্যাপার—তার নাম সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব। নানা দেশের নানা কালের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা বুঝেছি সাহিত্যে সাহিত্যস্রষ্টার এই ব্যক্তিত্বের মর্যাদা। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্, আর সাহিত্য ব্যক্তিত্বের বাণীরূপ—সাহিত্যের এই দুই সংজ্ঞাই আজ আমাদের জন্য মহামূল্য।

কিন্তু এ দুটিকে স্বতন্ত্রভাবে বোঝা আমাদের পক্ষে যত সহজ এ দুয়ের পরস্পরের যোগাযোগের তত্ত্বটি বোঝা সেই পরিমাণে দুরূহ, কত দুরূহ তা বোঝা যাবে এই থেকে যে এ-দুয়ের পূর্ণ উপলব্ধির সন্ধান আমরা পাই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যেই, কিন্তু মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসে তাঁদের সংখ্যা অতিশয় পরিমিত। সাধারণত কবি সাহিত্যিক নামে যাঁরা পরিচিত তাঁরা মোটের উপর সাহিত্যে রসের অর্থাৎ মাধুর্যের ও কলাকৌশলের কথা কিছু কিছু বোঝেন, কিন্তু

ব্যক্তিত্বের কথা খুব কমই বোঝেন। এর দৃষ্টান্ত রয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যে। মনোরম পদ ও শ্লোকের রচয়িতা সে-সাহিত্যে প্রচুর সংখ্যায় মেলে, প্রকাশের মার্জিত্বের গুণে অশ্লীল কবিতাও তাতে সাধারণত সুপাঠ্য, কিন্তু সাহিত্যের বাণীতে যেমন চাই মনোহারিতা তেমনি চাই মহাপ্রাণতা, কিন্তু সেটি সম্ভব হয় রচয়িতা নিজে যখন মহাপ্রাণ— রচয়িতার নিজের সেই মহাপ্রাণতা ভিন্ন পাণ্ডিত্য কলাকৌশল কিছুই তাঁর বাণীতে সেই মহাপ্রাণতার সঞ্চার করতে পারে না—এ বিষয়ে প্রাচীন আলঙ্কারিকরা যেন উদাসীন। এই ব্যাপারে গ্যেটের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে মন্তব্যটি তিনি করেছিলেন বিখ্যাত সমালোচক শ্লেগেল সম্পর্কে :

> স্বীকার করতে হবে যে, শ্লেগেলের জানাশোনা ঢের, তাঁর অসাধারণ গুণপনা ও পড়াশোনা দেখে ভীত হতে হয়। কিন্তু তা-ই যথেষ্ট নয়। জগৎজোড়া পাণ্ডিত্য থাকলেও বিচারক্ষমতা না থাকতে পারে। শ্লেগেলের সমালোচনা সম্পূর্ণ একদেশদর্শী, তার কারণ, নাটকে তিনি দেখেন শুধু প্লট ও সাজাবার কৌশল আর পরবর্তীদের সঙ্গে (আলোচ্য) লেখকের ছোটখাটো মিল। সেই লেখক জীবনের মাধুর্য ও মহৎ চিত্তের প্রভাব কতখানি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন সেদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। কিন্তু প্রতিভার সমস্ত কলানৈপুণ্যের কি মূল্য যদি নাটকে আমরা না পাই লেখকের মধুর অথবা মহৎ ব্যক্তিত্ব? জনসাধারণের চিত্তের উৎকর্ষ ঘটে এরই গুণে। শ্লেগেলের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব মহৎদের প্রকৃতি বুঝবার ও সমাদর করবার আযোগ্য।'[৭]

মহৎ ব্যক্তিত্ব দুর্লভ ব্যাপার বলে'ই সব দেশের সাহিত্যেই, বিশেষ করে' চলতি সাহিত্যে, কলাকৌশলের বিন্যাস কবি ও সাহিত্যিকদের এক বড় কাজ। এমন চেষ্টার একটা ব্যবহারিক মূল্য অবশ্যই আছে, কেননা, অনেকের জন্য সাহিত্য কালহরণের বহু উপায়ের মধ্যে একটি উপায়; শিল্পেরও এমনি প্রয়োজনীয় অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত বিজ্ঞাপনে শিল্পের ব্যবহার। এমন নিকৃষ্ট কলা-কৌশলের সাহিত্য ও শিল্প যে বহুজনের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারে, তাদের চিত্তবিনোদনও কিছু পরিমাণে করতে পারে, এতেই প্রমাণিত হয় যে শিল্পে ও সাহিত্যে কলাকৌশল খুব বড় ব্যাপার— শিল্পের ও সাহিত্যের বিশেষত্ব এই থেকে। কিন্তু যাঁরা দৃষ্টিমান তাঁদের বুঝতে দেরী হয় না যে এই কলাকৌশলের প্রয়োগও তাঁদের দ্বারা বেশি সার্থক হয় যাঁরা শুধু কলাকুশলী নন, সেই সঙ্গে সহজভাবে মহৎ।

---

৭. কবিগুরু গ্যেটে, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯১

শিল্পী ও সাহিত্যিকদের এই মতত্ত্বের কথা কিন্তু একটু বিশেষভাবে বুঝবার আছে। সাধারণত দেখা যায় যাকে মহত্ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত বলা যায় তেমন চরিত্র শিল্পী-সাহিত্যিকদের নয়। তাঁদের শ্রেষ্ঠদের প্রতিনিধিস্থানীয় বরং ভর্তৃহরি যিনি বহুবার বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিলেন আর বহুবার কামনার জীবনে ফিরে এসেছিলেন— খেয়ালের বশে নয়, অন্তরপ্রকৃতির সত্যকার তাগিদে। শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে সবলতা ও দুর্বলতা যে এমন একই সঙ্গে থাকে বোধ হয় এই জন্য ভাল আর মন্দ দুয়েরই আকর্ষণের মনোহারিতা তাঁরা নিজেরা এমন গভীর করে' উপলব্ধি করেন আর সুন্দর করে' তা ব্যক্ত করতে পারেন। চিত্তের এমন সহজ প্রসার, বিচিত্র অনুভূতির এমন তীক্ষ্ণতা, যখন শিল্পী-সাহিত্যিকদের জন্য দুর্লভ হয়ে কোনো বিশেষ idea ধারণার চাপে তখন ঘটে তাঁর পতন। তখনো দক্ষতাগুণে লোভনীয় অথবা রোমাঞ্চকর চিত্র তিনি অঙ্কিত করতে পারেন কিন্তু মানুষের চিত্ত গভীরভাবে আশ্লিষ্ট হতে পারে তাঁর রচনা আর তেমন রচনা থাকে না। এমন ত্রুটিপূর্ণ শিল্প সম্পর্কে ম্যাক্সিম গোর্কির টলস্টয়—চরিতের এই বিচার স্মরণীয়–বিচার করেছেন রবীন্দ্রনাথ :

> ম্যাক্সিম গোর্কি টলস্টয়ের একটি জীবনচরিত লিখেছেন। বর্তমান কালের প্রখরবুদ্ধি পাঠকেরা বাহবা দিয়ে বলেছেন, এ লেখাটা আর্টিষ্টের যোগ্য লেখা বটে। অর্থাৎ টলস্টয় দোষে গুণে ঠিক যেমনটি সেই ছবিতে তীক্ষ্ণ রেখায় তেমনটি আঁকা হয়েছে; এর মধ্যে দয়ামায়া ভক্তিশ্রদ্ধার কোনো কুয়াশা নেই। পড়লে মনে হয়, টলস্টয় যে সর্বসাধারণের চেয়ে বিশেষ কিছু বড় তা নয়, এমন কি, অনেক বিষয়ে হেয়।.....টলস্টয়ের কিছুই মন্দ ছিলনা এ কথা বলাই চলে না; খুঁটিনাটি বিচার করলে তিনি যে নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতোই এবং অনেক বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্বল, এ কথা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু যে-সত্যের গুণে টলস্টয় বহু লোকের এবং বহুকালের, তাঁর ক্ষণিকমূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আচ্ছন্ন করে' থাকে তাহলে এই আর্টিষ্টের আশ্চর্য ছবি নিয়ে আমার লাভ হবে কী। প্রথম যখন আমি দার্জিলিং দেখতে গিয়েছিলুম দিনের পর দিন কেবলই দেখেছিলুম মেঘ আর কুয়াশা। কিন্তু জানা ছিল, এগুলো সাময়িক এবং যদিও হিমালয়কে আচ্ছন্ন করবার এদের শক্তি আছে তবুও এরা কালো বাষ্প মাত্র, কাঞ্চনজঙ্ঘার ধ্রুব শুভ্র মহত্ত্বকে এরা অতিক্রম করতে পারে না। আর যাই হোক, হিমালয়কে এই কুয়াশার দ্বারা তিরস্কৃত দেখে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে মূঢ়তা হতো। ক্ষণকালের মায়ার দ্বারা চিরকালের স্বরূপকে আচ্ছন্ন করে দেখাই আর্টিষ্টের দেখা, একথা

মানতে পারি নে। তা ছাড়া গোর্কির আর্টিষ্ট চিত্ততা বৈজ্ঞানিক হিসেবে নির্বিকার নয়। তাঁর চিত্তে টলস্টয়ের যে- ছায়া পড়েছে সেটা একটা ছবি হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সেটা যে- সত্য তা কেমন করে' বলব। গোর্কির টলস্টয়ই কি টলস্টয়। বহুকালের ও বহুলোকের চিত্তকে যদি গোর্কি নিজের চিত্তের মধ্যে সংযত করতে পারতেন তাহলেই তাঁর দ্বারা বহুকালের বহুলোকের টলস্টয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হত। তার মধ্যে অনেক ভোলবার সামগ্রী ভুলে যাওয়া হত, আর তবেই যা না-ভোলবার তার বড় হয়ে, সম্পূর্ণ হয়ে, দেখা দিত।[৮]

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার শেষ ক'টি ছত্রে যে বলা হয়েছে : শিল্পীর কাজ শুধু অঙ্কনকুশল হওয়া নয়, শিল্পীর কাজ তাঁর বর্ণনার বিষয় সম্পর্কে প্রধান ও অপ্রধানের বিচার করা, সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে এ এক বড় ব্যাপার। বলা বহুল্য এরও যোগ কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই, নিজে এক মহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হলে জীবনের ব্যাপারে এমন প্রধান অপ্রধানের বিচার সম্ভবপর নয়; কিন্তু জীবনে প্রধান অপ্রধানের ভাল-মন্দের এই ভেদ সাহিত্যিক ও শিল্পী যে করেন সেটি কিন্তু ঠিক নীতিবিদের ভঙ্গিতে নয়। নীতিবিদ কোনো বিশেষ আদর্শকে তাঁর অথবা তাঁর ও জগতের জন্য শ্রেয় জ্ঞান করেছেন, আর যথাশক্তি অনুসরণ করে' চলেছেন সেই আদর্শই, অন্যদিকে দৃষ্টি তাঁর প্রায় নেই, কিন্তু শিল্পী—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শিল্পী—জীবনের এক বিশেষ আদর্শ সম্বন্ধে যেমন সচেতন তেমনি সচেতন মানবচিত্তের বিচিত্র প্রবণতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে, তবে এই বিচিত্র প্রভাবে ও আকর্ষণে শ্রেষ্ঠ শিল্পী আকুল ও দিশাহারা নন, চমকিত ও আন্দোলিত কিন্তু স্থিরলক্ষ্যও—যেমন স্থিরলক্ষ্য বর্ষার দুরন্ত পদ্মায় যারা পাড়ি জমায় সেই মহাবিচক্ষণ ও মহালাঞ্ছিত মাঝিরা। শিল্পে ও সাহিত্যে এমন বিচক্ষণতা অবশ্য উচ্চাঙ্গের প্রতিভার পক্ষেও দীর্ঘদিনের লভ্য, কাজেই আলোচনার বিষয় তেমন নয়। শিল্পে ও সাহিত্যে এই ধরনের ব্যাপার লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে— শিল্পের অতি অল্প অংশই শেখানো যায় কিন্তু শিল্পীকে জানতে হয় সবটা।

সাহিত্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে এই যে দুটি কথার অবতারণা আমরা করেছি—আর ব্যক্তিত্ব— অর্থাৎ রচনাকে রসময় করা আর তাতে ব্যক্তিত্বের স্পর্শ দান করা, যাতে রচনাটি হয়ে ওঠে শুধু মধুর নয়, বিশিষ্ট, এই দুটি ব্যাপারই কি সমান মর্যাদার? অথবা এ-দুয়ের মধ্যে এমন সম্পর্ক আছে যার গুণে এর বিশেষ একটির সাধনাই অন্যটি লাভেরও প্রশস্ত উপায় বলে' গণ্য হতে পারে?

---

৮. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ৩৮২

ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা বুঝি, রসই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রধান নির্ভরের ব্যাপার হয়েছে; তাতে প্রাচীন সাহিত্য সহজেই হয়েছে সুখপাঠ্য আর অনেকের আকর্ষণস্থল। কিন্তু রস যত মনোহর হোক একালে আমাদের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে সাহিত্যে ও শিল্পে ব্যক্তিত্বের দ্বারা, এমন কি, সাহিত্য ও শিল্পের সমস্ত মাধুর্যের সমস্ত কলা কৌশলে ব্যক্তিত্বের স্পর্শটুকু আবিষ্কার করতে না পারলে আমাদের শিল্প ও সাহিত্য উপভোগ আজ আর পূর্ণাঙ্গ হয় না। কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব বাস্তবিকই অতি গভীর ব্যাপার। গজে গজে যেমন মৌক্তিক হয় না তেমনি এই ব্যক্তিত্বও সাহিত্যে দুর্লভ রয়ে যাবে হয়ত চিরকাল—তা পাণ্ডিত্য ও কলাকৌশলের পথে যতই আমরা অগ্রসর হই। এটি সজাগ সাধনারও ব্যাপার তেমন মনে হয় না, বরং কতকটা জন্মগত সহজ অধিকারের ব্যাপার অথচ অশ্রান্ত বিকাশেরও ব্যাপার। —তবে, একালে সাহিত্যে ও শিল্পে এই ব্যক্তিত্বের মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে একালের সমালোচনা সাহিত্য এক নূতন মর্যাদা লাভ করেছে।[৯]

জুন, ১৯৪৬।

---

৯. অল ইন্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে

দেশ বিভক্ত হলো। এর ফলে ভারতবর্ষের পূর্বে ও পশ্চিমে মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাধীন ভূখণ্ড লাভ হলো। এই স্বাধীন ভূখণ্ড মুসলমানরা কিভাবে শাসন করবে, কিভাবে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করবে, আজ সে-কথা বিশেষভাবে ভাবা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

সংবাদপত্রে দেখা যাচ্ছে, পূর্ব পশ্চিম দুই অঞ্চলেই কথা উঠেছে মুসলমানদের এই নূতন রাষ্ট্র 'শরীয়ত' অর্থাৎ কোরআন-হাদিসের বিধিবিধান অনুসারে শাসিত হওয়া চাই। এই মত প্রবল হয়ে উঠবে মনে হয় কেননা, মুসলমানরা নূতন রাষ্ট্র লাভ করেছে স্বতন্ত্র জাতীয়তার দাবিতে।

কিন্তু এযুগে প্রাচীন শরীয়তের পুনঃপ্রবর্তনের পথে বাধাও কম নেই। সেই-সব বাধা দুই প্রধান ভাগে ভাগ করে' দেখা যেতে পারে : প্রথমত, শরীয়তের ও একালের বিধিবিধানের মধ্যে পার্থক্য; দ্বিতীয়ত, নূতন মুসলিম রাষ্ট্রে অ-মুসলমানেরা সংখ্যাশক্তিতে নগণ্য নয়, তারা শরীয়তের বিধান অনুসারে শাসিত হতে রাজী হবে কি না।

প্রথম শ্রেণীর কথাই আগে ভাবা যাক। কোনো কোনো অপরাধের জন্য অপরাধীর হাত পা কেটে ফেলা কিংবা তাকে পাথর মেরে' মেরে ফেলার বিধান শরীয়তে আছে। মুসলমানদের নূতন রাষ্ট্রে সে-সবের পুনঃপ্রর্বতন হবে? অপরাধের প্রতি একালের মানুষের মনোভাবে বড়-রকমের পরিবর্তন ঘটেছে— অপরাধকে একালে দেখা হয় প্রধানত সামাজিক ব্যাধি হিসাবে; তাই অপরাধী ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি দেবার কথা তেমন না ভেবে একালে ভাবা হয় শিক্ষা-দীক্ষার সাহায্যে তাকে একজন স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ করে গড়ে তোলার কথা। শরীয়তপন্থীরা কি এই নূতন সম্ভাবনাপূর্ণ সমাজদর্শন অস্বীকার করবেন? একে ইসলামের প্রতিকূল জ্ঞান করবেন? (পাথর মারার মত শাস্তি হজরত মোহাম্মদ যথেষ্ট অনিচ্ছুক হয়ে বিধান করছেন হাদিস গ্রন্থে এমন প্রমাণ বিরল নয়।)

দ্বিতীয় শ্রেণীর বাধাও কম প্রবল নয়, বরং এক-হিসাবে প্রথম শ্রেণীর চাইতেও গুরুতর, কেননা, সংখ্যালগিষ্ঠদের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠদের আচরণের উপরই নির্ভর করবে ভারতবর্ষের মুসলমান ও হিন্দু উভয় রাষ্ট্রেরই শান্তি-শৃঙ্খলা—হয়ত বা তাদের অস্তিত্ব। তবে অন্য দিক থেকে এ সমস্যাটা একটু হাল্কা করে' ভাবা যায়। মুসলমানরা যদি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয় যে শরীয়তের পুনঃপ্রবর্তনই তাদের রাষ্ট্রের জন্য প্রধান কাম্য, আর মুসলিম রাষ্ট্রের অ-মুসলমানরা যদি শরীয়তের শাসন অস্বীকার করতে অসম্মত হয়, তবে অতি দুরূহ লোক— বিনিময়ের দ্বারা মুসলমানেরা এ সংকট থেকে উদ্ধার পেতেও পারে।

প্রথম শ্রেণীর বাধা কিন্তু তেমন কঠিন মনে না হলেও আসলে খুব কঠিন, কেননা, এক্ষেত্রে বিরোধ কারোর সঙ্গে নয়, বিরোধ নিজেদের মনের সঙ্গে। ধর্মের বিধান কেন মানুষ মানবে? এই জন্য যে ধর্মের বিধান মানলে মানুষের যে শুধু পরকালে কল্যাণ হবে তাই নয়, ইহকালেও কল্যাণ হবে সেই জন্য মুসলমান তার প্রার্থনায় বলে : প্রভু দুনিয়ার ভালো দাও, পরকালেও ভালো দাও। কিন্তু তার বিচার বুদ্ধি যদি তাকে বলে : অপরাধ মানুষ করে শুধু তার কুপ্রবৃত্তির তাড়নায়ই নয় বরং অভাবের তাড়নায়, আর সব মানুষের অভাব অভিযোগ দূর করা এযুগের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান কাজ— তবে হাত পা কাটা ও পাথর মেরে' মেরে ফেলার মত কঠোর শাস্তি মেনে নেওয়া তার পক্ষে সহজ হবে না— কেবলই তার মনে হবে : সত্যই কি মানুষের উপকার হচ্ছে এমন সব বিধানের দ্বারা? তাই শরীয়তের পুনঃপ্রবর্তন যাঁরা চান তাঁদের একথা বললেই চলবে না যে শরীয়ত কোরআন-হাদিসের বিধান, অতএব মান্য; তাঁদের বরং প্রমাণ করতে হবে যে শরীয়ত বলতে যে সব বিধিবিধান মুসলমানরা পুনরায় প্রবর্তিত করতে চায় সে-সব একালেও মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নতির জন্য বাস্তবিকই কাম্য। কোরআনও কিন্তু এই কথাই বলেন : কোরআন আল্লাহর বাণী অতএব মানুষকে মানতে হবে, এইই কোরআনের প্রধান বক্তব্য নয় বরং কোরআনের প্রধান বক্তব্য এই যে কোরআন আল্লাহর বাণী, মানুষ তার বুদ্ধিকে সক্রিয় করে প্রকৃতির দিকে আর ইতিহাসের ঘটনাবলীর দিকে তাকিয়ে কোরআনের নির্দেশের সত্যতা উপলব্ধি করুক, আর সেই নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করে ইহকালে ও পরকালে লাভবান হোক। কোরআনের ও হাদিসের মধ্যে একটি লক্ষণীয় পার্থক্য এই যে 'রূপে'র চাইতে 'ভাবে'র উপরে জোর কোরআনে কিছু বেশি।

বাস্তবিক মুসলমানের ধর্মগত সমস্যা সাধারণত যত সহজ ভাবা হয় আসলে তত সহজ নয়। মুসলমানের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরআন। কোরআনের নিচে বিশ্বস্ত হাদিসের (হজরত মোহাম্মদের বাণীর ও চরিত্র-চিত্রের) স্থান। কোরআনের আকার বড় নয়। বিশ্বস্ত হাদিসও সংখ্যায় খুব বেশি নয়। কাজেই কোরআন-হাদিসের প্রকৃত বিধিবিধান কি সে সম্বন্ধে কাজ চালাবার যোগ্য একটা ধারণা করা কঠিন নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় :

ইসলামের নির্ভর অলিখিত অনির্দিষ্ট শাস্ত্রের উপরে নয়, বরং সুলিখিত সুনির্দিষ্ট শাস্ত্রের উপরে। মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনও এই সব সুস্পষ্ট নির্দেশের দ্বারাই চালিত। যে কোনো শাস্ত্রজ্ঞ 'আলেমকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় : একজন ধার্মিক মুসলমানের কি কর্তব্য? তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে উত্তর দেবেন : তাকে আল্লাহ-তে ও রাসুলে বিশ্বাস করতে হবে, নামাজ রোজা হজ্ব যাকাত নিয়মিতভাবে নিষ্পন্ন

করতে হবে। কিন্তু সেই 'আলেম'কে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় : এসব শাস্ত্রীয় বিধিবিধান-পালনকারীর সংখ্যা মুসলমান- সমাজে নগণ্য নয়, কিন্তু কোরআনে যে বলা হয়েছে, "নামাজ পড় নামাজ কদর্যতা ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করে" এমন কল্যাণপথের প্রকৃত পথিক মুসলমান সমাজের বিধিবিধান পালনকারীদের মধ্যে তেমন লক্ষণীয় নয় কেন, তবে তার উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সমাজের এই দিকটা তাঁর চিন্তাভাবনার বিষয় হয়নি বললেই চলে, কেননা, তার মনোযোগ আকৃষ্ট রয়েছে লিখিত বিধিবিধানের রকমারিত্বের দিকে, সমাজ মনের উপরে সে-সবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে সেই অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ব্যাপারের দিকে নয়। ভিটামিন (খাদ্যপ্রাণ) আবিষ্কারের পর খাদ্য-বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন, খাদ্যে সূক্ষ্ম ভিটামিনের অভাব যদি হয় তবে স্থূল অন্যান্য উপকরণই তাতে থাকুক সে-সবের দ্বারা মানবদেহের প্রকৃত পুষ্টিসাধন হয় না; তেমনি ধর্মের বিচিত্র বিধিবিধানের মূল্য যে সূক্ষ্ম মনুষ্যত্ব-সাধন, অর্থাৎ জ্ঞান ও চরিত্র লাভ ও অশ্রান্ত শুভ-সাধনা, সেই অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারটা ভুলে গেলে ধর্মের বিধিবিধান পালনের দ্বারাও কোনো সত্যকার লাভ সম্ভবপর নয় তা সে-সব বিধিবিধান যত বিচিত্র, যত কষ্টসাধ্য হোক। —কোরআন বলেন :

> তিনি জ্ঞান দেন যাকে ইচ্ছে করেন, আর যে জ্ঞান পায় সে মহাসম্পদ পায়, জ্ঞানী ভিন্ন আর কেউ বিচার করে দেখে না। (২:২৬৯)।
>
> আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন : একজন ক্রীতদাসের কথা ভাব, কোনো কিছুর উপরে তার কর্তৃত্ব নেই, আর ভাব অন্য একজনের কথা যাকে আমার তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে উৎকৃষ্ট জীবিকা, তা থেকে সে খরচ করে, চলে প্রকাশ্যে এবং গোপনে এই দুইজন কি তুল্য মর্যাদার?..... (১৬:৭৫)

ধর্মের এই যে মূল কথা মনুষ্যত্ব-সাধন ব্যাপক ও গভীর মনুষ্যত্ব-সাধন এই ব্যাপারটি না বুঝে ধর্মের ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ করতে গেলে যে নিতান্ত কাঁচা বনিয়াদের উপরে ইমারত তোলার চেষ্টা করা হয়, মুসলমান-সমাজের একালের শরীয়ত পন্থীদের সে-বিষয়ে হুশিয়ার হবার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এ যুগ আত্মনিয়ন্ত্রণের বা জাতীয় বৈশিষ্ট্যসাধনের যুগ বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নিবিড় বিশ্বসংযোগের যুগও বটে। আত্মনিয়ন্ত্রণ-তত্ত্ব থেকে যে এ যুগের মুসলমানেরা নূতন করে লাভ হয়েছে শরীয়তের পুনঃপ্রবর্তনার স্বপ্ন তা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু যদি শুধু আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বপ্নে সে বিভোর থাকে আর বিশ্বের সঙ্গে তার যোগ যদি

শিথিল হয় তবে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ওহাবীদের চাইতে তার ভাগ্য প্রসন্নতর হবার কথা নয়, কেননা ওহাবীদের মনোবল ছিল অপরিসীম আর বাইরের সঙ্গে সংযোগ দূরে থাকুক তাঁদের শত্রুপক্ষের বলবিক্রম সম্বন্ধে ধারণাও ছিল অদ্ভুত।[১০] একালের শরীয়তপন্থীরা ওহাবীদের অনুবর্তী না হয়ে বরং অনুবর্তী হোক মহাপ্রাণ স্যার সৈয়দের, ইসলাম সম্বন্ধে যিনি বলতে পেরেছিলেন : 'যা সত্য নয় তা ইসলাম নয়'। যে কোন ধর্ম বা আদর্শ সম্বন্ধে এ সার কথা। যা সত্য অর্থাৎ সার্থক নয় তা ধর্ম বা আদর্শ হবার যোগ্য নয়। কোরআনের একটি বাণীর মর্ম এই; আল্লাহ যদি চাইতেন তবে সবাইকে এক জাতীয় লোক করতেন, কিন্তু তিনি মানুষের (বিচার-বুদ্ধির) পরীক্ষা করতে চান, তাই কল্যাণের পথে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করুক (৫ : ৪৮)। কল্যাণের পথে প্রতিযোগিতা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এর উপর জোর দিতে ইসলাম যে কসুর করেনি দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের 'আলেম'রা সে-কথা ব্যক্ত করতে পারেন নি। সেজন্য মুসলমান-সমাজের একালের চিন্তানেতাদের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেছে। সব সময়ে তাঁদের হুশিয়ার থাকতে হবে পূর্বের ভুল যেন আবার না করা হয়। তাঁরা গভীরভাবে বিভিন্ন যুগের শ্রেষ্ঠদের কথা, ভিন্ন দেশ জাতির শ্রেষ্ঠদেরও কথা, এসবের চাইতেও কঠিনতর প্রয়াস তাঁরা করুণ চরিত্রে ও চেতনায় নিজের মহৎ হতে, কেননা যার নিজের চোখ নেই, সূর্যের ঔজ্জ্বল্যও তার জন্য ব্যর্থ; আর বিচিত্র শুভ-সাধনায় তাঁরা সংসারে গড়ে তুলুন স্বর্গ—প্রত্যেক স্মরণীয় জাতি এমন সংসারে স্বর্গ গড়ার চেষ্টা করেছেন। এমন বিচিত্র ও বিপুল ঐহিক পাথেয়ের সাহায্যেই তাঁরা আশা করতে পারেন এমন শত বৎসরের ব্যবধান অতিক্রম করে' শরীয়তের মর্ম উপলব্ধি করতে। শরীয়তের পুনঃপ্রবর্তন অবশ্য অসম্ভব, কেননা অতীতে অস্তমিত—মৃত—তার যে অংশ সজীব সে তুমি ও আমি; অতীত পুনর্জীবিত হবে না, তবে তুমি ও আমি বিপুল সাধনায় নব মহিমা লাভ করতে পারবো— সংসারে এক নতুন চাঁদের হাট বসাতে পারবো।[১১] আর যেহেতু আমরা ইসলামের উত্তরাধিকারী সেজন্য আমাদের মহিমা- লাভ হবে ইসলামের নতুন মহিমা লাভ।

নতুন মুসলিম রাষ্ট্রে অ-মুসলমানদের সমস্যার ইঙ্গিত মাত্র করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি বাস্তবিকই খুব জটিল। মুসলমানদের ইতিহাসে দেখা যায়, এটি বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে মীমাংসা করতে চেষ্টা করা হয়েছে। মদিনায় ও হোদায়বিয়ায় হজরত বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন মুসলমান ও অ-মুসলমানের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে, পরস্পরের মধ্যেকার বিরোধিতা দূর করতে, সেজন্য নিজের প্রাধান্য অনেকখানি খর্ব করতেও তিনি প্রস্তুত। কিন্তু বিজয়ী ইসলাম স্বভাবতই বিজিতদের সঙ্গে সন্ধি করেছে তাদের আনুগত্য-স্বীকারের শর্তে। সেই আনুগত্য-স্বীকারের ধারাও এক থাকেনি। প্রথম যুগে অ-মুসলমানেরা আনুগত্য স্বীকার করে জিজিয়া দিয়ে তাদের ধর্মাদি আচরণের অবাধ অধিকার পেতো, সিন্ধুর হিন্দুরা বিন্ কাসিমের কাছ থেকে এমন অধিকার পেয়েছিল। কিন্তু পরে এ-অধিকার কিছু ক্ষুণ্ন হয়েছিল—মুসলিম রাষ্ট্রে নতুন করে দেবমন্দির নির্মাণের অধিকার স্বীকৃত হয়নি। প্রধানত এই ব্যাখ্যারই ফলে আওরঙ্গজেব বহু হিন্দু মন্দির ভেঙেছিলেন। অ-মুসলমানদের প্রতি প্রাচীন মুসলিম রাষ্ট্রের এই নীতিবৈচিত্র্য একালের মুসলমানরা যথেষ্ট কাজে লাগাতে পারে। এক্ষেত্রেও স্যার সৈয়দের অপূর্ব ইসলাম-নীতি—যা সত্য নয়, অর্থাৎ সার্থক নয়, তা ইসলাম নয় তারা প্রয়োগ করতে পারে; কায়েদে আজমের যে সংখ্যালগিষ্ঠদের প্রতি অভয় দান তা সম্পূর্ণ ইসলাম অনুমোদিত জ্ঞান করতে পারে।

ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি কী— আইনজ্ঞেরা তার উত্তর দিতে চেষ্টা করবেন কোরআন হাদিস আর মুসলিম ইতিহাস মন্থর করে। কিন্তু যিনি জানেন মুসলমান হওয়ার অর্থ আল্লাহর, অর্থাৎ সত্য ও কল্যাণের, অনুগত হওয়া, আর সেইজন্য জগতের বন্ধু হওয়া,[১২] তিনি নিঃসংশয়ে বুঝবেন'— ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি কাণ্ডজ্ঞান ও মানবহিত।

১৯৪৮

---

১২. জগত আল্লাহর পরিবার : সে-ই আল্লাহর কাছে ভাল যে তাঁর পরিবারের প্রতি ভাল। হাদিস সে আল্লাহতে বিশ্বাসী নয়, সে আল্লাহতে বিশ্বাসী নয়, সে আল্লাহতে বিশ্বাসী নয় যার আঘাত থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। —হাদিস।

সংস্কৃতির কথা

মনে হয় মানুষ স্বভাবত পৌত্তলিক : কোনো বিশেষ প্রতিমা বিশেষ তত্ত্ব বিশেষ আচার বা বিশেষ ধরন-ধারণ— এ না হলে যেন তার চলতে চায় না। আর এরই সঙ্গে সঙ্গে সে পরিবর্তন প্রিয়—তার প্রতিমা তত্ত্ব আচার বা ধরন-ধারণ ক্রমাগত বদলায়।

সংস্কৃতি কথাটা ইয়োরোপে প্রবল হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে নানা ধরনের বিপ্লব দেখা দেয়—ভাব-বিপ্লব, অর্থনৈতিক বিপ্লব, রাষ্ট্রিক বিপ্লব, সবই। সেই বিপ্লবের পরে উনবিংশ শতাব্দীতে আসে নূতন সংগঠনের কাল। সেই দিনে অতীতের ধর্মের স্থান দখল করে সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি বলতে বোঝা হয় এক বিশেষ সমন্বয়—খ্রিস্টান অখ্রিস্টান সমস্ত রকমের জ্ঞান ও উৎকর্ষ এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়—অতীতের শ্রেষ্ঠ ভাব-সম্পদের সমাহার। প্রথমে এর প্রবণতা হয় ব্যক্তিতান্ত্রিকতার দিকে— ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষই হয় এর প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ইয়োরোপে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন অনেক বেশি সক্রিয়, তাই অচিরেই এই ব্যক্তিতান্ত্রিকতার মোড় ফেলে সামাজিকতার দিকে।

ভারতবর্ষ চিন্তার দিক দিয়ে ইয়োরোপের অন্তত পঞ্চাশ বৎসর পেছনে পড়ে রয়েছে; ইয়োরোপের উনবিংশ শতাব্দীর ঢেউ ভারতবর্ষে যে এসে লাগবে বিংশ শতাব্দীতে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সংস্কৃতির ব্যক্তিতান্ত্রিক প্রবণতা আমাদের দেশে দুই চার বছর আগেও প্রবল ছিলো। ভদ্রলোক হওয়া বা একটি ভদ্র পরিবার গড়ে তোলা এইই ছিলো আমাদের দেশের শিক্ষিতদের লক্ষ্য। দেশে যে গণতান্ত্রিক শাসন নীতি প্রবর্তিত হয়েছে আর সাম্প্রদায়িক বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছে তার ফলে আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনায় সমাজবোধ একটা বড় জায়গা দখল করতে চাচ্ছে।

ভারতবর্ষের একালের সংস্কৃতিক চিন্তার ইতিহাসে দুই জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— একজন বঙ্কিমচন্দ্র অপরজন পাঞ্জাবের ইকবাল। এঁদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর চিন্তাশীলের জন্ম একালের ভারতবর্ষে হয়েছে, কিন্তু চিন্তা নায়ক হিসাবে এঁদের মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে আর কেউ পারেন নি। এঁরা দুজনেই চেয়েছেন প্রাচীন ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা দিতে, সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী রাষ্ট্রজীবন গঠন বলতে যা বোঝায় তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত এঁদের বাণীতে রয়েছে। মানুষ একই সঙ্গে স্থিতিশীল ও গতিশীল, আমাদের দেশের লোক স্থিতিশীল কিছু বেশি—জীবনে নূতন নূতন পরীক্ষা করবার সুযোগ তাদের জন্য সংকীর্ণ, বোধ হয় মুখ্যত এই

কারণে। বঙ্কিমচন্দ্র ও ইকবালের চিন্তায় সনাতন স্থিতিশীলতার সঙ্গে কিছু গতিশীলতা যে মিশেছে, এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে তাঁদের জনপ্রিয়তার রহস্য। স্থিতিশীলতার আর গতিশীলতার এই যে অদ্ভুত মিশ্রণ আমাদের দেশের চিন্তায় ঘটেছে আমাদের একালের সংস্কৃতিগত চিন্তায় এই একটি গোড়ার কথা। কিন্তু সুচিন্তার কাজ হচ্ছে চিন্তায় গ্রন্থির জটিলতা ঘুচিয়ে তাকে ঋজু করা—জীবনে কার্যকরী করা।

আমাদের জীবনে নূতন নূতন পরীক্ষার সুযোগ সংকীর্ণ-বিচিত্র ও দূরপ্রসারী ব্যাপারটির প্রভাব। এর ফলে যেমন কঠিন আমাদের পক্ষে মাত্রাজ্ঞান সম্পন্ন হওয়া তেমনি দুর্নিবার আমাদের জন্য চরমপন্থিত্বের আকর্ষণ : যে চিন্তার লক্ষ্য দীর্ঘাভিসারী কর্ম-পন্থা আমাদের কৌতূহল সহজেই তা থেকে হয় প্রতিনিবৃত্ত, আর যে চিন্তা আমাদের জন্য এনে দেয় ভাবোন্মত্ততা সহজেই আমাদের মন হয় তার দ্বারা বন্দী। এই প্রতিকূল পরিবেশ আর অব্যবস্থিত চিত্ত বেশ বড় রকমের দুর্ঘটনা এসব আমাদের জীবনে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিতান্ত্রিকতা যে দুর্বল চিন্তা তা বোঝা কঠিন নয়। মানুষ বিশেষভাবে সামাজিক জীব। কাজেই যে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক উৎকর্ষের সামাজিক মূল্য কম তা যত সুদর্শনই হোক শেষ পর্যন্ত অদ্ভুত ভিন্ন আর কিছু নয়। অবশ্য একথা সত্য যে এক যুগে যার সামাজিক মূল্য কম অন্য যুগে তার সামাজিক মূল্য বেশি হতে পারে। কিন্তু এমন কতকগুলো ব্যাপার আছে স্বভাবতই যার সামাজিক মূল্য কম। মানুষের ইতিহাস বিচিত্র—বিচিত্রভাবের মধ্যে দিয়ে তার অভিব্যক্তি হয়েছে ও হচ্ছে। তাই যেসব চিন্তা প্রকৃতপক্ষে জনহিতকর নয়, বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠির বা দলের চেতন বা অবচেতন স্বার্থবোধের অনুকূলের মাত্র, অথবা ক্ষণিক খেয়াল, সে সবের দিকেও মাঝে মাঝে নেতৃস্থানীয়দের প্রবণতা জন্মেছে।

সেকালের ধর্মের মতো একালের সংস্কৃতিরও মূল কথা হওয়া চাই সামাজিক উৎকর্ষ লাভ আর যেহেতু সমাজের অর্থ একদিকে বিশ্বমানব— সমাজ উৎকর্ষ বিশেষ বিশেষ দেশগত বা রাষ্ট্রগত সমাজ, সেজন্যে সংস্কৃতিও মূলত বিশ্বসামাজিক ও রাষ্ট্রিক। অন্য কথায়, যে চিন্তা জগতের অনেকের মনে অনুরণন জাগায় না এবং যার রাষ্ট্রিক সার্থকতা কম তা বাস্তবিকই স্বল্পমূল্য বা মূল্যহীন— হোক না তা অন্যভাবে যত অসাধারণ।

এই দিক দিয়ে দেখলে হিন্দু সংস্কৃতি আর্য-সংস্কৃতি সেমীয় সংস্কৃতি ইত্যাদি কথা যে দেশে উঠেছে সে-সবের মূলে সুচিন্তা যে তেমন কার্যকরী হচ্ছে না তা সহজেই বোঝা যায়। যদি হিন্দু ও মুসলমানের রাষ্ট্রিক জীবন সম্মিলিত হয় তবে

তাদের সাংস্কৃতিক জীবন ভিন্ন হতে পারে না, অন্তত সে-বিভিন্নতা অগ্রগণ্য হতে পারে না— হলে সংস্কৃতি একটি প্রধান লক্ষ্য সামাজিক অর্থাৎ রাষ্ট্রিক উৎকর্ষ লাভ তাই হয় ব্যাহত। হিন্দু-সংস্কৃতি মুসলিম-সংস্কৃতি এসব চিন্তা কিছু পরিমাণে কার্যকরী হতেও পারে যদি হিন্দু ও মুসলমানের রাষ্ট্রিক জীবন স্বতন্ত্র হয়। কিন্তু যাঁরা হিন্দু-সংস্কৃতি মুসলিম-সংস্কৃতি ইত্যাদি কথা বলেছেন তাঁরা ভারতবর্ষের অথবা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক পৃথক রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা তেমন ভাবছেন তা মনে হয় না।

সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশ্বজনীনতার কথা তোলা হয়েছে। চিন্তা চিরদিনই বিশ্বজনীন। আর একালে চিন্তার বিশ্বজনীনতা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিভিন্ন দেশের মানুষ পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি এসেছে বলে'। এই চিন্তার ক্ষেত্রে নূতন নূতন সম্ভাবনার কথা আজ মানুষ জ্ঞাতসারে মনে স্থান দিচ্ছে, ফলে প্রাচীন চিন্তাধারা তার চিত্তকে আর বন্দী করে রাখতে পারছে না– যেসব দেশে প্রাচীন ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত বেশি সে-সব দেশেও নয়। কাজেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাচীন চিন্তার দোহাই একালে বাস্তবিকই অচল। সংস্কৃতি মানুষের সৌখীন পোষাক—পরিচ্ছদ নয়, তা তার জীবন-যুদ্ধের অস্ত্র—আর অস্ত্রের প্রাচীনতাই তার গৌরবের বিষয় নয়।

আমাদের দেশের একশ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই ব্যাপারের দিকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকান। আমাদের বর্তমান শক্তিহীনতার কথা তাঁরা বোঝেন, আর বুঝে তাঁরা এই ভাবেন যে এ অবস্থায় 'আক্রমণে'র চাইতে 'প্রতিরোধে'র মনোভাব বরণ করাই আমাদের জন্য প্রশস্ত। এই প্রতিরোধ মুখ্যত তাঁদের জন্য কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন। কূর্ম যেমন বিপদ-কালে নিজেকে গুটিয়ে নেয় তার আবরণের মধ্যে এঁরাও তেমনি আত্মরক্ষার প্রয়াসী হন দেশের বা সমাজের সনাতন ভাবধারার আশ্রয়ে। কিন্তু এই চিন্তাধারা খুবই দুর্বল। কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন করে' বিশেষ বিশেষ প্রাচীন সম্প্রদায় জগতের নানা স্থানে আজো টিকে আছে, কিন্তু তারা নাম পেয়েছে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় অথবা বর্বর সম্প্রদায়। জগতে বাস্তবিকই তারা পিছিয়ে পড়েছে। সাবধানতা সাধারণত একটি সদগুণ, কিন্তু তা যদি হয় পরাজয়-স্বীকৃতির অন্য নাম তবে তার চাইতে দোষার্হ আর কিছু নেই।

"বাংলার মুসলমানের সংস্কৃতি" সম্পর্কে দুই একটি কথা বলতে গিয়ে আমাদের এই ভূমিকার অবতারণা করতে হলো। বাংলার মুসলমানের উৎপত্তির কথা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।[১৩] তাতে দেখেছি, বৌদ্ধ, হিন্দু, পাঠান আর আরব ইত্যাদি বিচিত্র উপাদানে এই সমাজ গঠিত।

---

১৩. দ্রঃ 'বাংলার মুসলমানের কথা'

কিছুদিন পূর্বেও এই সমাজে দুইটি শ্রেণী ছিল : একটি সম্ভ্রান্ত "আশরাফ", অপরটি সাধারণ "আতরাফ", এবং এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদান প্রায় ছিল না বললেই চলে— কতকটা হিন্দুর জাতিভেদের মতো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এমনি বিচিত্র সমাজ ও মত ভারতবর্ষের প্রশস্ত বুকে স্থান লাভ করেছে। ক্ষুদ্র সংহতি জীবনই মুখ্যত তাদের উপজীব্য হয়েছে, বৃহত্তর দেশ সম্বন্ধে চেতনা কদাচিৎ অনুভূত হয়েছে। এই যে এক ধরনের "যত মত তত পথ" অথবা "যত পথ তত মত" তত্ত্বের সূত্রে ভারতবর্ষের লোকদের জীবন গ্রথিত হয়েছিল তাতে কিছু শান্তি হয়ত ভারতীয় সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; কিন্তু যার অভাব ঘটেছিল তার নাম সচেতনতা। হাজার বৎসর পূর্বে আলবেরুনী এটি লক্ষ্য করেছিলেন, আর আজো এটি কম লক্ষ্যযোগ্য নয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধনা সম্বন্ধে আমাদের একালের অনেক চিন্তাশীলের এই যে এক সিদ্ধান্ত যে অনন্ত বৈচিত্র্যের ভিতরে একত্বের সন্ধান করতে হবে, এটি আংশিক ভাবেই গ্রহণযোগ্য। সত্য শুধু মানস ব্যাপার নয়, বিশেষভাবে সামাজিক ব্যাপার; বৈচিত্র্য কম হোক আর বেশি হোক তার ভিতরকার একত্ব হওয়া চাই সুদৃঢ়— সামাজিক অর্থে; আর ততখানি বৈচিত্র্যই স্বীকার্য যা এই সুদৃঢ় একত্বের অনুকূলে। ফলের প্রাচুর্যে ডাল যদি ভেঙ্গে পড়ে তবে তা ফল ও ডাল দুইয়েরই জন্য হয় অসার্থক।

বাংলায় মুসলমানের আবির্ভাব হয়েছে অন্তত সাত শতাব্দী পূর্বে। কিন্তু তার এই দীর্ঘ জীবনের ইতিহাস অতি সামান্যই আমরা জানি। যেটুকু জানি তাতে বলা যায়, তার "সম্ভ্রান্ত" ও "সাধারণ" শ্রেণীর মধ্যে দুই বিভিন্ন ইসলামী সংস্কৃতি বলতে যা বোঝা যায় তার, আর যাঁরা "সাধারণ" তাঁদের জীবন সাধারণত চলতো তাঁদের পূর্বপুরুষদের ধারায়।[১৪] অবশ্য দেশের সমস্ত সমাজের মোটের উপর সন্তুষ্ট ছিল তাদের ভাগ্য নিয়ে। এমনিভাবে দীর্ঘকাল কাটবার পরে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলায়, লাভ হলো ইয়োরোপের স্পর্শ। এই স্পর্শে প্রথমে দেশের যা ফল লাভ হলো এক হিসাবে তা বহুমূল্য, কেননা হিন্দু-মুসলমান দেশের সব সমাজেই আত্ম-অন্বেষণ সক্রিয় হলো এবং দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে অনেক মহিমাময় ব্যক্তির আবির্ভাব হলো।

কিন্তু অচিরেই দেশের মনোভাব পরিবর্তন ঘটলো। দেশ মুগ্ধ হয়েছিল ইয়োরোপের ভাবুক-রূপের দ্বারা। কিন্তু ইয়োরোপের প্রভুরূপের সঙ্গে পরিচিত হতে তার দেরী হলো না এবং তার ফলে তার ইয়োরোপের পূজা রূপান্তরিত হলো ইয়োরোপ-বিদ্বেষে বা ইয়োরোপ-ভীতিতে।

---

১৪ . দ্রঃ হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ: প্রথম বক্তৃতা

এই ইয়োরোপ-বিদ্বেষ বা ভীতির সঙ্গে দেশের একালের রাজনৈতিক চেতনা সম্বন্ধ। সুতরাং আমাদের একালের সাংস্কৃতিক চিন্তারও গভীর যোগ এই বিদ্বেষ বা ভীতির সঙ্গে।

আত্মরক্ষার জন্য কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বনের উল্লেখ আমরা করেছি। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সাংস্কৃতিক চেতনা বলতে মোটের উপর বোঝেন এই কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন—বিপন্ন কূর্মের মতো অক্ষম আক্রোশ হয়ত তাঁদেরও এই চেষ্টার আনুষঙ্গিক। কিন্তু যাঁরা প্রধানত বিদ্বেষপরায়ণ বা ভীত তাঁদের স্বাভাবিক মনুষ্যত্বে গ্লানি পৌছেছে—সুচিন্তা, অর্থাৎ কল্যাণপ্রসূ চিন্তা, সেই অবস্থায় আর তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাঁদের সঙ্গে সংস্কৃতির মতো গুরু বিষয়ের আলাপ আলোচনা না করাই হয়ত শোভন। কিন্তু তাঁদের আত্মীয়স্থানীয় অপর একটি দল আছেন, তাঁরা সময় সময় চিন্তাশীল বলে' আদৃত হল। তাঁরা বলতে চান : চিন্তা উচ্চাঙ্গের অথবা সারগর্ভ হলেই জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য হয় না, গ্রহণযোগ্য হয় তাদের অভ্যস্ত ভাবধারার অনুকূল হলে; এতকাল এদেশের লোকে বিভিন্ন সমাজে ও ধর্মে বিভক্ত হয়ে জীবন অতিবাহিত করে এসেছে, আজ যদি তাদের— তা যে প্রয়োজনেই হোক— বলা হয় যে তাদের সেই ভাবধারা তাদের জন্য আর কল্যাণপ্রসূ নয়, তবে তাদের বিহ্বল ও বিভ্রান্তই করা হবে বেশি, তাদের পথের নির্দেশ দেওয়া হবে মনে হয় না। এই শ্রেণীর ভাবুকদের বড় ত্রুটি এইখানে যে যে-চিন্তাকে তাঁরা জনসাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য জ্ঞান করেন সেটি— অথবা অন্য কোন চিন্তাধারা— তাদের নিজেদের সহজবোধ্য হয়েছে কিনা সে জিজ্ঞাসার' সম্মুখীন হন তারা কদাচিৎ। অথচ কে না জানে যে সার্থক প্রচার আমাদের দ্বারা তখনই সম্ভবপর যখন কোনো মত বা পথ আমরা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছি। মানুষের নব নব ইতিহাস নিয়তই রচিত হচ্ছে, আর রচিত হচ্ছে তাঁদের দ্বারা নয় যাঁরা বুদ্ধিমান কিন্তু দ্বিধান্বিত, পরন্তু, তাঁদের সত্য ও কল্যাণকে বুঝবার চেষ্টায় যাঁদের ত্রুটি নেই সঙ্গে সঙ্গে যা তাঁরা সত্য ও কল্যাণকর বলে বুঝেছেন তাতে আত্মসমর্পণ করেছেন। সংস্কৃতির একটি সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে সুন্দরের সাধনা। যাঁদের ব্যক্তিতান্ত্রিক প্রবণতা বেশি তাঁদেরও এই সংজ্ঞা হয়ত মনঃপূত হবে। কিন্তু সুন্দর তো শুধু মোহকর নয়, সুন্দর বিশেষভাবে সত্যাশ্রয়ী— জগৎ ও জীবনের সঙ্গে তার যোগ যেমন দৃঢ় তেমনি তার গতি সার্থকতা লাভের দিকে। সত্যাশ্রয়িতা, অর্থাৎ সত্য উপলব্ধির চেষ্টা আর সার্থক হবার আকাঙ্ক্ষা, যাঁদের অন্তরের ধর্ম নয় তাঁরা জ্ঞানীও নন কর্মীও নন।

এই সত্যাশ্রয়িতার দৃষ্টিভূমি থেকে যদি আমরা বাংলার মুসলমানের সংস্কৃতির দিকে তাকাই তাহলে কি দেখব? দেখব— নানা দৈন্যে বাংলার মুসলমান

জর্জরিত, আর্থিক দৈন্য তার যত তার চাইতে অনেক বড় তার ভাবে দৈন্য, সঙ্কল্পের দৈন্য। মুসলমান হিসাবে প্রতিমা পূজায় আপত্তি জানিয়ে সে প্রকৃত জীবন অনেকখানি অস্বীকার করেছে; কিন্তু জীবনে বড় কথা 'অস্বীকার করা' নয় বরং বড় কথা হচ্ছে 'স্বীকার করা'— মুসলমানের স্বীকার করা উচিত ছিল সজাগ-মানব-জীবন অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেমের জীবন ইসলামের অর্থ কেবল তাই হতে পারে। কিন্তু তেমন করে স্বীকার সে কিছুই করতে পারে নি— যা স্বীকার করেছে অথবা করতে চেয়েছে তা তুচ্ছ আচার-পূজা ভিন্ন আর কিছু নয়।

তা অতীত যা-ই হোক তার চাইতে বড় কথা বর্তমানের প্রয়োজন। সেই বর্তমানে তার অজ্ঞান ও অভাবাত্মক মনোভাব দূর হোক, সে স্বীকার করুক ভাবাত্মক মনোভাব জাগ্রত আদর্শ। যে-জ্ঞান-ও-প্রেমের জীবন তার স্বীকার করা উচিত ছিল সৌভাগ্যক্রমে তা শুধু আজ তারই স্বীকার্য নয়, জগতের সবারই স্বীকার্য, জগতের বিভিন্ন দেশের বা বিভিন্ন সমাজের মানুষের পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে বলে। সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিতে বৈশিষ্ট্য ও বিরোধ আজ প্রধানত অতীতের কথা। আজ বড় কথা সে সবের প্রাণশক্তির সন্ধান যা থেকে সম্ভবপর হবে জাতিতে জাতিতে অথবা সমাজে সমাজে গাঢ়তর সহযোগিতা ও মঙ্গলতর ভবিষ্যৎ। মানুষের বিচিত্র সংস্কৃতির সেই প্রাণশক্তি আজ চিন্তার ক্ষেত্রে নাম পেয়েছে বৈজ্ঞানিকতা ও মানবহিত আর কর্মের ক্ষেত্রে নাম পেয়েছে সুব্যবস্থিত রাষ্ট্র-জীবন। একালে বাংলার মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনও প্রতিষ্ঠিত হবে সেই বৈজ্ঞানিক মানব-হিত ও সুব্যবস্থিত রাষ্ট্রের ভিত্তির উপরেই।

দেশের হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের কথা এ ক্ষেত্রে সহজেই ওঠে। এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যাঁরা বলছেন, হিন্দু-মুসলমানের পৃথক রাষ্ট্র-জীবন ভিন্ন এর সমাধান নেই তাঁদের কথা বোঝা যাচ্ছে না এই কারণে যে রাষ্ট্র জীবনের অর্থ হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রভূত ক্ষমতা সমন্বিত সংহতি জীবন, কিন্তু ভারতবর্ষের মতো ভৌগোলিক অবস্থানের দেশে সেই ক্ষমতা সমস্ত দেশের পক্ষে লাভ হওয়াই সম্ভবপর মনে হয়, প্রদেশ-বিশেষের বা অংশবিশেষের জন্য তা একান্তই দুঃসাধ্য। আমরা যতটা ভাবতে পেরেছি তাতে মনে হয়েছে ভারতবর্ষের অথবা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা যদি নিজেদের কোনো রকমের সত্যকার উন্নতি চায় তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই, এবং এই জন্যই তাদের অতীত ও বর্তমানের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা সুসঙ্গত হওয়া চাই তাদের জীবনের এই এক শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনের সঙ্গে। বলা বাহুল্য এই সম্মিলন বৈচিত্র্য-হীন হতেই পারে না— কিন্তু বৈচিত্র্য যেন কদাচ বিপন্ন না করে একত্বকে। আজকার বিবর্দ্ধিত বিরোধের দিনে এই চিন্তাধারা কারো কারো মনে

হতে পারে অবাস্তব। এই 'বাস্তব' বাদীদের সৃষ্টি এই কঠিন বাস্তবতার দিকে আকৃষ্ট করেছে তাতে শক্তিতে শক্তিতে বোঝাবুঝির পরিচয় নেই আদৌ, আছে দুর্দৈব ও দুর্বুদ্ধির পরিচয় মাত্র। অবশ্য রোগভোগ দীর্ঘদিন ধরে' চললে তাকেই সময় সময় ভ্রম হয় স্বাভাবিক অবস্থা বলে। কিন্তু রোগ রোগই— তা কদাচ স্বাস্থ্য নয়।

হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জীবন ভিন্ন আর কিছু যদি এদেশে সম্ভবপর না হয় তবে হিন্দু-সংস্কৃতি মুসলমান-সংস্কৃতি আর্য-সংস্কৃতি সেমীয়-সংস্কৃতি এসব কথা হয়ে পড়ে দায়িত্বহীন, এবং এসবের প্রচলন আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে যত কম হয় ততই মঙ্গল—ততই চিন্তার সৌখিনতা আমাদের ঘুচবে আর আমরা সত্যাশ্রয়ী হব। সার্থক সমাজ সত্তার দিক দিয়ে বাংলার মুসলমান অথবা হিন্দু বাংলার অথবা বিশাল ভারতবর্ষের অংশ ভিন্ন যখন আর কিছু নয় তখন তার সাংস্কৃতিক জীবনের সার্থকতা লাভের পথ এই বিশাল সত্তার সঙ্গে তার গূঢ় যোগ উপলব্ধির ভিতর দিয়েই—ঝরণার সার্থকতা যেমন নদীর পুষ্টিসাধন করে'—এ সত্য যত অকপটভাবে স্বীকার করা যাবে ততই শক্তি ও শ্রী লাভের পথে আমরা অগ্রসর হব।

আজকার অসার্থক সংস্কৃতি-চিন্তার স্তর থেকে সার্থক সংস্কৃতি-চিন্তার স্তরে উপনীত হতে হলে যে সব ধাপ আমাদের অতিক্রম করতে হবে তার কিছু নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে এইভাবে :

(১) দেশে অভুক্ত ও কর্মহীন কেউ থাকবে না।

(২) একান্ত বীভৎস না হলে কোনো সমাজেরই ধর্মাচার অশ্রদ্ধেয় বিবেচিত হবে না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে যে—যা প্রাচীন তা প্রাচীন বলেই বরণীয় নয়, বরণীয় তার বর্তমান কার্যকারিতার জন্য।

(৩) হিন্দু-মুসলমানের পোষাক ও নামের ব্যবধান থাকবে না অথবা অস্বীকার করা হবে।

(৪) সামাজিক আদান-প্রদান-বিবাহ-আদি সমেত-সর্বত্র সহজ হবে।

(৫) আইন সমস্ত দেশের জন্য এক হবে।

১৩৪৮

বিষয়টি বিরাট। বিজ্ঞেরা জানেন এটি কোরআন-তত্ত্বের গোড়ার কথা; উৎকট অদৃষ্ট-বাদ, মোতাজেলা যুক্তি-বাদ, সুফীর অন্তর্জ্যোতি-বাদ, ইত্যাদি মুসলিম দার্শনিক মতামতের উৎপত্তি-কেন্দ্রও প্রায় এইটি। কিন্তু এসব জটিল ব্যাপার ত্যাগ করে' আমরা বরং দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চাচ্ছি মানুষের প্রতিদিনের জীবন-যাত্রার দিকে। মানুষের সেই প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে কোরআন-বর্ণিত আল্লাহর কি যোগ?

কোরআনের পাঠকদের সহজেই চোখে পড়ে আল্লাহর স্বরূপ-নির্দেশ সম্পর্কে বাগবিস্তারে কোরআনের আপত্তি। কোরআনের এই ধরনের যে সব উক্তি— মানুষকে জ্ঞান সামান্যই দেয়া হয়েছে (১৭:৮৫), আল্লাহ মানুষকে যেটুকু জানান তার বেশি তাঁর সম্বন্ধে ধারণা করবার শক্তি মানুষের নেই (২:২৫৫) —এ সব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, আল্লাহর স্বরূপ—জিজ্ঞাসা কোরআনের অনভিপ্রেত। অথচ কোরআনে যদি কোনো একটি ব্যাপার অত্যুগ্র হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে আল্লাহর কথা— আল্লাহর মহিমার অন্ত নেই, করুণার অন্ত নেই, চিরজাগ্রত তিনি, অন্যায়ের কঠোর শাস্তিদাতা তিনি— এ-সব কথা বারংবার কোরআনে উচ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভালমন্দের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত, এ বিষয়ে কোরআন নিঃসন্দেহ— যেমন নিঃসন্দেহ, তিনি দুর্জ্ঞেয়, সে-সম্বন্ধে।

আর শুধু কোরআন নয়, জগতের অন্যান্য বিখ্যাত ধর্ম্মগ্রন্থ ও জগতের অনেক মনীষীও 'আল্লাহ' সম্বন্ধে এই মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন—আল্লাহ্ যে স্বরূপত দুর্জ্ঞেয় অথচ এই দুর্জ্ঞেয় আল্লাহ্‌র সঙ্গেই মানুষের প্রতিদিনের জীবন নিবিড়ভাবে যুক্ত এ সব তাঁদের অন্তরতম কথা।

কিন্তু প্রশ্ন এই দাড়ায় : যাঁকে জানা যায় না অথবা অতি সামান্যই জানা যায় তিনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবলম্বন হবেন কেমন করে? এই কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েই যোগী সুফী প্রভৃতি রহস্যবাদীরা অবলম্বন করেছেন কৃচ্ছসাধনা, কল্পনাকুশলীরা প্রশ্রয় দিয়েছেন প্রতীক-চর্চা, আর সমাজ-শৃংখলা-বাদীরা জোর দিয়েছেন বিধি-নিষেধ পালনের উপরে।

এর কোনটির কি মূল্য সে-সব তর্কও আপাতত আমাদের পরিত্যাজ্য; আমরা তাকাতে চাচ্ছি কোরআনের একটি বিশেষ উক্তির দিকে: সব চাইতে ভাল ভাল নাম আল্লাহর (৭:১৮০)। অন্য কথায়, কোরআনের মতে, সব চাইতে শ্রেষ্ঠ গুণসমূহে আল্লাহ বিভূষিত; আর কোরআন নির্দেশ দিচ্ছেন এই সব শ্রেষ্ঠ নামে

তাঁকে ডাকতে, অর্থাৎ তাঁর শ্রেষ্ঠ গুণসমূহ স্মরণে রাখতে। বলা বাহুল্য এই থেকেই ধর্মভীরু মুসলমানের তসবীহ্ পাঠ। কিন্তু আল্লাহর এই সব শ্রেষ্ঠ গুণ স্মরণ করার প্রকৃত অর্থ কি, তার নির্দেশ রয়েছে হজরতের এই বিখ্যাত বাণীতে : আল্লাহর গুণাবলীতে ভূষিত হও, —'অর্থাৎ আল্লাহ বলতে যেসব শ্রেষ্ঠ গুণ তোমার চিন্তায় আসে সে-সব নিজের ভিতরে সৃষ্টি কর। কোরআনে মানুষকে বলা হয়েছে জগতে আল্লাহর প্রতিনিধি, সূর্য্য চন্দ্র দিবস রজনী এ সব প্রাকৃত ব্যাপারও মানুষের অধীন (১৪:৩৩) নিশ্চয় সেখানে সেই মানুষের কথা বলা হয়েছে যে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত অর্থাৎ যে বহু সদগুণসমন্বিত শক্তিমান ব্যক্তি।

ধর্মভীরু মুসলমানেরা প্রতিদিন আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নাম বা গুণসমূহ স্মরণ করেন। তাঁরা তাঁকে ৯৯ নামে ডাকেন, যেমন, তিনি করুণাময়, মহিমাময়, সুন্দর, কঠোর শাস্তি দাতা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য তাঁর শ্রেষ্ঠ নামের শেষ নেই (৫:২৩)। কিন্তু এই স্মরণ করার অর্থ যে শুধু মুখে উচ্চারণ করা নয়, মন দিয়ে উপলব্ধি করা ও চরিত্রে এ-সবের প্রভাব ফুটিয়ে তোলা, সেই বড় কাজটাই চাপা পড়ে গেছে। ফলে আল্লাহর এই শ্রেষ্ঠ নামসমূহ স্মরণ ও শুষ্ক আদেশ-পালনের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু চিন্তা করলে বোঝা যাবে কোরআনের এই যে বাণী ও হজরতের এই যে নির্দেশ এর মধ্যে এমন একটি ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে যা উপলব্ধি করতে পারলে দুর্জ্ঞেয় আল্লাহর সঙ্গে আমাদের এমন একটি যোগ স্থাপিত হয় যাতে আমাদের প্রতিদিনের জীবনে শক্তি-সঞ্চার হয়—আমাদের জানার আকাঙ্ক্ষা খানিকটা তৃপ্ত হয়, আমাদের অনুভূতিকেও খানিকটা সজীব করে' তোলা হয়।

দৃষ্টান্ত থেকে বুঝতে চেষ্টা করা যাক। ধরুন—আল্লাহকে বলা হয়েছে সুন্দর সেই ব্যাপারটি। আল্লাহ স্বরূপত কি, তা কে বলবে? কিন্তু তিনি সুন্দরের চরম—এই কথা ভাবতে তাঁর ভাবনা একটা অবলম্বনযোগ্য আদর্শের মতো আমার মনের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল। সেই আদর্শ মনোগত, বস্তুগত নয়, কাজেই সেটির উৎকর্ষ হচ্ছে আমার বুদ্ধি বিবেচনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। আর সব চাইতে বড় কথা এই যে এটি আমার সৌখীন কল্পনা নয়, এটিকে আমি অবলম্বন করেছি আমার জীবনের লক্ষ্য হিসাবে— আল্লাহ পরম সুন্দর এই ভাবনা আমার ভিতরে দিন দিন এনে দিচ্ছে আমার নিজের সমস্ত কাজে ও চিন্তায় সুন্দর হবার তাগিদ। তেমনি ধরুন—তাঁর করুণাময় নাম। তাঁকে করুণার শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে বুঝে আমি চেষ্টা করছি সেই করুণার ভাব আমার মধ্যে সঞ্জীবিত করে' তুলতে। এমনিভাবে বোঝা যেতে পারে তাঁর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ নাম ও আমাদের জীবনের বিকাশের উপরে সে-সবের শক্তি। আল্লাহ সম্বন্ধে এই সব ধারণায় আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতি কিছু তৃপ্ত

হচ্ছে এই জন্য যে, আল্লাহ দুর্জ্ঞেয় এই কথা বলে' আমরা হৃদয় ও মনে সমস্ত দাবিতে স্তব্ধ করে দিতে চেষ্টা করছি না, বরং আমরা আবিষ্কার করেছি এই দুয়ের চরিতার্থতার একটি পথ— আল্লাহ বলতে আমরা বুঝছি জীবনের এক অন্তহীন অগ্রগতির তাগিদ, সেই তাগিদে ও চলার পথের বিচিত্র সৌন্দর্যে আমাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয় দুইই সচেতন ও আনন্দিত।

আল্লাহকে যদি এইভাবে শ্রেষ্ঠ গুণের সমষ্টি বোঝা যায়, তবে আল্লাহ বাস্তবিকই আমাদের আকর্ষণ-স্থল হয়ে দাঁড়ান—আমাদের বহু ব্যর্থতাময় দৈনন্দিন জীবনে তিনি হয়ে ওঠেন গভীরভাবে অর্থপূর্ণ। তখন মুসলমানেরা এই যে প্রতিদিনের বহুবারের প্রার্থনা—আমাদের সোজা পথে চালাও—সেটি প্রার্থনাকারীর হৃদয়-মনকে সত্যকারভাবে উদবোধিত করে, কেননা সোজা পথ বলতে কি বোঝা হচ্ছে, গতি হয়েছে আমাদের কোন দিকে, সে-বিষয়ে অনেক কথা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। জীবনের অর্থ এইভাবে অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে উঠলে ধর্মের বিধি-বিধানের তাৎপর্যও স্পষ্ট হয়ে ওঠে; তখন বুঝতে দেরী হয় না যে, ধর্মের বিধি-নিষেধ কোনো নিষ্ঠুর প্রভুর কষ্টদায়ক হুকুম নয়, বরং সে-সব হচ্ছে জীবনকে উন্নতির দিকে পরিচালনার নিয়মশৃঙ্খলা— নদীর ধারাকে পরিচালনা করার জন্য যেমন তার দুই তীর। তখন আরো বোঝা যায়, তাই ধর্ম যা জীবনের বিকাশের সহায়ক আর তাই অধর্ম যা তেমন সাহায্য করে না, যেমন তাই খাদ্য যা বল দেয়, তা খাদ্য নয় যা বল দেয় না। সুবিজ্ঞ বিচারক যেমন বিচিত্র ও জটিল আইনের মধ্যে দেখেন জীবনের প্রয়োজন ও সেই দৃষ্টি দিয়ে দেখে তার সুব্যাখ্যার চেষ্টা করেন, কখনো কখনো করেন নূতন ক্ষেত্রে তার নূতন প্রয়োগ, আল্লাহর অভিমুখে যাত্রীও ধর্মের মর্মের সন্ধান পান ও জীবনের প্রয়োজনে নূতন নূতন ক্ষেত্রে তার নূতন নূতন প্রয়োগ ও পরীক্ষা করে চলেন।

পরম দুর্জ্ঞেয় আল্লাহকে কোরআন যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এমন ব্যবহারযোগ্য করেছেন এ মানুষের এক বড় লাভ।

১৩৪৯

ইকবালের যে প্রধান মতবাদ– আত্মতত্ত্ব বা আমিত্ব-তত্ত্ব– তার বিবৃতি পাওয়া যাবে তাঁর আসরার-ই-খুদী নামক পার্সী গ্রন্থে। ডক্টর নিকলসন Secrets of the self নাম দিয়ে এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। বাংলাতেও এ গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

ইকবালের জন্ম ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ইয়োরোপে গমনের পূর্বেই তিনি উর্দু-কবি-সমাজে একজন শক্তিমান নবীন কবিরূপে আদৃত হন। কেম্ব্রিজে তিনি দর্শন অধ্যয়ন করেন ও কৃতী ছাত্ররূপে পরিগণিত হন, আর জার্মানীর ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর উপাধি লাভ করেন তাঁর The Development of the Metaphysics in Persia সন্দর্ভের দ্বারা। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন প্যান-ইসলাম-বাদে দীক্ষিত হয়ে আর কবিতা রচনায় বীতস্পৃহ হয়ে। বন্ধুদের আগ্রহে তিনি পুনরায় কবিতা রচনায় মন দেন। তাঁর আসরার-ই-খুদী প্রকাশিত হয় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে।

আসরার-ই-খুদী সম্পর্কে তাঁর কেম্ব্রিজের গুরু ও বন্ধু দার্শনিক Mac Taggart এর এই চিঠিখানা অর্থপূর্ণ :

> তোমার কবিতাগুলো (Secrets of the Self) পড়ে বড় খুশী হচ্ছি, সে কথা জানাবার জন্য এই চিঠি লিখছি। তোমার চিন্তাধারা আগের তুলনায় অনেক বদলে যায়নি কি? সেদিনে আমরা দুজনে যখন একত্রে দর্শন আলোচনা করতাম তখন তুমি অনেক বেশি মরমিয়া ও সর্বব্রহ্ম, বাদী (Pantheist) ছিলে। আমি নিজে বলবৎ আছি আমার পূর্বের প্রত্যয়ে যে ব্যক্তিসত্তা-সমূহ (Selves) হচ্ছে চরম সত্তা (ultimate reality), তাদের প্রকৃত অর্থ ও সার্থকতা বোঝা যাবে অনন্তকালে (পূর্বেও আমার এ ধারণা ছিল।), কালক্রমে নয়, এবং কর্মে তত নয় যত প্রেমে। হয়ত আমাদের এই পার্থক্য বেশির ভাগ মাত্রাগত— আমাদের বিভিন্ন দেশের কি কি প্রয়োজন সেইটি হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের প্রধান ভাবনার বিষয়। তুমি ঠিকই বলেছ যে ভারতবর্ষ বড় বেশি ধ্যানী। কিন্তু ইংল্যান্ড— ও ইয়োরোপ— যে যথেষ্ট ধ্যানী নয় সে—বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই শিক্ষা তোমাদের কাছ থেকে আমাদের নেবার আছে, আমাদের কাছ থেকেও যে তোমাদের কিছু শিখিবার আছে তাতে ভুল নেই।[১৫]

---

১৫. The poet of the East-by Abdullah Beg.

মরমী-বাদ ও সর্বব্রহ্ম-বাদ থেকে ব্যক্তিত্ব-বাদে, অর্থাৎ চরম সত্তায় বা ভগবানে বা আল্লাহয় ব্যক্তিত্ব—বিসর্জন-তত্ত্ব থেকে সেই চরম সত্তার সাহায্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ তত্ত্বে কেমন করে' ইকবালের পরিবর্তন ঘটলো তাঁরা কাব্যের ভিতরে তার কিছু কিছু পরিচয় থাকলেও বিস্তারিত পরিচয় নেই, তাঁর কাব্যে বিস্তারিত পরিচয় আছে তাঁর ব্যক্তিত্ব-বাদেরই। তবে বাইরের কোন কোন ঘটনার প্রভাবে (Mac Taggart এর ভাষায় তাঁর দেশের কি প্রয়োজনে) তাঁর মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটে তা বোঝা কঠিন নয়।

নবীন কবি ইকবালের অন্তরে স্বদেশানুরাগ যথেষ্ট প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল— তাঁর 'হিমালয়' 'বুদ্ধ' 'নানক' 'নূতন শিবালয়' প্রভৃতি কবিতায় রয়েছে তাঁর সেই অনুরাগের পরিচয়। কিন্তু স্বদেশের দুঃখমূর্তি তাঁর চোখে প্রকট হলো বেশি। এ সম্বন্ধে তাঁর তসবীর-ই-দর্দ (ব্যথার ছবি) নামক কবিতা (১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার কয়েকটি চরণ এই :

আমার কাহিনীর এ প্রার্থনা নয় যে ধৈর্য ধরে তোমরা শুনবে।
স্তব্ধতাই আমার বাণী, ভাষাহীনতাই আমার ভাষা॥

হায় হিন্দুস্থান, তোমাকে দেখে কেবল উদ্‌গত হয় আমার অশ্রু।
সব কাহিনীর মধ্যে তোমার কাহিনী স্মরণ করায় অপরাধ॥

আকাশের আস্তিনে লুকানো রয়েছে বজ্র।
এই বাগানের বুলবুলিরা তাদের কুলায়ে নিশ্চিন্ত না থাকুক।

তাঁর স্বদেশবাসীদের তিনি বলেন "ছিন্ন জপমালা" সেই জপমালা তিনি আবার দেখতে চান গ্রথিত; অদূরদর্শী ভারতবাসীকে তিনি বলেন সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিতে একতার পথে অগ্রসর হতে।

ইয়োরোপে গিয়ে মুসলমান দেশসমূহের দুর্দশা ও বিপদ সম্বন্ধে তিনি বেশি সচেতন হন ও স্যার আবদুল্লাহ সুহরাওয়ার্দি প্রভৃতির সঙ্গে Pan Islam Society গঠন করেন।

দেখা যাচ্ছে ভারতের দুর্দশা, আর বিশেষ করে' মুসলমান-দেশ—সমূহের বিপদ, তাঁকে পরিচালিত করেছে তাঁর আমিত্ব-তত্ত্বের পানে। একালের মুসলমান চিন্তাশীলদের মধ্যে সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানীর কাছে তিনি বিশেষভাবে ঋণী। আফগানী উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের লোক। ধ্বংসশীল মুসলিম জগতের কানে

তিনি দেন বিজ্ঞান অনুশীলনের ও রাষ্ট্রশক্তি লাভের মন্ত্র। তাঁর মন্ত্র মধ্য-প্রাচ্যের মুসলিম-দেশসমূহে ফলপ্রসূ হয়েছে। কিন্তু এই মনীষী প্রধানত গ্রহণ করেছিলেন রাজনৈতিক প্রচারকের ব্রত। ইকবাল আরো গভীর করে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন মুসলমানের পতনের কারণ। তিনি বুঝলেন, তাদের পতনের মূলে সুফীমতের আত্মবিসর্জন ও বৈরাগ্য বাদ—সেই আত্মবিসর্জন ও বৈরাগ্য-বাদ পরিহার করে' তাদের হতে হবে আত্মবিকাশশীল ও সংসারে বরেণ্য।

এই ধরনের আত্ম-তত্ত্বের সন্ধান তিনি যে পান জার্মান দার্শনিক নীটশের কাছ থেকে একথা ডক্টর নিকলসন বলেছেন। তাঁর কথা মিথ্যা নয়। তবে নীটশের শক্তিবাদে ও ইকবালের শক্তিবাদে বড় রকমের পার্থক্যও রয়েছে। নীটশে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী এবং নারী ও জনসাধারণের মূল্য ও মর্যাদায়ও অবিশ্বাসী; ইকবাল ঈশ্বরে বিশ্বাসী আর পুরোপুরি গণতান্ত্রবাদী না হলেও জনসাধারণের মহত্তর সম্ভাবনায় আস্থাবান; নারীকে তিনি নরের সমকক্ষ জ্ঞান করেন, তবে নারী-প্রকৃতির মাধুর্য ও সৌন্দর্য তাঁর শ্রদ্ধার সামগ্রী, নারীকে তিনি দেখতে চান সুগৃহিণী ও জননী রূপে।

আমাদের মনে হয়েছে ইকবালের শক্তিবাদ নীটশের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও এর লালনে বিশেষ সাহায্য করেছে গ্যেটের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারা। গ্যেটের প্রতি ইকবাল যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান; তাঁর "প্রতীচ্য-প্রাচ্য-দিউয়ানে"র স্মরণে ইকবাল লিখেছেন পায়াম-ই-মশরেক (প্রাচ্যের বার্তা), তাঁর বিখ্যাত Six Lectures- এ তিনি উদ্ধৃত করেছেন গ্যেটের কবিতা। মানুষের আমিত্ব যে লালনের ও বিকাশের সামগ্রী, বিসর্জন দেবার জন্য নয়, এই মত যেমন ব্যক্ত হয়েছে গ্যেটের বহু লেখায় তেমনি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্বে। এ- সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে :

(১) গ্যেটে তাঁর ছেলেবেলায় এক অভিনব পদ্ধতিতে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁর পিতা অনেক খনিজ দ্রব্য সংগ্রহ করেছিলেন। একদিন চুপে চুপে সে-সব তিনি একখানি সুদর্শন কাষ্ঠখণ্ডের উপরে সাজালেন। এসব হলো প্রকৃতির বৈচিত্র্যের প্রতীক; আর সেই খনিজ দ্রব্যের স্তূপের উপরে 'প্যাসটেল' পেন্সিল রেখে তাতে আগুন ধরালেন উদীয়মান সূর্যের দিকে আতস-কাচ ধরে—উদ্দেশ্য, এইভাবে প্যাসটেলে আগুন ধরে' যে ধুম কুন্ডলী পাকিয়ে উঠবে তা হবে প্রকৃতির বৈচিত্র্যের উপরে মানুষের মনের স্তরের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু প্যাসটেল পেন্সিল পুড়ে নিচে কাষ্ঠখণ্ডে আগুন ধরে ও তা নষ্ট হয়ে যায়। এই ঘটনার উপরে গ্যেটে এই মন্তব্য করেছেন :

এই ধরনের ঈশ্বরলাভের বাসনায় সর্বদা যে বিপদ বিদ্যমান এই দুর্ঘটনাকে গণ্য করা যেতে পারে সে-সম্বন্ধে এক সঙ্কেত ও সাবধানবাণীর তুল্য। ইকবাল বলেছেন, ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরের বিসর্জন দেবার জন্য নয় বরং পরম-ব্যক্তি ঈশ্বরের গুণ আত্মস্থ করে' বিকশিত হবার জন্য।

(২) গ্যেটে তাঁর বিখ্যাত 'নরদেবতা' (Divine) কবিতায় বলেছেন : সমস্ত প্রকৃতি অন্ধ নিয়মের দ্বারা শাসিত, কেবল মানুষের মধ্যেই আছে বিবেক, এর দ্বারা সে

ভালমন্দের বিচার করে, যা মহৎ তাকে লালন করে, দেবতা বলতে যে মহিমার ধ্যান তারা করে সেই মহিমার প্রতিমূর্তি তারা হোক।

(৩) গ্যেটে নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদের বিরোধী ছিলেন; তিনি বলেছেন : যাতে ভাবের মুক্তি আনে কিন্তু সেই অনুপাতে আত্মাজয় এনে দেয় না তা অনিষ্টকর। তাঁর 'ফাউসট' নাটকে শয়তানকে বলা হয়েছে অস্বীকৃতিপরায়ণ আত্মা— The sprit that denies— অর্থাৎ মানুষের বা জগতের মহৎ সম্ভাবনায় সে অবিশ্বাসী, সে শুধু পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির অধিকারী। [ইকবাল আমিত্বের সাধনায় প্রেমের স্থান দিয়েছেন বুদ্ধির উপরে।]

(৪) গ্যেটে দেখতেও ছিলেন অসাধারণ। যৌবনে তাঁকে বলা হতো Apollo আর বার্ধক্যে বলা হতো Jupiter' নেপোলিয়ন তাঁকে দেখে বলেছিলেন Voila un homme! (একটা মানুষ বটে!)

(৫) ধর্মজীবন সম্বন্ধে গ্যেটে বলেছেন— নিজেকে শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, অবশ্য এই শ্রদ্ধা অহমিকা দুরাকাঙ্ক্ষা বর্জিত।

(৬) গ্যেটের একটি বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি চরণ এই :

কেউ পড়তে পারেনা 'নাস্তি'তে;
অব্যয় বাস করে সবার মধ্যে।
ধন্য হও তাই সত্তায়।
সত্তা চিরন্তন, নির্ধারিত নিয়মে
রক্ষা পায় তার চিরজীবন্ত সম্পদ;
তাতেই বিশ্বের মহিমময় রূপায়ণ।

নীটশে ছিলেন জরাথুস্ত্র, সীজার, হজরত মোহাম্মদ, গ্যেটে, মিরাবো প্রভৃতির ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। হজরত মোহাম্মদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর এক সঙ্গী বলেছেন যে, তাঁর মুখের পানে তাঁরা চাইতে সাহস করতেন না। আমাদের মনে হয়েছে হজরত মোহাম্মদের যে বিখ্যাত বাণী "আল্লাহর গুণে বিভূষিত হও," আর মনসুর হাল্লাজের যে বিখ্যাত উক্তি "আ'নাল হক' (সোহহম), এ-সবের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইকবালের নীটশে গ্যেটে-অনুপ্রাণিত ও লালিত শক্তিবাদ, আর শেষে তাঁর অবলম্বন হয়েছেন হজরত মোহাম্মদ, তাঁকে তিনি বলেছেন "ইনসান-ই কামেল" পূর্ণমানুষ Superman.

প্রাচ্যে আমিত্বকে সাধারণত ভাগ করা হয়েছে দুইভাগে— রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভাষায়— "পাকা-আমি" আর "কাঁচা-আমি। কাঁচা-আমি অজ্ঞান— তাড়িত দুর্বল উদব্যস্ত 'আমি', আর পাকা—আমি ঈশ্বরে বা সত্যে সমর্পিতচিত্ত প্রশান্ত 'আমি'। সেই 'আমি' সম্পর্কে

বুদ্ধদেব বলেছেন :

তোমরা নিজেরা নিজেদের প্রদীপ হও; নিজেরা নিজেদের আশ্রয়স্থল হও;

গীতা বলেছেন :

নিমিত্ত মাত্র হও— ভগবানের হাতের যন্ত্র হও;

বাইবেল বলেছেন :

জগতের অধিস্বামী হবে সহিষ্ণুরা;

কোরআন বলেছেন :

আল্লাহতে বিশ্বাস করো ও ভাল কাজ করো.....আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে চলো;

সুফীরা বলেছেন :

মরার আগে মরে যাও।

এসবের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই ঠিক তা নয়, এসব কথা মানুষের ইতিহাসকে যে-ভাবে প্রভাবিত করেছে সেদিকে তাকালে বরং যথেষ্ট পার্থক্যই চোখে পড়ে। তবে এ-সবের মধ্যে খুব মিল এইখানে যে সর্বত্রই মানুষকে বলা হয়েছে বিক্ষুব্ধ প্রাত্যহিক জীবনের উর্দ্ধে উঠতে, আর প্রশান্তিকে জ্ঞান করা হয়েছে বিশেষ কাম্য।

ইকবালের যে 'আমি' সেটি কি প্রাচ্যের এই পরিচিত পাকা-আমি? শোনা যাক ইকবাল কি বলেন :

আমিত্বের স্বরূপ হচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করা;
প্রতি কণায় ঘুমিয়ে আছে আমিত্বের বীর্য।

জীবন লুকিয়ে আছে অন্বেষণে,
এর মূল নিহিত রয়েছে চাই-মন্ত্রের মধ্যে।

জ্ঞান হচ্ছে জীবন রক্ষার একটি উপায়,
জ্ঞানের কাজ আমিত্বকে শক্তিমান করা।

আমি-রূপ যে আলো-কণিকা
তা এই মাটির তলায় লুকানো স্ফুলিঙ্গ।
প্রেমের দ্বারা বর্ধিত হয় এর বায়ু—
আরো তাজা হয়, আলো জ্বলে, আরো ঝলমল করে।

ইকবালের যে 'আমি', বোঝা যাচ্ছে, তা বিকাশের তাড়নায় চঞ্চল— 'প্রশান্ত' ঠিক নয়। কিন্তু এই 'আমি' সম্পর্কে তিনি আরো বলেছেন :

এক মুঠা ধূলি দিয়ে করো সোনা তৈরি,
পূর্ণ মানুষের দ্বারের ধূলি কর চুম্বন।

ওরে বেহুশ, অনুগত হতে শেখ,
আনুগত্য থেকে জন্ম হয় কর্তৃত্বের।

যার নিজের উপরে কর্তৃত্ব নেই
তার উপরে কর্তৃত্ব করবে অন্য জন।

আল্লাহর জন্য ভিন্ন যে তলোয়ার খোলে,
সেই তলোয়ারের খাপ হয় তার বুক।

সংসারে সর্বশক্তিমানের প্রতিনিধি হওয়া আনন্দের,
প্রকৃতির উপরে স্বামিত্ব লাভ করা আনন্দের।

এসব থেকে, বিশেষ করে, শেষ চারিটি ছত্র থেকে, বোঝা যাচ্ছে প্রাচ্যের পরিচিত প্রশান্তি আর ইকবালের আমিত্বের মধ্যে যে পার্থক্য তা ঠিক শ্রেণীগত নয়— মাত্রাগত। প্রশান্তি, ব্রাহ্মিস্থিতি, এসব যে কর্মহীন নয় তার প্রমাণ বুদ্ধ-শিষ্যের প্রচার-ব্রত গ্রহণ, অর্জনের আত্মীয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, সুফীর সৃষ্টির সেবা (খেদমতে খলক)—তবে প্রাচ্যের এই সুপরিচিত প্রশান্তির প্রবণতা—সাধারণত দাঁড়িয়েছে কর্মহীনতার দিকে, সেই দিক দিয়ে ইকবালের সদা সক্রিয় আনন্ত্য লোলুপ আমিত্বের সাধনা এ যুগের প্রাচ্যে—শুধু মুসলমান-জগতে নয়—বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ, এবং সেই দিক দিয়ে তিনি—এযুগের প্রাচ্যের এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এশিয়া আফ্রিকার সব চাইতে বড় প্রয়োজন যেটি সেটি হচ্ছে তার জড়তা-বিসর্জন আর প্রাত্যহিক জীবনকে সুন্দরতর মহত্তর করবার আগ্রহ। এ-আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে এ কালের প্রাচ্যের বহু কর্মী ও ভাবুকের বাণীতে। সেই আগ্রহ ইকবালের কাব্যে ধারণ করেছে এক প্রবল, অগ্নিশিখার মতো মোহন, রূপ। তাই তিনি যে এ যুগের তরুণ-সমাজের আপাতত মুসলিম তরুণের প্রাণের মানুষ হয়েছেন, এ অনেকটা অপরিহার্য।

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এই পর্যন্তই আমি ইকবালের সাহচর্য উপভোগ করতে পারি। এর পরে সেই আমিত্বের সাধনায় যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন, সেখানে ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা, ঐতিহ্যের মূল্য নিরূপণ, ইত্যাদি গুরু ও জটিল বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার পার্থক্য তা হয়ত মূলগত মনে হয় তিনি বিশ্বাস করেন প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর ও কাম্য, আমার ধারণায় তা এক অসম্ভব ব্যাপার— "যে কাল যা সৃষ্টি করে তাতে

মেটে সেই কলেরই প্রয়োজন"[১৬] —অতীত থেকে পাওয়া যেতে পারে কিছু প্রেরণা যদি সংকল্প সাধু হয়। সেজন্য কবি-ইকবালের সঙ্গে তুলনায় চিন্তানেতা ইকবাল আমার কাছে কিছু স্বল্পমূল্য[১৭] এবং আমার এমন আশঙ্কাও আছে যে চিন্তানেতা নীটশে যেমন পরোক্ষভাবে ইয়োরোপের বর্তমান ধ্বংসলীলার কারণ হয়েছেন তেমনি ইকবালের চিন্তাধারারও এমন অপব্যাখ্যা সম্ভবপর—এমন অপব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারায় হয়েছে— যার ফলে তাঁর মনুষ্যত্ব ও প্রতিভা তাঁর স্বদেশীয়দের আনন্দের কারণ না হয়ে দুঃখের কারণ হতে পারে দীর্ঘদিনের জন্য। —শক্তিবাদ ও শান্তি-বাদ দুই থেকেই সময় সময় যে কুফল ফলে সে সম্বন্ধে Religion of Mar গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের এই দুটি উক্তি স্মরণীয় :

শক্তিবাদ সম্পর্কে—

সংগ্রামশীল ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে স্বভাবতযুক্ত দৈহিক বলবিক্রম—সেই ইচ্ছা শক্তি যখন তার পূর্ণ দায়িত্ব ও সার্থকতা থেকে বঞ্চিত হয় তখন থেকে জন্মলাভ করে দুর্দমনীয় লোভ, সূচনা হয় অন্তরে বস্তুর দাসত্ব, আর শেষে বিচিত্র স্বার্থবুদ্ধির ঘাত-প্রতিঘাতে দুরাকাঙ্ক্ষার সৌধচূড়া ধূলি-ধূসরিত হয়।

শান্তিবাদ সম্পর্কে—

প্রবল প্রাণশক্তির কর্মধারা যেমন পরিণত হতে পারে অর্থহীনতায় যার ফলে আত্মা নিপীড়িত হয় বস্তুসমারোহে, তেমনি ইচ্ছালোপের যে শান্তি তা পরিণত হতে পারে মৃত্যুর শান্তিতে, আমাদের আন্তর্লোক তখন হয়ে ওঠে অসংলগ্ন স্বপ্নের রাজ্য।

ইকবালের অর্থপূর্ণ প্রভাবকে এই অবাঞ্ছিত পরিণতি থেকে রক্ষা করা প্রত্যেক চিন্তাশীল কর্মীর কর্তব্য; তাঁর ভক্তদের উপরে তো এই দায়িত্ব বিশেষভাবেই ন্যস্ত। এই উদ্দেশ্যে ইকবালের বাণীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উদযাপিত জীবন স্মরণে রাখার যোগ্য। আকাঙ্ক্ষা (আরজুর) মহিমা কীর্তন তিনি একান্তভাবে করেছেন,

---

১৬. গ্যেটে-ফাউস্ট-প্রথম দৃশ্য

১৭. ইকবালের ইংরেজি জীবনী "The poet of the East" এ ভূমিকায় ডক্টর নিকলসন বলেছেন : The affinities with Neitzsche and Bergson need not be emphasised. It is less clear, however, why Iqbal identifies his ideal society with Mohammed's conception of Islam, or why membership of that society should be a privilege reserved for Moslems. Here the religious enthusiast seems to have knocked out the philosopher- a result which is logically wrong but poetically right.

কিন্তু নিজেকে বারবার বলেছেন ফকীর—নিঃস্ব—আর তাঁর এই নিঃস্বতা নির্লোভ, পদস্থ ও বিত্তশালীর দ্বারস্থ তিনি হননি কোনোদিন, অযাচিত সাহায্যও তিনি করেছেন প্রত্যাখ্যান। বারবার তিনি বলেছেন— আমিত্বের বিকাশ ব্যহত হয় যাঞ্চার দ্বারা আর সমৃদ্ধ হয় আকঙ্ক্ষার দ্বারা। অন্য কথায়, তাঁর এই 'আকাঙ্ক্ষা'র অর্থ হচ্ছে মহত্ত্বের পথে অতন্দ্রিত প্রয়াস, গ্যেটে যেমন বলেছেন :

জীবন আর স্বাধীনতা তারই লভ্য ও ভোগ্য
যে প্রত্যহ নতুন করে' জয় করে এদুটি।

আর সেই সঙ্গে দরকার এই তিনটি বড় বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা : প্রথমত, তিনি মুসলমানের উন্নতি প্রাণভরে চেয়েছেন—

প্রভু, মুসলমানের অন্তরে এক জাগ্রত আকাঙ্ক্ষা দাও,

কিন্তু বুঝতে হবে, সমস্ত মানুষের, সমস্ত জগতের, উন্নতি উপেক্ষা করে' তিনি মুসলমানের উন্নতি চাইতে পারেন না, চাইলে তাঁর সত্যপ্রীতি ও আল্লাহ-প্রীতি হয় অর্থহীন। তিনি কবি, তাই বিশিষ্ট, concrete তাঁর প্রিয়, 'মানুষে'র কথা তত না ভেবে 'মুসলমানে'র কথা বেশি ভাবা সেজন্য তাঁর পক্ষে কতকটা অপরিহার্য, বিশেষ করে' তাঁর চারপাশের মুসলমানের এমন পতিত দশায়। দ্বিতীয়ত, আমিত্বের যে-বিকাশ তিনি চেয়েছেন তা রাতারাতি হবার মতো ব্যাপার নয়। তাই সাধনাহীন হয়ে তাড়াতাড়ি ফল চাইতে গেলে এ-ক্ষেত্রে অনর্থ ভিন্ন আর কিছুই সম্ভবপর নয়। এ সম্বন্ধে বাউল-কবির সতর্কবাণী চির শ্রদ্ধেয় :

নিঠুর গরজী, তুই মানুষ-মুকুল ভাজবি আগুনে!
তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহনে!
চেয়ে দ্যাখ মোর পরম গুরু সাঁই,
তিনি যুগ যুগান্তে ফুটান কমল তাঁর তাড়াহুড়া নাই।

তৃতীয়ত, বর্তমান ইয়োরোপীয় সভ্যতা থেকে তিনি যে মুখ ফিরিয়েছেন তাকে ধ্বংসোন্মুখ জ্ঞান করে' তাঁর শেষ বয়সের একটি লেখায় ইয়োরোপ সম্পর্কে তিনি বলেছেন "এই সওদাগরের মৃগ নাভিও কুকুরের নাভি ভিন্ন আর কিছু নয়"[১৮] আর বরণীয় জ্ঞান করেছেন প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা, সেক্ষেত্রে দৃষ্টির পরিচয় না দিয়ে দৃষ্টি বিভ্রমেরই পরিচয় তিনি দিয়েছেন বেশি, কেননা, সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও, ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অকুণ্ঠিত মানব-কল্যাণ-জিজ্ঞাসা মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ আত্মিক সম্পদ— প্রাচ্যের আমিত্ব সাধনের বা প্রশান্তি সাধনের চাই তার পরিপূরক, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

ইকবালের মহৎ বেদনা মহৎ সার্থকতা লাভ করুক।

১৩৪৯, ইকবাল স্মৃতিবার্ষিকী রাজশাহী কলেজ।

---

১৮. মুষকে ইনস ওদাগরয় নাফে সগস্ত্

রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান-সমাজ

আজকের দিন বাংলাদেশের পক্ষে যে এক দুর্দিন সে কথা অনেকেই বলে থাকেন। হয়ত মিথ্যা বলেন না। এমন একটা সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য, অবিশ্বাস, এমন কি শত্রুতা, আজ বাংলার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে যে, এই পরিমণ্ডলে বাস করা ভদ্রব্যক্তিদের পক্ষে রীতিমত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তবে আর একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বর্তমানের এই অস্বস্তিকর অবস্থা মনে হয় ভালই। ফোঁড়া যখন পেকে ওঠে তখনকার যন্ত্রণা অসহ্য, কিন্তু সেই সঙ্গে সান্ত্বনাও পাওয়া যায় যে, বেদনার অবসান হতে দেরী হবে না।

এই দিনে কোনো কোনো শিক্ষিত মুসলমান বাঙালির মুখেও শুনতে পাওয়া গেছে এই প্রশ্ন: রবীন্দ্রনাথ একজন অতি বড় কবি, মহামানব, বিশ্বপ্রেমিক, কিন্তু তাঁর বাড়ির কাছের মুসলমানদের জন্য তিনি কি করেছেন?

এরূপ প্রশ্ন বহুবার আমাকে শুনতে হয়েছে। কিন্তু একবার একজন শ্রদ্ধেয় মুসলিম সাহিত্যিক এ প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছিলেন তা মনে রাখবার মতো; তিনি বলেছিলেন : আকাশের সূর্য মুসলমানের জন্য বিশেষ কি করেছে?[১৯]

রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের সমালোচকদের উক্তির এইই হয়ত শ্রেষ্ঠ প্রত্যুত্তর। কবি আকাশের সূর্যের মতোই একজন সহজ মানব বন্ধু। অবশ্য যেহেতু কবি একজন মানুষ, এক বিশেষ পরিবেষ্টনের সৃষ্টি, সেজন্যে অত্যন্ত কাছে থেকে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে আলোকের উৎস সূর্যেও ধরা পড়ে কালো দাগ। যে গোলাপ সৌষ্ঠব আর গন্ধে অতুলনীয় তার স্পর্শ লোভাতুর লাভ করে হাতে কাঁটার আঘাত। কিন্তু কালো দাগ সত্ত্বেও সূর্য সূর্যই। কাঁটা সত্ত্বেও গোলাপ গোলাপই। এক বিশেষ পরিবেষ্টনে জন্ম সত্ত্বেও কবি চিরন্তন মানব— তাঁর পরিবেষ্টনের সমস্ত সীমারেখা অবলীলাক্রমের অতিক্রম করে তাঁতে উৎসারিত হয় মানুষের চিরন্তন সুখ, চিরন্তন দুঃখ, চিরন্তন প্রেম, চিরন্তন অভয়। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ কবি, এবং যেহেতু মুসলমান মানুষ, সেজন্যে মুসলমান তার আজকার বিশেষ ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রভাবে বুঝুক আর নাই বুঝুক, রবীন্দ্রনাথ বাস্তবিকই তার পরম বন্ধু ব্যতীত আর কিছু নন।

---

১৯. 'আমাদের দুঃখ' –প্রণেতা আনোয়ারুল কাদীর

কিন্তু চিরন্তন যদি সত্য হয়, যা স্থানিক ও কালিক তাও তা মিথ্যা নয়। আজকের এই বিশেষ যুগে কবি-রবীন্দ্রনাথের মুসলিম দেশ-ভ্রাতাদের মনে এই অকরুণ প্রশ্ন জেগে থাকে যে তিনি তাঁদের কোন কাজে লেগেছেন, তবে সত্য-জিজ্ঞাসুকে সে প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের মুসলমান প্রতিবেশীর মনে জেগেছে প্রধানত দুটি কারণে, প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশ্বকবি নন; বিশেষভাবে একজন ভারতীয় কবিও বটে। সেই ভারতীয়তার রূপ দান করতে গিয়ে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু মনোরম চিত্রও তিনি অঙ্কিত করেছেন, তাঁর সেই সব সৃষ্টি হিন্দুকে শুধু আনন্দিতই করেনি, গর্বিতও করেছে।

দ্বিতীয়ত, মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত বিরূপতা না থাকলেও, এমন কি অল্পাধিক অনুরাগ সত্ত্বেও, সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি প্রায় মৌনীই রয়েছেন তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে।

খুব সহজভাবে এই ব্যাপারের এই ব্যাখ্যা দেওয়া যায় যে, শিল্পীর তুলিকার অবলম্বন হয় যে-সমস্তের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় হয় সেই-সব। হয়ত তাঁর প্রতিদিনের পরিচিত মুখ তাঁর তুলিকায় ধরা পড়ে না, কিন্তু ক্ষণিকের দেখা এক-আধ পরিচিত মুখ তাঁর অন্তরে চাঞ্চল্য জাগায় দীর্ঘ দিন ও দীর্ঘ রাত্রি। শিল্পীর এই পক্ষপাতের তত্ত্ব দুরধিগম্য। কিন্তু হয়ত প্রশ্ন হবে, রবীন্দ্রনাথ তো শুধু শিল্পী নন, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ জীবন-সমালোচক। সে-ক্ষেত্রে তাঁর দেশবাসী মুসলমান সম্পর্কে তাঁর প্রায় তুষ্ণীম্ভাব অদ্ভুত নয় কি?

এ প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের একদল অনুরাগী এই কৈফিয়ৎ দিয়ে থাকেন, যে মুসলমান সাধারণত সমালোচক-অসহিষ্ণু। এরূপক্ষেত্রে আলোচনা বা সমালোচনার পক্ষে যে অবাঞ্ছিত কলহ অপরিহার্য রবীন্দ্রনাথের রুচি তাঁকে সে-পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করেছে। কিন্তু এই কৈফিয়ৎ বড় দুর্বল। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুর সমালোচনাও কম করেননি, এবং সে-ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর কলহ তিনি যে এড়িয়ে যেতে পেরেছেন ঠিক তা নয়। হয়ত তিনি এড়িয়ে যেতে চানও নি, চাইলে এই বাণী তাঁর জন্য অসত্য হত।

যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য বলি' উঠে খর খড়্গ সম.....

বস্তুত তাঁর দেশবাসী মুসলমান সম্পর্কে তিনি যে কম আলোচনা করেছেন তা নয়, অন্তত, তিনি যে আলোচনা করেছেন তা' গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমান ধর্মের প্রতি অথবা পরধর্মের প্রতি— তাঁর যে শ্রদ্ধা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর 'সতী' নাটিকায় তা তুলনাহীন। ভারতের মুসলমান দোষ ও গুণ দুই-ই তাঁর আলোচনার বিষয়

হয়েছে।[২০] বিশেষত ভারতীয় মুসলমানের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাইরের মুসলমানের পার্থক্য কোথায় এবং ভারতীয় মুসলিম জীবনের সত্যকার পরিণতি কোন পথে সে-সম্বন্ধেও স্পষ্ট ভাষায় তিনি তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন।[২১] তাঁর এই সব মত স্বীকার্য কি অস্বীকার্য তার চাইতেও বড় কথা এই যে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই তিনি এ-সব মতামত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য মুসলমানের ধর্ম বা ধর্ম প্রবর্তক সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেন নি। তিনি যে কবি— জগতের প্রাত্যহিক জীবনের সাহচর্য আর আত্ম অনুভূতি এই-ই যে তাঁর জীবনের রাজপথ— এ-বোধের সঞ্চার তাঁতে হয়েছিল তাঁর প্রথম যৌবনে আর এই স্বধর্ম থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি কখনো। একজন ব্রাহ্মনেতার সন্তান হয়ে তিনি জন্মলাভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই পিতৃধর্মও তাঁর জন্য হয়েছিল এক প্রেরণার স্থল, পরিক্রমণের স্থল নয়। এ সম্বন্ধে তাঁর এই উক্তি স্মরণীয় :

> .....ধর্ম সম্প্রদায় ব্যাপারটাকে আমরা কী চোখে দেখিব? তাহাকে এই বলিয়াই জানিতে হইবে যে, তাহা তৃষ্ণা মিটাইবার জল নহে, তাহা জল খাইবার পাত্র। সত্যকার তৃষ্ণা যাহার আছে, সে জলের জন্যই ব্যাকুল হইয়া ফিরে, সে উপযুক্ত সুযোগ পাইলে গড়ুষে করিয়াই পিপাসা নিবৃত্তি করে। কিন্তু যাহার পিপাসা নাই সে পাত্রটাকেই সবচেয়ে দামি বলিয়া জানে। সেই জন্যই জল কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার ঠিক ঠিকানা নাই, পাত্র লইয়া বিষম মারামারি বাধিয়া যায়। তখন যে-ধর্ম বিষয়বুদ্ধির ফাঁস আলগা করিবে বলিয়া আসিয়াছিল, তাহা জগতে একটা নূতনতর বৈষয়িকতার সূক্ষ্মতার জাল সৃষ্টি করিয়া বসে, সে-জাল কাটানো শক্ত।[২২]

রবীন্দ্রনাথের নিজের ভিতরে সত্যের জন্য এই যে সহজাত তৃষ্ণা ছিল এই জন্যই হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান সব সমাজেরই সত্যকার ধর্ম জিজ্ঞাসুদের তিনি পরম বন্ধু তা তিনি সেই সমস্ত ধর্মের বিশেষ আলোচনা ও অনুশীলন করুন আর নাই করুন। যে সমস্ত মুসলমান সমালোচক এই প্রশ্নের অবতারণা করেন— রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের জন্য কি করেছেন, তাঁদের নিজেদের প্রথমে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত— মুসলমান কে, এবং কি সে চায়। যদি মুসলমানীর অর্থ এই হয় যে তা বিশেষ কতকগুলি অনড় মতবাদের সমষ্টি তবে সে মুসলমানীর জন্য রবীন্দ্রনাথ কিছুই করেন নি। এই মুসলমানীর সমর্থন কোরআন, হজরত মোহাম্মদ, এবং যুগযুগান্তের মুসলিম শ্রেষ্ঠরাও করেন নি, বরং তার প্রতিবাদ করেছেন, যেমন মহামনীষী সাদী বলেছেন—

---

২০. দ্রঃ আত্মশক্তি ও আধুনিক সাহিত্য।
২১. দ্রঃ আত্মপরিচয়ঃ পরিচয়।
২২. দ্রঃ চারিত্র পূজা

তরিকত ব-জূজ্ খেদমতে খালক নিস্ত
ব-তসবি্ ও সাজ্জাদা ও দল্ক নিস্ত।

সৃষ্টির সেবা ভিন্ন ধর্ম আর কিছু নয়, তসবিহ জায়নামাজ ও আলখাল্লায় ধর্ম নেই। অথবা যেমন কোরআনে বলা হয়েছে– আল্লাহ ভুল ধারণার জন্য মানুষ আল্লাহর রোষে পতিত হয় না, পতিত হয় দুষ্কৃতির জন্য (১১ঃ১১৭)।

কিন্তু মুসলমানীর অর্থ যদি হয় সত্যপ্রীতি, কাণ্ডজ্ঞান-প্রীতি, মানব-প্রীতি, জগৎপ্রীতি, ন্যায়ের সমর্থন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ, তবে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় মুসলমান এ যুগে আর কেউ জন্মেছেন কি না সে কথা এই সব সমালোচকদের গভীর বিচার বিশ্লেষণের বিষয় হওয়া উচিত।

দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় মুসলমান আজও ভুগছে একটি মানসিক বিকৃতি থেকে, ইংরেজিতে তাকে বলা হয় Inferiority complex. তারা সংখ্যায় অল্প, প্রভাবে খর্ব এই চেতনা তাদের অন্তরে সঞ্চারিত করেছে একটি মানসিক অস্বস্তি। এই মানসিক অস্বস্তির চশমার সাহায্যে জগৎকে যথাযথভাবে দেখা ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। এই মানসিক অস্বস্তি যেদিন তার কেটে যাবে, তার পরিবর্তন তার অন্তরে সঞ্চারিত হবে অভয় ও আশা, সেদিন সহজেই সে বুঝবে দেশে দেশান্তরে মুসলমানদের মধ্যে অমুসলমানদের মধ্যে কোথায় তার পরম মিত্রেরা বাস করেছেন। সেদিনে আজকার একশ্রেণীর দুঃখী মুসলমানের এই যে প্রশ্ন— কবি ও বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাদের জন্য কি করেছেন, এটি তার অট্টহাসির সামগ্রী হবে।

১৩৪৮

অনেকের ধারণা, মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' জঙ্গনামা ও এই জাতীয় অন্যান্য পুঁথির সাধুভাষায় রূপান্তর মাত্র। লেখক নিজে বলেছেন: "পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদ সিন্ধু' বিরচিত হইল।" তা উপকরণ যেখান থেকেই তিনি সংগ্রহ করুন, এই বইখানিতে তাঁর যে-কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তা অনন্য সাধারণ।

পুঁথি-সাহিত্যের লেখকদের সঙ্গে 'বিষাদ সিন্ধু'-লেখকের বড় মিল হয়ত এইখানে যে দৈব-বলের অদ্ভুততে বিশ্বাস তাঁরও ভিতরে প্রবল দেখা যাচ্ছে। দৈববলে বিশ্বাস মাত্রই সাহিত্যে বা জীবনে দোষার্হ নয়; কিন্তু এই বিশ্বাসের সঙ্গে যখন যোগ ঘটে অজ্ঞানের ও ভয়বিহ্বলতার, তখন তা হয়ে ওঠে জীবনের জন্য অভিশাপ— সাহিত্যেও একান্ত অবাঞ্ছিত। এই বিশ্বাসের জন্য 'বিষাদ সিন্ধু' কাব্যের সাহিত্যিক ক্ষমতা যে অনেক জায়গায় ব্যর্থ হয়েছে; বিশেষ করে' ধর্ম-বোধ সম্বন্ধে অতি-অকিঞ্চিতকর ধারণার পরিচয় তিনি যে অনেক জায়গায় দিয়েছেন, সে-সব সবিস্তারে বলবার প্রয়োজন করে না।

অথচ জীবন, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যে অগভীর তা নয়। আজকের মুখে তিনি বলেছেন "ধার্মিকের হৃদয় এক, ঈশ্বরভক্তের মন এক, আত্মা এক।" মানবজীবনের জটিলতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও যথেষ্ট।

তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক প্রবণতা আর ধর্ম পরকাল ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, এই দুয়ের ভিতরে যে একটি বিরোধ দেখা যাচ্ছে, এটি তাঁর সম্বন্ধে বেশ ভাববার বিষয়। শোনা যায়, বহু সাহিত্য-ব্রতীর মতো তাঁরও যৌবন উচ্ছৃঙ্খলতায় কেটেছিল। হতে পারে 'বিষাদ সিন্ধু'তে তাঁর যে নিয়তি পূজা দেখা যাচ্ছে, তা সেই উচ্ছৃঙ্খলতার এক প্রতিক্রিয়া। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ, বিশেষ করে তাঁর 'গাজী মিয়ার বস্তানি' খানি পাওয়া গেলে তাঁর চিত্তের পুরোপুরি পরিচয় পাওয়া অনেকটা সহজ হতো। যাইই হোক, তাঁর এই অসার্থক নিয়তি পূজার কথা ভুলে তাঁর সাহিত্যিক শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ যাতে লাভ হয়েছে তারই অনুসরণ কর্তব্য। কেউ কেউ বলতে পারেন, কারবালার নিদারুণ প্রান্তরে কাসেম ও ইমাম হোসেনের যে বীরমূর্তি তিনি দাঁড় করিয়েছেন, 'নিয়তি'র নিষ্ঠুর লীলা তাতে প্রকট। কিন্তু এখানে 'নিয়তি'র লীলা না দেখে এটি মানবজীবনের এক করুণ কিন্তু সাধারণ পরিস্থিতি, একথাও ভাবা যেতে পারে। ইমাম-পরিবার ও তাঁদের সহচর

বর্গের যে ভাগ্য-বিড়ম্বনা কারবালায় এসে উপস্থিত হয়েছেন এ তাঁরা জানেন, কিন্তু বাস্তবিকই তেমন গভীর করে' জানেন না; কারবালায় তাঁদের অবস্থিতি এক সঙ্কটময় স্থানে অবস্থিতি মাত্র। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে মীর মোশাররফ হোসেনের জন্ম। তাঁদের সঙ্গে তাঁর যোগ যে কত ঘনিষ্ঠ নানাদিক দিয়ে তা বিচার করে' দেখা যেতে পারে। তাঁর বাক্যের গঠন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুযায়ী– অবশ্য কিছু বেশি বাক-বাহুল্য তাতে আছে; তাঁর মন্ত্রী ও সেনাপতিদের মন্ত্রণায়, ঘটনার নাটকীয় বিন্যাসে এবং স্বাধীনতার জন্য দরদেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বুঝতে পারা যায়। কিন্তু তাঁর নিবিড়তম যোগ মধুসূদনের সঙ্গেই। বিষাদ-সিন্ধু গদ্যে লিখিত হলেও গদ্য লেখকের পরিচ্ছন্নতা লেখকের দৃষ্টিতে নেই– তাঁর চোখে বরং কবির স্বাপ্নিকতা; আর এর যা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, যেমন এজিদ-চরিত্র, ইমাম হোসেন, কাসেম ও মোহাম্মদ হানিফার বিক্রম, সবই কাব্যসৌন্দর্য-মাখা।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্যে'র বর্ণনার ছায়া যে মাঝে মাঝে 'বিষাদ সিন্ধু'র উপরে পড়েছে শুধু তাই নয়, 'মেঘনাদবধে'র দুইটি চরিত্রের পরিকল্পনার সঙ্গে এর দুইটি চরিত্রের পরিকল্পনার গভীর মিল রয়েছে। 'মেঘনাদবধে'র শ্রেষ্ঠ চরিত্র রাবণ; তার শক্তি যেমন অপরিসীম, দুঃখও তেননি অফুরন্ত। রাবণের মতনই এজিদ শক্তিমান, কিন্তু তাঁর কামনার ধন জয়নবকে তিনি লাভ করতে পারেন নি এই দুঃখে তাঁর সমস্ত শক্তি বিপর্যস্ত অস্থিরচিত্ততা তাঁর একমাত্র পরিচয়। তেমনিভাবে 'মেঘনাদবধে'র সীতা চরিত্রের মাধুর্য ও কোমলতার অনেকখানি সমাবেশ ঘটেছে 'বিষাদ সিন্ধু'র জয়নব-চরিত্রে। গ্রন্থের শেষের দিকে জয়নবের যে দীর্ঘ আত্মবিলাপ রয়েছে তার সঙ্গে সীতা ও সরমার কথোপকথনের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে।

রোমান্টিক কবির যে ভাবোচ্ছ্বাস— একই সঙ্গে সেইটি 'বিষাদ সিন্ধু' কাব্যের শক্তি ও দুর্বলতার কারণ। ভাবোচ্ছ্বাসের জন্যই তাঁর গ্রন্থ চরিত্রের বৈচিত্র্যের পরিচয় যথেষ্ট থাকলেও পূর্ণাঙ্গ চরিত্র-সৃষ্টি কমই সম্ভবপর হয়েছে। এরও মধ্যে যাঁদের তিনি দোষে-গুণে মানুষ অথবা বিচক্ষণ সাংসারিক মানুষ রূপে আঁকতে চেয়েছেন, যেমন এজিদ, ওৎবেঅলীদ, আবদুল্লাহ-জেয়াদ, মারওয়ান, জাএদা, গাজী রহমান, তাঁরা অনেকাংশে এক একটি মানুষ রূপে আঁকতে চেয়েছেন, যেমন এজিদের পিতা মাবিয়া, ইমাম পরিবারের নরনারী, মদিনাবাসিগণ ও মোহাম্মদ হানিফার যোদ্ধাবৃন্দ, তাঁদের বীরত্বের প্রকাশ মাঝে মাঝে মনোরম হলেও ইমাম হাসান ও জয়নব ব্যতীত তাঁরা প্রায় সবাই মোটের উপর কথা ও ধর্মাচারের সমষ্টিমাত্র হয়ে উঠেছেন। জয়নবের কথা আগেই বলা হয়েছে; ইমাম হাসানের চরিত্র বাস্তবিক বড় মধুর করে 'বিষাদ-সিন্ধুকার' এঁকেছেন। যে বৃদ্ধ নিজের মনের

বিষে তাঁকে বর্শা ফেলে মেরেছিল তার প্রতি ও তাঁর প্রাণঘাতি স্ত্রী জা-এদার প্রতি তাঁর যে ব্যবহার তা বড় সৌজন্যময়। সেকালের পীরবাদ ও সুফীমতবাদ-প্রভাবান্বিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে লেখকের জন্ম, ইমাম হোসেনের চরিত্রে যে স্নেহ ও সৌজন্য তিনি অঙ্কিত করতে পেরেছেন তা আমাদের একালের ওহাবী-প্রভাবান্বিত সমাজে দুর্লভ হলেও সেকালের সমাজে দুর্লভ ছিল না। চরিত্রের পরিকল্পনায় এই লেখকের বিশেষ কৃতিত্বও প্রকাশ পেয়েছে; তাঁর সমস্ত নায়ক-নায়িকাই স্বাভাবিক মানুষ, এক সীমার ব্যতীত অমানুষ "শয়তান" কেউই হয়ে ওঠে নি যদিও তিনি 'শয়তান' বিশেষণে তিনি বহু নায়ক নায়িকাকে বিশেষিত করেছেন। চরিত্র হিসাবে সীমার অবশ্য কোনো বৈশিষ্ট্য ফোটে নি, সে যেন নিয়তির হাতের যন্ত্র মাত্র।

জনসাধারণের যে সমাদর, এই শক্তিমান সাহিত্যিক নিজের বলেই তা লাভ করেছেন। তাঁর সমস্ত রচনা ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করে' তাঁর প্রতিভার প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধানিবেদন এখন সাহিত্যরসিকদের কর্তব্য।

১৩৪১

নজরুল ইসলাম

কবি নজরুল ইসলামের সাহিত্যিক জীবনের চারিটি স্তর নির্দেশ করা যেতে পারে।

প্রথম স্তর— তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা থেকে 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত।

দ্বিতীয় স্তর— 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পর থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবসান পর্যন্ত।

তৃতীয় স্তর— তাঁর সঙ্গীত রচনার, বিশেষ করে, গজল রচনার যুগ।

চতুর্থ স্তর— তাঁর যোগী- জীবন।[২৩]

প্রথম স্তর

শরৎচন্দ্রের মতো নজরুল ইসলামও অতি অল্পদিনে বাংলার সাহিত্য জগতে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পূর্বেই তাঁর নবীনতা অথবা উদ্দামতা আর ছন্দ-সামর্থ্যের প্রতি বাংলার সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ আর 'বিদ্রোহী' রচনা এর মধ্যে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের কথা ভাবতে গিয়ে তাঁর ভাব-জীবনের এই স্তরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার প্রয়োজন আছে। 'বিদ্রোহী' থেকে তাঁর মানসজীবনের গতি যে- মুখী হলো তার সঙ্গে তাঁর পূর্বের ভাব-জীবনের সঙ্গতি অসঙ্গতি দুইই রয়েছে। তাঁর এই যুগের একটি বিশিষ্ট রচনা তাঁর 'বাঁধন-হারা' পত্রোপন্যাস। এতে কবি যে তাঁর তরুণ জীবন কিছু পরিমাণে চিত্রিত করেছেন, অনেকে বোধ হয় তা জানেন। এই রচনায় দেখা যাচ্ছে কবি একজন অসাধারণ ভাববিলাসী ও অভিমানী, ব্যর্থপ্রেমের বেদনায় গভীরভাবে আহত। কিন্তু এই আঘাত যত বড়ই হোক এতে মুহ্যমান তিনি হননি। এই নিষ্করুণ আঘাতে তাঁর অন্তর থেকে উৎসারিত হয়েছে একটি মধু-স্রোত; কিন্তু এতে লাঞ্ছিত এমন কি ম্রিয়মাণও তিনি হননি। তবে তিনি অবলম্বন করেছেন এক দায়িত্বহীন ভবঘুরের জীবন-সেই দায়িত্বহীনতায় তাঁর সুনিবিড় আনন্দ।

এই যুগের ভাবে-ভোলা কবি ছিলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীত, বিশেষ করে' রবীন্দ্রনাথের যৌবনের প্রেমসঙ্গীতে আত্মহারা: রবীন্দ্রনাথের পরে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি; আর তাঁর প্রিয় ছিলেন ইরানী-কবিতিলক হাফিজ তাঁর সুফী তত্ত্বের জন্যে নয় তাঁর প্রেমের উন্মদনার জন্যে।

---

২৩. এটি পঠিত হয়েছিল কবির ৪৩তম জন্মোৎসবে- ১৩৪৮ সালে। তার পরের বৎসর থেকে কবি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন।

আর এক শ্রেণীর ভাবুকদের প্রতিও কবির গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাঁরা বাংলার সন্ত্রাসবাদীর দল।

দ্বিতীয় স্তর

রবীন্দ্রনাথের যেমন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' অথবা 'এবার ফিরাও মোরে' নজরুলের তেমনি 'বিদ্রোহী'। জীবনে হঠাৎ একটি বৃহৎ চেতনার আবির্ভাবের গৌরব এসবে বিধৃত কিন্তু এই দুই কবির জীবন ধারার উপরে তাঁদের এই ভাবোচ্ছ্বাসের প্রভাবে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' অথবা 'এবার ফিরাও মোরে' রবীন্দ্রনাথের কবি চিত্তে যত বড় দোলা-ই দিক, এ-সবের প্রভাবে তাঁর জীবনের সাধারণ ধারায় যে পরিবর্তন এসেছে তা লক্ষ্যযোগ্য হয়নি দীর্ঘ দিন। মনে হয়, কবি যেমন সর্বংসহা প্রকৃতি যত বড় ঝড়-বৃষ্টিই সেই প্রকৃতির বুকের উপরে তান্ডব জমিয়ে তুলুক, পরদিন সূর্যোদয়ের হাসিমুখে জেগে উঠতে তার বাধে না। নজরুল ইসলামও 'বিদ্রোহী' রচনার পরে যে একেবারে বদলে গিয়েছিলেন ঠিক তা নয়; 'বিদ্রোহী' কবিতাতেও দেখা যাচ্ছে, একদিকে তিনি যেমন নিজের ভিতরে অনুভব করছেন সাইক্লোনের শক্তি অন্যদিকে তেম্‌নি তিনি মুগ্ধ 'চপল মেয়ের কাঁকন চূড়ির কনকনে'র ছলনায়। তবু এ কথা সত্য যে, 'বিদ্রোহী'র আকর্ষণ কবিকে বাস্তবিকই ঘর ছাড়া করেছিল। সেই দিনে তাঁর সাম্যবাদ প্রচার আর বেপরোয়া শিকল ভাঙ্গার গানের কথা যাঁদের মনে আছে তাঁরা স্মরণ করতে পারেন প্রচণ্ড ধূমকেতুর মতো কি এক ভীষণ মনোহর জীবন কবির ভিতরে সূচিত হয়েছিল।

১৩২৬ সালে– ইংরেজি ১৯১৯ সালে– নজরুল কলকাতায় সাহিত্যিক-সমাজে পরিচিত হন তখনই এক হিসাবে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী। সেদিন বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল সে কথা বলা হয়েছে; সেই সঙ্গে এই কথাও স্মরণ করা যেতে পারে যে, 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পূর্বেই 'শাতিল আরব' 'মোহররম' 'কোরবানী' প্রভৃতি যে-সব জনপ্রিয় কবিতা তিনি লিখেছিলেন সে-সবে ব্যক্ত হয়েছিল মুসলমান সমাজের গতানুগতিক জীবনের প্রতি ধিক্কার, এক বলিষ্ঠ নব জীবনারম্ভের জন্য তীব্র কামনা, আর অস্ত্রশস্ত্রের শক্তি ও মহিমায় তাঁর প্রত্যয়। এটি ছিল ভারতীয় মুসলমানদের জন্য খেলাফত যুগ। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে ওহাবী-বিদ্রোহ দমনের[২৪] পর থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের স্বদেশী আন্দোলন পর্যন্ত বাংলার মুসলমানের ইতিহাস মোটের উপর এক গভীর নৈরাশ্যের

---

২৪. দ্রঃ 'বাংলার মুসলমানের কথা'

ইতিহাস। সেই নৈরাশ্যের কালোমেঘ তাদের চোখের সামনে খানিকটা কেটে গেলে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যখন আধুনিক শিক্ষার দিকে তাদের মন স্পষ্টভাবেই ঝুঁকে পড়লো। সেই দিনে বাংলার মুসলমানের জন্য-অন্তত শিক্ষিত মুসলমানের জন্য-আদর্শ-স্থানীয় ছিল বাংলা শিক্ষিত হিন্দু-সমাজ যদিও স্বদেশী আন্দোলনে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়া এই শিক্ষিত মুসলমানদের অনেকের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। মনে পড়ে, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের কিছু পরে, কলকাতায় সদ্য-আগত তরুণ নজরুল ইসলামকে মোহম্মদ এয়াকুব আলি চৌধুরীর মতো একজন চরিত্রবান ও ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান সাহিত্যিক বলেছিলেন : "আপনাকে মুসলমান বারীন ঘোষ হতে হবে।" স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার হিন্দুর যে সাফল্য, মুখ্যত তাইই প্রেরণা জুগিয়েছিল মুসলমানের এই খেলাফত আন্দোলন। কিন্তু হিন্দুর আয়োজনের ব্যাপকতা তাঁদের ছিল না, ফলে সফলতা তাঁদের জন্য হচ্ছিল সুদূরপরাহত। তাঁদের কেবল লাভ হচ্ছিল দিগদেশবিহীন এক বিক্ষুব্ধ মানসিকতা। তরুণ নজরুল, অর্থাৎ 'বিদ্রোহী, রচনার পূর্বের নজরুল, এক হিসাবে ছিলেন এই খেলাফত যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি আর 'মোহররম' কবিতায় অধুনা-পরিত্যক্ত শেষ দুটি চরণ এই সম্পর্কে স্মরণ করা যেতে পারে—

দুনিয়াতে দুর্মদ খুনিয়ারা ইসলাম-
লহু লাও, নাহি চাই নিষ্কাম বিশ্রাম।

কিন্তু 'বিদ্রোহী'তে তাঁর মানসিক কুয়াসা এতখানি কেটে যায় যে, তিনি যেন এক নূতন জীবন নিয়ে জেগে ওঠেন, নিজেকে ও জগৎকে দেখতে আরম্ভ করেন এক নতুন দৃষ্টিতে।

বাংলাদেশে এক শ্রেণীর সাহিত্যরসিক আছেন যাঁরা নজরুল ইসলামকে জ্ঞান করেন একজন যুগ-প্রবর্তক কবি। আজকার দিনে তাঁদের সংখ্যা-শক্তি কেমন জানি না, তবে নজরুলের পরিচয় আছে। তাঁদের প্রতিপাদ্যের প্রধান অবলম্বন এই 'বিদ্রোহী'। তাঁদের ধারণা, এমন একটা ওজস্বিতা নজরুলের এই 'বিদ্রোহী' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে যা বাংলা সাহিত্যে, সম্পূর্ণ নূতন-বাংলার দার্শনিক আবহাওয়া এ চিন্তালেশহীন ভাস্বর ললাট তারুণ্য, এই দ্বিধাহীন দুর্মদ তারুণ্যই বাংলা সাহিত্য নজরুল প্রতিভার চিরগৌরবময় দান।

যাঁদের এই মত, মনে হয় না নজরুলের এই তারুণ্য বাস্তবিকই তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করেছেন। প্রথমেই স্মরণ করা দরকার, রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র যুগে নজরুল-প্রতিভার উন্মেষ।

আমরা চলি সম্মুখ পানে
কে আমাদের বাঁধবে,
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে

অথবা

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে অবুঝ, ওরে সবুজ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা

অথবা

শিকল দেবীর ঐ যে পূজা-দেবী
চিরকাল কি রইবে খাড়া,
পাগলামি তুই আয় রে দুয়ারে ভেদি'।
ঝড়ের মতন বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ভেড়ে
ভুলগুলো সব আন রে বাছা বাছা
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা

ইত্যাদি ছত্রে সে যুগের বাংলার শিক্ষিত তরুণ-সমাজে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল- এক হিসাবে বাংলার তরুণ-আন্দোলনের গোড়পত্তন হয়েছিল এই 'বলাকা' কাব্যের সাহায্যে। দ্বিতীয়ত, নজরুলের লেখনীতে যে-তারুণ্য রূপ পেয়েছে তার সাহিত্যিক মর্যাদা কেমন সেটিও একটি বড় অনুধাবনের বিষয়। একটু মনোযোগী হলেই চোখে পড়ে, নজরুলের রচনা, বিশেষ করে তাঁর 'বিদ্রোহী' যুগের রচনা, অনবদ্য নয়। শ্রেষ্ঠ কবিদের বিশেষ বিশেষ কবিতায় কবি-কল্পনার যে পূর্ণাঙ্গতা প্রকাশ পায় নজরুলের রচনায় সেটির অভাব মাঝে মাঝে প্রায় বেদনাদায়ক হয়েছে। নজরুল যে পূর্ণাঙ্গ কবিতার রচয়িতা তেমন নন, তাঁর কবি-প্রতিভা বরং প্রকাশ পেয়েছে উৎকৃষ্ট চরণের রচনায়, এ উক্তি করা যেতে পারে। অবশ্য এমন সাহিত্য-রসিক আছেন যাঁরা কোনো কবিতার, বিশেষ করে' দীর্ঘ কবিতার, সমগ্রতার সৌন্দর্যে মনোযোগী হওয়া তেমন প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন না; তাঁদের কাছে কবিতা বরং উৎকৃষ্ট চরণের অথবা বাক্যাংশের সমষ্টি মুক্তার মালা যেমন মুক্তার সমষ্টি। এই শ্রেণীর সাহিত্য-সমঝদারদের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেও বলা যায়, কবিতার বিভিন্ন চরণ অথবা বাক্যাংশ যখন একত্র গ্রথিত করবার প্রয়োজন হয় তখন তাদের একত্র-সমাবেশ যাতে অদ্ভুতদর্শন

না হয় সেদিকে মনোযোগী হওয়া কবির জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু নজরুলের 'বিদ্রোহী' যুগের অনেক কবিতায় দেখা যাবে- 'বিদ্রোহী' ও সে-সবের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাবের একত্র সমাবেশের সঙ্গতি সুষমা অথবা যৌক্তিকতা বিষয়ে কবি বেশ উদাসীন হয়েছেন। কিন্তু এত ত্রুটি সত্ত্বেও এমন একটা প্রাণশক্তির ছাপ তাঁর 'বিদ্রোহী' যুগের অনেক কবিতায় মুদ্রিত হয়েছে যার জন্য তাঁর ভয়ভাবনাহীন তারুণ্যের তিনি স্রষ্টা পুরোপুরি না হলেও লালায়িত। কিন্তু সাহিত্য-শিল্পী হিসাবে এই যুগে তাঁর রেখাপাতে অপরিচ্ছন্নতাও এতখানি প্রকাশ পেয়েছে যে তাঁর সাহচর্য রসিক পাঠককে আনন্দ যা দেয় দুঃখও সেই তুলনায় কম দেয় না।

এই যে নজরুলের অত্যাশ্চর্য শক্তি, অথচ সাহিত্যে তার অনবদ্য প্রকাশের অভাব, এটি তাঁর সাহিত্যের পাঠকদের দুঃখের বা ক্ষোভের কারণ না হোক এটি বরং তাঁদের অন্তরে সঞ্চারিত করুক তীক্ষ্ণতার জিজ্ঞাসা। সেই জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হলে দেখা যাবে, কবি তিনি নিঃসন্দেহ— অনুভূতির গোপন আয়োজন তাঁর জগতে কখনো কখনো ঘটায় বাণীর অপূর্ব বিদ্যুৎ-দীপ্তি—কিন্তু কবি তিনি যত বড় তার চাইতেও বড় তিনি যুগ মানব। যুগের বেদনা ও উন্মাদনা তাঁতে এত প্রবল যে, কবির কল্পনা লোকে অবস্থান তাঁর পক্ষে যেন দুসাঃধ্য। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় তাঁর শ্রেষ্ঠ ইসলামী কবিতা 'খালেদ'। খালেদের মহিমা উদাত্ত কণ্ঠে গাইবার চেষ্টাই তিনি করেছেন; কিন্তু দেখা যাচ্ছে খালেদের বীরমূর্তি পূর্ণভাবে রূপায়িত করার চাইতে তাঁর মনে প্রবলতর তাঁর সমসাময়িক মুসলমান সমাজের জন্য বেদনা অথবা অস্থিরতা। অবশ্য কবির সৃষ্টি আকাশ কুসুম নয় কখনো, কবির কাব্য ফুল মাটির গাছেরই ফুল, অন্য কথায়, যুগধর্মের বেদনায় কবি-মানস লালিত ও গঠিত। তবু গাছ আর ফুল যেমন এক জিনিস নয়, কোনো যুগের জীবন ও সেই যুগের কাব্যও ঠিক এক জিনিস নয়। Literature is journalism that lasts (যে সাংবাদিকতা টিকে যায় তার নাম সাহিত্য) সাহিত্যের এই এক চমৎকার সংজ্ঞা একজন সাহিত্য-রসিক দিয়েছেন।[২৫] কিন্তু এই যে শেষের কথা that lasts যা টিকে যায়, এরই মধ্যে রয়েছে সাহিত্যের মূল তত্ত্ব। সাংবাদিকতা স্থায়ী হয় না, কিন্তু সাহিত্য স্থায়ী হয়, এই জন্য যে, সাংবাদিকতা প্রতিদিনের জীবনের মতো অস্থির, অপূর্ণাঙ্গ, নিয়ত-পরিবর্তনশীলতার-তা যেন প্রতিদিনের জীবনের ফটোগ্রাফ। কিন্তু সাহিত্য ঠিক তা নয়, তা অনেকখানি অচঞ্চল, অনেকখানি পূর্ণাঙ্গ, কেননা, ঠিক বাস্তব-লোকে নয় কল্পনা-লোকে বা সৌন্দর্য-লোকে প্রতিষ্ঠিত হবার অবসর যেন নজরুলের নেই,

---

২৫. Robert Lynd

রুচিও যেন তাঁর তাতে নেই প্রতিদিনের জীবনের তাড়নার তীব্রভাবে তাড়িত হয়েই তিনি চলেছেন, আর এই জন্যই নজরুলকে এ যুগের একজন অসাধারণ কবি ভাবা কঠিন,[২৬] কিন্তু এ যুগের একজন অসাধারণ ব্যক্তি তিনি অবিসংবাদিতরূপে।

বলা হয়েছে, প্রতিদিনের জীবনের তীব্র তাড়নায় তাড়িত হয়ে চলায় কবি নজরুলের বেশ আনন্দ। কথাটি আর একটু বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন আছে। প্রতিদিনের হাসি-কান্নার জীবন চিরদিনই মানুষকে আনন্দ দিয়ে এসেছে। নইলে জগৎ শ্মশানে পর্যবসিত হতো। কিন্তু প্রকৃত মানুষের মনোভাব যাইই হোক শিক্ষিত মানুষ প্রতিদিনের জীবনকে সব সময়ে যে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেছেন তা নয়। বরং মধ্যযুগ বলতে মানুষের ইতিহাসের যে স্তর নির্দেশ করা হয় তাতে দেখা যায়, সংসারের প্রতিদিনের জীবনের প্রতি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতেই শিক্ষিতেরা তাকিয়েছেন। আধুনিক যুগ এক হিসাবে তার প্রতিবাদ আর এই প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছে আজকে থেকে নয়। আমাদের দেশেও এই প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছে ইংরেজ রাজত্বের প্রায় সূচনায়। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে এই প্রতিবাদ পূর্ণাঙ্গ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালে। এই প্রতিবাদ আজ আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির এক creed, ধর্ম বিশ্বাস, এক সময়ে যেমন তাঁদের ধর্ম-বিশ্বাস ছিল বৈরাগ্য। নজরুল একালের তেমনি প্রত্যয়শীল এক ব্যক্তি। তবে তাঁর বিশেষত্ব এই যে, এই প্রত্যয় তাঁতে অনেকের চাইতে বলবত্তর-এতখানি প্রবলতা তাঁর এই বিশ্বাসে বিদ্যমান যে, আপাতদৃষ্টিতে যে-সব মনে হয় অদ্ভুত খেয়াল-খুশী সে সবকেও মহত্তর মর্যাদা দিতে তাঁর বাধে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর 'আলেয়া' নাটক। নরনারীর প্রেমের সম্বন্ধের যথার্থ নিরূপণ এ-ক্ষেত্রে তাঁর একটি সমস্যা। অবশ্য তীব্র সমস্যা নয়। সমাধান এই দাঁড়ালো যে, কার মন যে কখন কোন দিকে ঝুঁকে পড়বে তার কিছুই ঠিক-ঠিকানা নেই। আরো একটি সমাধান দাঁড়ালো যে, শক্তিমান জীবন ভোগ করে যাবেন, সে-ভোগ যদি অন্যের জন্যে হয় দুর্ভোগ তবু চলবে তাঁর ভোগের অভিযান। কথাটি যে আপত্তিকর কবি সে-বিষয়ে সজাগ, কিন্তু এই বলে' তিনি কথাটি চুকিয়ে দিচ্ছেন যে, যৌবন বেগের এইত ধারা। বলা বাহুল্য যে-সমস্যার অবতারণা কবি করেছিলেন তার কোনো ভালো সমাধান তিনি দিতে পারলেন না ভোগের পথও কুসুমাস্তীর্ণ নয়। কিন্তু সমস্ত অকৃতকার্যতার মধ্যে কবি এ বিষয়ে আশ্চর্যভাবে কৃতকার্য হলেন। সহজ সরল কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করতে পারলেন, জীবন তাঁর কাছে মধুময়; আরো ঘোষণা

---

২৬. দ্রঃ 'আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্ণিশ'

করতে পারলেন এত সুষমাময় চমৎকারিত্বময় যে জীবন তার মায়ায় চিত্ত তাঁর বন্দী হয়ে পড়েছে না, ভুল-ভ্রান্তি, ভোগ দুর্ভোগ, সমস্তের ভিতর দিয়ে চলেছেন তিনি সামনের দিকে একালের জীবন-বাদ ও গতি-বাদের যাঁরা শ্রেষ্ঠ কবি, যেমন Walt Whitman ও রবীন্দ্রনাথ, তাঁদের বাণীর সঙ্গে তুলনায় নজরুলের বাণীর ত্রুটি অনেকক্ষেত্রে চোখে পড়ে; কিন্তু সেই সঙ্গেই চোখে পড়ে বাণীর ত্রুটি তাঁতে যতই থাকুক জীবনের উপলব্ধি তাঁর সুগভীর। তাঁর বিখ্যাত কবিতা-সমষ্টি "সাম্যবাদী" সম্বন্ধেও এ-কথা খাটে। এতে তাঁর যুক্তিতর্ক যেমন প্রচুর তেমনি দুর্বল। কিন্তু সে-সবের মধ্য দিয়ে যে বেদনাময় চিত্তের প্রকাশ ঘটেছে তা পরম শ্রদ্ধার্হ।

নজরুলের কবি প্রকৃতি সম্বন্ধে আরো একটি বড় ব্যাপার লক্ষ্য করবার আছে। নজরুলের ভিতরে তারুণ্য চমৎকার, জীবনের আনন্দ তিনি সহজভাবে অনুভব করতে পারেন, নানা দিকে তিনি একজন সহজ মানুষ এ-সবের কিছুই মিথ্যা নয়। কিন্তু এই সঙ্গে এ-কথাও আছে যে, অন্তরের গোপনতম প্রদেশে তিনি তাত্ত্বিক আর সেই তাত্ত্বিকতা তাঁর যেন জন্মগত। তাঁর এই পরম প্রিয় গোপনতম প্রদেশে তিনি তাত্ত্বিক আর সেই তাত্ত্বিকতা তাঁর যেন জন্মগত। তাঁর এই পরম প্রিয় তত্ত্বের নাম দেওয়া যেতে পারে লীলাবাদ-ইংরেজিতে যা সাধারণত Pantheism নামে পরিচিত। এই দৃষ্টিতে ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য শেষ পর্যন্ত নেই-ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, জন্ম-মৃত্যু উত্থান-পতন, সব কিছুই ভগবানের লীলা। এই তত্ত্বকে বলা যায় একই সঙ্গে অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। হিন্দু-চিন্তার এটি যে মর্মকথা তা না বললেও চলে, সুফী-চিন্তারও এটি মর্মকথা-এক-হিসাবে প্রাচীনকালের ভাবুকদের এটি পরম আশ্রয়। এই হিন্দু-মুসলমানের মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গির দিনেও নজরুল যে অবলীলাক্রমে শ্যামাসঙ্গীত ও বৃন্দাবন গাথা রচনা করে চলেছেন, তৌহীদেরও (একেশ্বর-তত্ত্বের) শক্তিশালী ব্যাখ্যা দিতে পারছেন, তার রহস্য নিহিত রয়েছে তাঁর এই মূল বিশ্বাসের ভিতরে। কিন্তু এই বিশ্বাস যে তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে কিঞ্চিত বিঘ্নও ঘটিয়েছে সেইটিই আমাদের প্রধান বক্তব্য। কবিদের অথবা শিল্পীদের কেউই হয়ত সর্বপ্রকারে 'বিশ্বাস বর্জিত নন, কিন্তু তাঁদের বিশেষত্ব এই যে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু বা ঘটনার যথার্থ উপলব্ধির আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁদের থাকে- সেই উপলব্ধির সময়ে তাঁরা যেন সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত রাগদ্বেষবর্জিত ও অপূর্বভাবে সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে ওঠেন। এই যে পূর্ণ আত্মবিস্মরণ ও বিষয়-নিষ্ঠতা এটি নজরুলের পক্ষে তাঁর শ্রেষ্ঠ মুহূর্তেও প্রায় অসম্ভব হয়েছে লীলাবাদে তাঁর অপরিসীম আনন্দের জন্যে। এই লীলাবাদ তাঁর জন্য এক ধরনের আত্মবিস্মৃতি এনে দিয়েছে, তাঁকে আশ্চর্যভাবে নিরহঙ্কার ও সৌন্দর্য পিপাসু করেছে, কিন্তু কবিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথে এটি এই বাধা উপস্থিত করেছে যে এর ফলে বর্হিমুখী

না হয়ে অন্তর্মুখী তিনি হয়েছেন অনেক বেশি; রূপ বৈচিত্র অঙ্কনের চাইতে Type বা প্রতীক সৃষ্টির দিকে তাঁর মন ঝুঁকেছে।

"বিদ্রোহী" কবিতাটি সম্পর্কে আরো একটু আলোচনা হয়ত অসঙ্গত নয়। প্রাক 'বিদ্রোহী' ও 'বিদ্রোহী' যুগের পার্থক্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'বিদ্রোহী'তেই দুইটি ধারা-এক দিকে তাঁর অন্তরে জাগে অপরিসীম আত্মপ্রত্যয়, অন্যদিকে তিনি নিজেকে জ্ঞান করেন জাতিধর্ম নির্বিশেষে দুঃস্থ মানবতার অগ্রনায়ক।

এর 'বিদ্রোহী' নামকরণ সঙ্গত হয়েছে বলা যায়, কেননা হঠাৎ যে গভীর উন্মাদনা কবির অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে তা গতানুগতিকার বিরুদ্ধে এর তীব্র বিদ্রোহই বটে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে এ এক অপূর্ব উন্মাদনারই কবিতা, কোনো বিদ্রোহীবাণী এতে বিঘোষিত হয়নি। এর যে বিখ্যাত চরণ আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন এটিও ঠিক বিদ্রোহ-বাণী নয় বরং এক হিসাবে গভীর ঈশ্বর-নির্ভরতার বাণী। এ সম্পর্কে তাঁর এই কালেরই রচনা 'দুর্দিনের যাত্রী'র এই কথাগুলো অর্থপূর্ণ :

এমন যার কোনো গুরু বা বিধাতা নেই যাকে ভয় বা ভক্তি করে' সে নিজের আত্মাকে ফাঁকি দেয় শুধু সেই সত্য স্বাধীন, মুক্ত স্বাধীন। এই অহম-জ্ঞান আত্মজ্ঞান-অহঙ্কার-নয়, এ হচ্ছে আপনার ওপর নিজের বিপুল শক্তির ওপর অটল বিরাট বিশ্বাস।

অন্যত্র :

.....'যার অন্তরে আপন সত্য আপন ভগবান সহজে জাগে না তাদের ভগবান এমনি করে বুকে লাথি খেয়ে তবে জাগে।'

অন্যত্র :

....."বিদ্রোহের মতো বিদ্রোহ যদি করতে পার, প্রলয় যদি আনতে পার তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই-কল্যাণ আসবেই।

দুর্বল, এমন কি অনাবশ্যক, চরণ থেকে 'বিদ্রোহী' মুক্ত নয়। এ ত্রুটি মারাত্মক। কিন্তু এত ত্রুটি সত্ত্বেও বাংলা কাব্যে 'বিদ্রোহী'র জন্য যে একটি সম্মানিত স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে তা নিঃসন্দেহ। সমস্ত অদ্ভুতত্ত্ব সত্ত্বেও এর উন্মাদনা অপূর্বভাবে প্রাণপূর্ণ।

যে-লীলাবাদে 'বিশ্বাস কবির মজ্জাগত বলেছি, তারও সঙ্গে আমাদের প্রথম স্পষ্ট পরিচয় হচ্ছে এতে, বিশেষ করে' এই এই সব চরণে-

জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ
স্বর্গ পাতাল মর্ত।

আমি উন্মাদ আমি উন্মাদ-
আমি চিনেছি আমারে আজিকে আমার
খুলিয়া গিয়েছে সব বাঁধ।

'বিদ্রোহী' তে কবির ঈশ্বর-বিদ্রোহ প্রকাশ পায়নি বটে, কিন্তু এর পরের 'ধুমকেতু' কবিতায় সে-বিদ্রোহ পুরোপুরি প্রকাশ পেয়েছে-

জানি ঐ ভূয়ো ঈশ্বর দিয়ে হয়নি যাহাও হবে তাও,
তাই বিপ্লব আনি বিদ্রোহ করি.....
ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, রাশিয়ার সাম্যবাদের দিকে কবি এখানে বিশেষভাবে ঝুঁকেছেন বোধ হয় তাঁর এই সময়ের প্রধান বন্ধু কমরেড মুজাফফর আহমদের প্রভাবে। তাঁর 'বিদ্রোহী' যুগের প্রায় সমস্ত কবিতায় এই সাম্যবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু পুরোপুরি সাম্যবাদী নজরুল কখনো হননি, হলে তাঁর এই সাম্যবাদ প্রচারের দিনে 'খালেদ' 'ওমর' 'জগলুল' প্রভৃতি প্যান ইসলামী ভাবের কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হতো না। সাম্যবাদের প্রভাবে তাঁর ভিতরে ঘনীভূত হয়েছে দুঃস্থ ও বঞ্চিত মানবতার জন্য তাঁর দরদ। তাঁর ঈশ্বর-দ্রোহ মানব সমাজের দুর্বল ন্যায়-অন্যায়-বোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-অভিমানের ভঙ্গিতে; তার বেশি কিছু বলে' মনে হয় না।

তৃতীয় স্তর

'বিদ্রোহী' -যুগ নজরুল সাহিত্যের আলোচনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা তাঁর জনপ্রিয়তার মূলে এই যুগের রচনা। কিন্তু এই যুগ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এই 'বিদ্রোহী' যুগের উদ্দীপনা পূর্ণ-পরিণতি লাভ করবার পূর্বেই বিস্মিত দেশবাসী তাঁর কণ্ঠে শুনতে পেলো 'বাঁগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল' অথবা 'আমারে চোখ-ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদি' ইত্যাদি গজল।

'বিদ্রোহী' -যুগ নজরুলের জন্য জনপ্রিয়তা আনলেও তাঁর কাব্য সাধনা ব্যাপক সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর গানে, এ বিষয়ে বাংলার কাব্যরসিকরা বোধ হয় একমত। রেখাপাতের যে অপরিচ্ছন্নতা 'বিদ্রোহী'- যুগের অনেক রচনায় লক্ষ্য করা গেছে, তা যে 'গানে'র যুগে প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে, শুধু অনবদ্য চরণ নয় অনবদ্য কবিতা তাঁর কলম থেকে উৎরেছে, তা মিথ্যা নয়। তাঁর রচিত গান সম্বন্ধে একটি উপভোগ্য রচনা তাঁর 'বুলবুল সঙ্গীত-গ্রন্থের ভূমিকা রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। লেখক তাতে নজরুলের অনেক চরণের সৌন্দর্য সমন্ধে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে তা সমর্থনযোগ্য। শুধু একটি ব্যাপার তিনি লেখানে লক্ষ্য করেন

নি, সেটি এই যে, নজরুলের এই সব সুন্দর প্রেমের কবিতা সংখ্যায় কম আর শীগগিরই পুনরুক্তি দোষ তাঁকে ঘটেছে। Type বা প্রতীক সৃষ্টির দিকে তাঁর যে বিশেষ ঝোঁক তারও প্রমাণ এই সব গানে রয়েছে।

যিনি খ্যাতি লাভ করলেন বিদ্রোহী রূপে, কাব্য-লক্ষ্মীর প্রসাদ অজস্র ভাবে তিনি লাভ করলেন প্রেম-সঙ্গীতের রচয়িতা রূপে! বাংলা সাহিত্যে এ ব্যাপারটি কিন্তু নতুন নয়। বীররস, মহাকাব্য, এসব বাংলার ধাতে যেন সহ্য হয় না। মধুসূদন বিরাট আয়োজন করলেন, কিন্তু সে-চেষ্টায় বীররস যতখানি সৃষ্টি হলো তার চাইতে অনেক বেশি হলো করুণ রস। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তো নাস্তানাবুদ হলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার এই ধাত বুঝে এ পথে পা দিলেন না, তবে নিজের বিরাট জীবন সাধনার গুণে অজানিতভাবে বীররসের সৃষ্টি করলেন কোনো কোনো কবিতায়-যেমন 'বর্ষশেষ'। হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম রণ-দামামা আর লেফট রাইট মার্চের ধ্বনি কানে নিয়ে ঘরে ফিরলেন। এর সঙ্গে তাঁর নতুন উত্তেজনা ও উন্মাদনা লাভ হলো রাশিয়ার লাল পল্টনের রণ-হুঙ্কারে। এই বিপুল উত্তেজনা ও উন্মাদনা যে তার কাব্য-প্রয়াসে ব্যর্থ হলো তা বলা যায় না, কিন্তু সার্থকতা যা লাভ হলো চেষ্টার অনুপাতে তা কম! অথচ করুণ রস, বিরহ, এ-সব বাংলায় জমে' ওঠে যেন সহজে। সেকালে চণ্ডীদাস অমর বিরহ-গাথা রচনা করে গেছেন, বাংলার মাঠে বাটে আজো তার ধুয়া শোনা যায়। এর কারণ মনে হয় বাংলার বিশেষ জীবন-ধারা। বৃহত্তর জীবন সৃষ্টির চেষ্টা বাংলার যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু কেমন করে' যেন সে-সব শেষ পর্যন্ত জমে' ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত বাঙালির অবলম্বন হয়েছে তার নগণ্য গৃহ, তার বহতা নদী, তার সবুজ গাছপালা, ফসল ক্ষেত আর নীল আকাশ, আর তার প্রেমময়ী নারী। এই পরিবেষ্টনে আর মহাকাব্য যদি না জমে তবে দুঃখ করা চলে না। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, বাংলার যে আবহমান প্রাণ-ধারা তার সঙ্গে নজরুলের যোগ আশ্চর্যভাবে নিবিড়।

নজরুল যে প্রেম-সঙ্গীত রচনা করেছেন তা বুঝতে গেলে সহজেই চোখে পড়ে, তাঁর 'বাধন-হারা' পত্রোপন্যাসে তাঁর প্রথম জীবনের যে ব্যর্থ প্রেমের ছবি তিনি অঙ্কিত করেছিলেন সেইটিই হয়ে রয়েছে তাঁর সারা জীবনের ধুয়া। কিন্তু তাঁর প্রেম যেমন রাধিকার 'নতুন-মন-ধন জীবন যৌবন তব পায়ে সমর্পণের প্রেম নয়, তাঁর বিহরও তেমনি রাধিকার বুক-ভাঙা বিরহ নয়। যে-বিরহচ্ছবি তাঁকে মুগ্ধ করেছে সেটি সংসার অনভিজ্ঞ, অবুঝ, কিশোর-কিশোরীর বিরহ। এ বিরহে তাদের জীবন যে ব্যর্থতায় তিক্ত হয়ে উঠেছে ঠিক তা নয়, হয়ত দৈনন্দিন জীবন তাদের চলেই যাচ্ছে, কিন্তু এ বিরহ বোধ তাদের জন্য হয়েছে যেন জীবনের এক অতুলীয় অভিজ্ঞতা-জীবন যেন পরম সমৃদ্ধ হয়েছে এই বিরহের স্পর্শমণির

ছোঁয়ায়। ভাব-বিলাসিতা বলে' এই বিরহ-ছবি আজকের মতো এতখানি মনোরম না-ও হতে পারে; কিন্তু এই সত্য যে কবির সমসাময়িকেরা কবির এই বিরহ-সঙ্গীত নিবিড়ভাবে উপভোগ করেছেন ও করছেন; এই প্রভাব বাংলার সমসাময়িক গানের উপরেও অসামান্য।

এইসব প্রেমসঙ্গীত রচনার সঙ্গে সঙ্গে নজরুল ইসলামী সঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত ও বৈষ্ণব সঙ্গীত রচনায় মন দেন। ইসলামী সঙ্গীতের অধিকাংশ প্রচলিত উর্দু গজল ও 'নাতিয়া'র (প্রশস্তি) ভঙ্গিতে রচিত। কবির নিজের কাছে এই সব সঙ্গীত যথেষ্ট মূল্যবান, কেননা এই সব সঙ্গীতের ভিতর দিয়েই বাংলার মুসলিম জনসাধারণের চিত্তের তিনি প্রবেশ পথ পেয়েছেন। মুসলিম জনসাধারণও এতে যে কিছু প্রীত না হয়েছে তা নয়। কিন্তু আমরা এ-বিষয়ে কবির সঙ্গে একমত হতে নারাজ। এক শ্রেণীর সুফীর যে উৎকট গুরুভক্তি, মুখ্যত তাই রূপ পেয়েছে এই সব গানে। ভাব বিলাসিতাও এ-সবে প্রচুর। কিন্তু মনে হয়, ধর্ম সম্পর্কে এই ভাব-বিলাসিতার দিন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এর চাইতে হজরত মোহাম্মদের সবল কাণ্ডজ্ঞান, চরিত্র মাহাত্ম্য, এ-সব কেন্দ্র করে যদি গান রচনা সম্ভবপর হতো তবে তার সার্থকতা হতো অনেক বেশি। ইসলাম এক হিসাবে ধর্ম-জগতে এক বিদ্রোহের সূচনা করেছে প্রতীক-চর্চায় আপত্তি জানিয়ে; আর বিদ্রোহী যে তার সত্যকার মহিমা নিরন্তর বিদ্রোহে।

ইসলামী সঙ্গীতের চাইতে শ্যামাসঙ্গীত রচনায় নজরুল সার্থকতা অর্জন করেছেন অনেক বেশি। বাংলার শ্যামাসঙ্গীত বাংলা সাহিত্যের এক গৌরবের বস্তু, বিশেষ করে' রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত। কিন্তু বাংলার প্রচলিত শ্যামাসঙ্গীতের মধ্যে নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতে একটা বিশিষ্টতা ফুটেছে। কাব্যে রূপ বর্ণনা একই সঙ্গে রূপ ও অরূপের বর্ণনা। কিন্তু অধিকাংশ শ্যামাসঙ্গীতে-যেমন অনেক ধর্ম সঙ্গীতে রূপ স্থূল হয়ে উঠেছে, অরূপের মহিমা ক্ষুণ্ন হয়েছে বড় বেশি। কিন্তু নজরুলের কোনো কোনো শ্যামাসঙ্গীতে উপভোগ্য কবিতা হয়েছে।

বৈষ্ণব সঙ্গীতে শ্যামাসঙ্গীতের মতো সাফল্য সাধারণত নজরুলের লাভ হয়নি। তার কারণ বোধ হয় তাঁর অনুভূত প্রেমের চাঞ্চল্য। বৈষ্ণব পদকর্তারা এক্ষেত্রে এত বড় সাফল্য অর্জন করে গেছেন যে, তাঁদের পরে তাঁদেরই ভঙ্গিতে তাঁদের সেই গান জমানো সুকঠিন। কিন্তু সম্প্রতি নজরুল যে অনুভূতির ভিতর দিয়ে চলেছেন তার ফলে তাঁর এখনকার বৈষ্ণব সঙ্গীত অপরিসীম মাধুর্য মণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় তাঁর সম্প্রতি রচিত "অভিসার" সঙ্গীত-সমষ্টি।[২৭] প্রেমের চাঞ্চল্য, দেহ, চেতনা, এ-সব আশ্চর্য ভঙ্গিতে উঠে গেছে

---

২৭. কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এক উন্নততর স্তরে। তাঁর এখনকার প্রেমের গান পূর্ণ আত্মনিবেদনের গান হয়ে উঠেছে, এবং মনে হয়, তাঁর পূর্বের অনেক শ্রেষ্ঠ প্রেমসঙ্গীত তাঁর এখনকার ভাবধারার আলোকে নূতন মহিমা লাভ করেছে।

তবে তাঁর আধুনিক জীবনের পরিণতি কোথায়, বলা সোজা নয়। এর ফলে তাঁর কবি জীবনের অবসান ঘটাও বিচিত্র নয়- যে তাত্ত্বিকতা তাঁর জীবনের মর্মমূলে আমরা দেখেছি তাই হয়ত জয়ী হবে পূর্ণভাবে। অথবা, এর ফলে সমৃদ্ধতর চিত্ত তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি নিয়ে তিনি নূতন করে জীবনে ও সাহিত্যে প্রবেশ করতে পারেন।

কবি নিঃসঙ্গ নন- কোনো সমাজের বা জাতির তিনি প্রতিনিধি। নজরুল এ যুগের বাঙালি জাতির প্রতিনিধিত্ব করেছেন প্রধানত জড়তার বিরুদ্ধে বারবার সংগ্রাম ঘোষণা করে' ও নির্যাতিত জনসাধারণের পক্ষ সমর্থন করে'; আর মুসলমান-সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাদের মন নব নব আশা-উদ্দীপনার সঞ্চার করে', বিশেষ করে' বাংলার বা ভারতের আবহমান প্রাণ ধারার সঙ্গে তাদের প্রেমের নিবিড় যোগ স্থাপন করবার আহ্বান জানিয়ে।

কবি একই সঙ্গে জ্ঞানী ও প্রেমিক। জ্ঞানী যদি তিনি কিছু কম হন তবু খুব ক্ষতি হয় না, কিন্তু প্রেমিক হওয়া চাই তাঁর পুরোপুরি। সেই প্রেমের সাধনাই মুখ্যত নজরুলের সাধনা হয়েছে। দেশ ও জাতির প্রতি সেই প্রেমে সেই পূর্ণ আত্মনিবেদনে নজরুলের এ কালে মুসলমানদের মধ্যে অথবা হিন্দু-মুসলমান সবার মধ্যে, এক সম্মানিত ব্যক্তি -যে বৃহৎ জীবনের অথবা জাতীয় জীবনের চেতনা দেশে অনুভূত হয়েছে তাতে তাঁরও প্রতিভার স্পর্শ লেগেছে। এই জনজাগরণের দিক দিয়ে দেখলে সহজেই চোখে পড়ে নজরুলের ঐতিহাসিক মর্যাদা কত বড়।

১৩৪৮

স্যার সুরেন্দ্রনাথ তাঁর A Nation in Making গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সূচনা স্বদেশী আন্দোলন থেকে, তার পূর্বে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক মধুর ছিলো। এ-ধারণা শুধু স্যার সুরেন্দ্রনাথের নয়, আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির। এর বিশেষ অর্থের আলোচনা আমরা তৃতীয় বক্তৃতায় করবো। আপাতত বলা যায়, কোনো কোনো অর্থে একথা সত্য, যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "বিচ্ছিন্ন জিনিস জড়ের মত পড়িয়া থাকিলে তবু টিকিয়া থাকে, কিন্তু কোনো উপায়ে কোনো বায়ুবেগে তাহাকে চালনা করিতে গেলেই সে ছড়াইয়া পড়ে, সে ভাঙিয়া যায়, তার এক অংশ অপর অংশকে আঘাত করিতে থাকে; তাহার অন্তরের সমস্ত দুর্বলতা নানা মূর্তিতে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়।"[২৮] স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে-রাজনৈতিক স্বার্থ-বোধ দেশে জাগলো তার ফলে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ উত্তরোত্তর প্রবল হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে এ দেশে হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধ মধুর ছিল ঐতিহাসিক সাক্ষ্য তার বিরুদ্ধে। এমন কি, দেশের এই দুই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ শুধু অপরিচয়ের সম্বন্ধ ছিল এও বলা যায় না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরিদপুরে ও যশোরে মুসলমান চাষী ও নমঃশূদ্রদের ভিতরে দীর্ঘকালব্যাপী একাধিক দাঙ্গা হয়েছিল, তাতে সেই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানদের অনেকে দুই পক্ষে যোগ দিয়েছিল।[২৯] মোঘল শাসনের শেষভাগে গুজরাটে ও কাশ্মীরে যে দুটি ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল বিখ্যাত ইতিহাস 'সিয়ারুল মোতা'আখেরী'ন- এ তার উল্লেখ আছে এইভাবে :

সম্রাট ফেরোখশিয়ারের সিংহাসনারোহণের বৎসরে আহমদাবাদে এক হিন্দু গৃহস্থ হোলির সময়ে তার বাড়ির উঠানে হোলি জ্বালালে। তখন হোলির সময়ে বিষম মাতামাতি হতো। আঙিনা-সংলগ্ন ও আঙিনার অতি অল্প অংশের অধিকারী মুসলমান গৃহস্থেরা তাতে আপত্তি করলো। হিন্দু গৃহস্থ সে আপত্তি শুনলেন না, বল্লে প্রত্যেকের তার নিজের বাড়িতে সর্বময় কর্তৃত্ব আছে। পরের দিন পড়লো হজরত মোহাম্মদের মৃত্যু-বার্ষিকী। সেই উপলক্ষ্যে মুসলমান গৃহস্থেরা একটি

---

২৮. দ্রঃ 'পথ ও পাথেয়'

২৯. ফিরোজাবাদের দাঙ্গার তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতেও এই ধরনের দাঙ্গা সেখানে হয়েছিল।

গরু কিনে এনে সেই আঙিনায় জবাই করলে। এতে সেই অঞ্চলের সমস্ত হিন্দু উৎক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করলে মুসলমানেরা পালিয়ে যে যার বাড়িতে আশ্রয় নিলে। তখন সেই উৎক্ষিপ্ত হিন্দু জনতা গোহত্যাকারী কশাইয়ের সন্ধান করলে; তাকে না পেয়ে তার চৌদ্দ বৎসর বয়সের ছেলেকে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সেই গোহত্যার স্থানে বলি দিলে। তখন শহরের সমস্ত বিক্ষুব্ধ মুসলমান ও আফগান সৈন্য কাজীর বাড়ি উপস্থিত হলো। কাজী জানতেন শাসনকর্তা দায়ুদ খাঁ পণী এ ব্যাপারে হিন্দুদের পক্ষ নিয়েছেন, তিনি এদের মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারা উত্তেজিত হয়ে কাজীর বাড়ির সদর দরজা ভাঙলে—হয়তো কাজীরই গোপন ইঙ্গিতে—ও তারপরে আরম্ভ করলে শহরের হিন্দুদোকানে আগুন দিতে। অচিরেই কাপূর চাঁদ নামক একজন রত্ন-বণিক লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের বাধা দিলে। কয়েকদিন এভাবে গণ্ডগোল চললো। শেষে শাসনকর্তা মুসলমানদেরই বেশি দোষী সাব্যস্ত করলেন।

কাশ্মীরের দাঙ্গাটি এর কিছুকাল পরে ঘটে। সেখানকার আব্দুল নবী ওরফে মাহাতাবী ভয়ানক হিন্দু-বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। এই অরাজকতার কালে একদল ভবঘুরে উচ্ছৃঙ্খল মুসলমান জুটিয়ে তাদের নেতা হয়ে সে স্থানীয় শাসনকর্তা ও কাজীর কাছে এই প্রস্তাব করলে যে এর পরে হিন্দুদের আর কোনো সম্ভ্রমসূচক যান-বাহন বা বস্ত্রাদি ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না; বাগান ও স্নানের ঘাটও তাদের জন্য নিষিদ্ধ হবে। সহকারী-শাসনকর্তা ও কাজী বললেন, মহামান্য বাদশাহের যা হুকুম তাই-ই কাশ্মীরে চলবে। বলা বাহুল্য এতে মাহাতাবী খাঁ সন্তুষ্ট হলো না। এর পর তার কাজ হলো সুবিধা পেলেই হিন্দুদের আক্রমণ করা ও তাদের উপর অত্যাচার করা। একদিন সাহাব রায় নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত হিন্দু এক বাগানে উৎসব করছিলেন। সেই নিরপরাধ লোকদের উপর সে তার দলবল নিয়ে হামলা করলে এবং যত পারলে খুন জখম করলে। সাহাব রায় পালিয়ে সহকারী-শাসনকর্তার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। তাঁর বাড়ি এই মাহাতাবী খাঁর দল ইচ্ছামত লুটতরাজ করলে সেই অঞ্চলে কোনো হিন্দুবাড়ি বাদ গেল না। এই সব বাড়িতে আগুন দেওয়াও চললো। যে সমস্ত মুসলমান এই হতভাগ্যদের জন্য দুকথা বলতে এলেন তারাও খুন জখম হলেন। এই মাহাতাবী খার দলের সঙ্গে কাশ্মীরের রাজপুরুষেরা এঁটে উঠতে পারলেন না, তাঁরা পালিয়ে গেলেন। তাঁদের আশ্রিত হিন্দুদের উপরে তখন হলো অকথ্য অত্যাচার। জয়ী হয়ে মাহাতাবী খাঁ স্থানীয় মসজিদে নিজেকে "দিনদার খাঁ" (ধর্মরক্ষক) বলে' ঘোষণা করলে ও শাসনকাজ চালাতে লাগলো। রাজপুরুষদের একজনের চক্রান্তে মাহাতাবী ও তার দুই শিশুপুত্র নিহত হলে তার দল উৎকট হত্যাকাণ্ড চালালে। প্রায় তিন হাজার

লোক তাদের হাতে মারা পড়লো— তার অধিকাংশই মোঘল। কয়েক মাস ধরে' এই দাঙ্গা চলে।

শেষের এই ঘটনাটি "সয়ারুল মোতা' আখেরীন" এর লেখক বলেছেন একদল শয়তানের কাজ। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ যাঁরা বুঝতে চান তাঁদের জন্য সেখানের এই দুটি ঘটনাই খুব অর্থপূর্ণ। একালের কলকাতা, ঢাকা, কানপুর, চাঁটগা প্রভৃতি স্থানের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সঙ্গে এসবের আশ্চর্য মিল রয়েছে।

হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধের মূল কারণ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলেছেন— The Muhammadan is a bully and the Hindu is a coward মুসলমান গুন্ডা আর হিন্দু কাপুরুষ। এই কথাই কেউ কেউ তত্ত্বের ভাষায় বলেছেন মুসলমান রাজসিক, হিন্দু সাত্তিক, তবে দুই-ই কিছু কিছু বিকৃত। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রকৃতির ভেদ আছে; তাও সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক এমন স্পষ্ট ভেদ আছে কি না সন্দেহ। সে-ক্ষেত্রে দুটি বিরাট ধর্ম-সম্প্রদায়কে মানস প্রকৃতির দিক থেকে স্পষ্ট দুইভাগে ভাগ করবার চেষ্টা বিপত্তি ঢের। বাস্তবিক, কি সেকালের দাঙ্গা কি একালের দাঙ্গা কোনোখানেই হিন্দুর শুধু কাপুরুষতার মুসলমানের শুধু জঙ্গবাহুদুরীর পরিচয়ই যে আছে তা নয়। কোনো কোনো শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের ভিতর কিছু পার্থক্য থাকলেও এই দুই বিরাট সমাজের ভিতরে আশ্চর্য কোনো পার্থক্য যে নেই তার প্রমাণ স্বরূপ এই কটি কথার উল্লেখ করা যেতে পারে :

প্রথমত, গুন্ডার ভাব দুপক্ষের প্রকৃতিতেই আছে, কেননা নৃশংসতার পরিচয় কোনো পক্ষে কম নেই, দাঙ্গায় আগ্রহী হবার অপরাধ থেকেও কোনো পক্ষ মুক্ত নয়; ভীরুতাও দুই পক্ষেই আছে। ঢাকার দাঙ্গায় দেখেছি হিন্দুরা মুসলমানের ভয়ে পালিয়েছে, মুসলমান-বস্তি সারারাত জেগে কাটিয়েছে এই ভয়ে যে কখন হিন্দুরা এসে ঘর জ্বালিয়ে দেবে। দ্বিতীয়ত, যাঁরা বলেন, ভারত বিশেষভাবে অহিংসার ও পরধর্মপ্রীতির দেশ তাঁদের দৃষ্টি এই ঐতিহাসিক ব্যাপারের দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত—

(ক) হিন্দু ও বৌদ্ধের বিরোধিতায় বৌদ্ধ নিশ্চিহ্ন হয়েছে, বৌদ্ধদের উপরে যে অত্যাচার হয়েছিল কোনো কোনো খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের এই মত,[৩০] বৌদ্ধদের যে একটি বিরাট সংস্কৃতি ছিল একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মনীষী আলবেরুনী তাঁর ব্রাহ্মণ আচার্যদের কাছ থেকে সে-সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ পাননি।

---

৩০. ভারতীয় বিশেষজ্ঞ শ্যাম শাস্ত্রীর মতে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদের কৌশলে পর্যুদস্ত করেছিল বলে নয়। "Evolution of Indian Policy" দ্রষ্টব্য।

(খ) যদি চাণক্যের অর্থশাস্ত্র ও বৌদ্ধজাতক ভারতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য মনে করা না হয় তবে বলা যায়, স্বজন-শোণিত রঞ্জিত সিংহাসন শুধু পাঠান ও মোঘল ভারতের বিশেষত্ব নয়, হয়ত ভারতের বিশেষত্ব। তৃতীয়ত, মুসলমানের ইতিহাস হিন্দুর মতন দীর্ঘ না হলেও কম দীর্ঘ নয়, ঘটনাবহুল তো বটেই। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও নাস্তিক্য, একত্ববাদ ও বহুত্ববাদ, একান্ত দৈবানুগত্য ও একান্ত পুরুষকার-বাদ, একান্ত শাস্ত্রানুগত্য ও একান্ত মুক্তবুদ্ধিপ্রবণতা, প্রেম ও অহিংসা এবং সংকীর্ণ দৃষ্টি ও পরধর্ম বিদ্বেষ এর কিছুই হিন্দু ও মুসলমান কারো ইতিহাসে দুর্লভ নয়। আর সব চাইতে বড় কথা এই— দুই সম্প্রদায়ই জীবন্ত, কারো অভিব্যক্তি থেমে যায় নি।

হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধের কারণ কি সোজাসুজিভাবে এই দুরূহ প্রশ্নের সম্মুখীন না হওয়াই ভাল। তার পরিবর্তে মুখ্যত তাদের বর্তমান চিন্তা-ভাবনার আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে এ-বিরোধ মীমাংসার অন্তত এ বিরোধে অভিভূত না হবার, কিছু শক্তি আমাদের লাভ হবার সম্ভাবনা আছে। মুসলমান কম পরিচিত, সেজন্য তার পরিচয় আগে নেবার দরকার। কিন্তু তার একালের পরিচয় লাভের জন্যও অল্প-বিস্তর পূর্বাভাসের প্রয়োজন।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা মোহাম্মদের প্রচারক-জীবন সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করে দেখেন— মক্কার জীবন ও মদিনার জীবন। তাঁরা বলেন মক্কার জীবনে তিনি ছিলেন ধর্ম প্রচারক—অন্যান্য ধর্ম প্রচারকের মতো সত্যদ্রষ্টা মানব-প্রেমিক নীতির প্রবর্তক। এ সব বিশেষণ তখন তাঁর জন্য শোভন; কিন্তু মদিনার জীবনে তিনি বিজয়ী বীর ও রাষ্ট্রের অধিনায়ক। অপরপক্ষে মুসলমান চিন্তাশীলেরা তাঁর মদিনার জীবনকেই বেশি মর্যাদা দেন, কেননা মুসলমান-মণ্ডলী তাঁদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন নির্দেশ তাঁর মদিনার জীবন থেকেই লাভ করে আসছেন। এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে রয়েছে দুই রকমের ভুল। অমুসলমান দলের ভুল— তাঁরা ধর্ম বলতে প্রধানত প্রাচীন আচার্যদের জীবনাদর্শ ও মতামতই বোঝেন; কোনো নূতন আদর্শ ও মত হজরত মোহাম্মদের জীবনের ও সাধনায় রূপ লাভ করেছে কিনা সে-কথাটি বুঝে দেখবার মতো ধৈর্যের ও বিনয়ের তাঁদের অভাব। আর মুসলমান দলের ভুল—যাঁকে তাঁরা ধর্মগুরু জ্ঞান করেছেন তাঁর সব কাজই তাঁরা মনে করে বিচারের অতীত।

যাই হোক, হজরত মোহাম্মদের মদিনার জীবনের প্রভাবেই মুসলমান জগৎ গড়ে উঠেছে। সেই জীবনের ভূমিকা হচ্ছে মুসলমান মণ্ডলীর প্রতি পৌত্তলিক ও ইহুদি আরবদের নির্মম শত্রুতা যার জন্য নায়কের একান্ত অনুবর্তিতা, একচিত্ততা বিপক্ষের প্রতি সন্দেহশীলতা, প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের জন্য অবশ্যকাম্য হয়ে

দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যারা বলেন, মদিনার মোহাম্মদ মুখ্যত রাষ্ট্রনেতা, তাঁরা এই বড় ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে ভুলে যান যে তাঁর জীবনের এই কালে তাঁর প্রেরণা-লব্ধ কোরআনে যে-সব নির্দেশ প্রকাশ পেয়েছে আর মুসলমান সমাজে সে-সবের যে-রূপ লাভ হয়েছে তা তাঁর শিক্ষার চিরন্তন রূপ না বলে সাময়িক রূপও বলা যেতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। মদিনায় অবতীর্ণ একটি "সুরা'র শেষে বলা হয়েছে— "হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহর রোষে যারা পতিত হয়েছে সেই দলের লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না (৬০:১৩)। টীকাকার বলেছেন, এখানে ইহুদিদের কথা বলা হয়েছে। সমসাময়িক মুসলমানেরা হত এই কথাই ভাল করে' বুঝেছিলেন এবং তাঁদের অনুবর্তিতায় পরবর্তী মুসলমানেরা হয়ত বুঝে নিয়েছেন যারা মুসলমান-সম্প্রদায়-ভুক্ত নয় তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরআনের অনভিপ্রেত। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় এই বাক্যের সত্যকার মর্যাদা যে ক্ষুণ্ন হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। একথা স্বীকার করা যেতে পারে যে সেই দিনে মুসলমান বিশেষভাবে ধর্মপ্রাণ ছিলেন আর তাঁদের ধ্বংসকামী গর্বিত ইহুদি ধর্মপ্রাণ ছিলেন না। কিন্তু ধর্মপ্রাণতা কোনো সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ নয়, তাই কালে কালে এমন অবস্থার উদয় সম্ভবপর যখন মুসলমান-সমাজের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের বন্ধু সেই সমাজে দুর্লভ হতে পারে ও সেই সমাজের বাইরে সুলভ হতে পারে। এ সম্ভাবনার কথা মুসলমান অমুসলমান উভয়পক্ষই যে কোরআনের এই ধরনের বাণীর ব্যাখ্যাকালে বিস্মৃত হয়েছেন একে শোচনীয় না বলে উপায় নেই। তবে মুসলমানের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ধারায় এই স্থূল ব্যাখ্যাই একমাত্র সত্য নয়; যদিও প্রবল সত্য; মুসলমান দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকেরা ও ভক্তরা অনেকখানি স্বতন্ত্রভাবে কোরআন ও হজরত মোহাম্মদের জীবন বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। এর একটি দৃষ্টান্ত বড় অদ্ভুত। যে যুগে সুলতান মাহমুদ ভারতের মন্দির ধ্বংস করে' ধনরত্ন আত্মসাৎ করেছিলেন সেই যুগে ইসলামে পরম শ্রদ্ধান্বিত আলবেরুনী অশেষ যত্নে ও শ্রদ্ধায় হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধান করছিলেন, তার উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার করে' জ্ঞানীদের দরবারে উপহার দিচ্ছিলেন।

ইসলামের পরিস্ফূর্তির মূলে এই যে বিশেষ রাজনৈতিক প্রভাব একই সঙ্গে এটি ইসলামের শক্তির ও দুর্বলতার কারণ হয়েছে। শক্তির কারণ এই জন্য যে ধর্মাদর্শের সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপলাভ তার সার্থকতার জন্য একান্ত বাঞ্ছিত, নইলে তা রয়ে যায় শুধু সম্ভাব্যতার দেশের ব্যাপার। এর দৃষ্টান্ত—ইসলামে সাম্য-নীতি। অন্যান্য ধর্মাচার্যও সাম্য-নীতি প্রচার করেছিলেন, কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ এই জন্য যে ধর্মাদর্শের কোন বিশেষ রূপই তার চরম রূপ নয়; আদর্শের বিকাশ আছে তার রূপেরও বিকাশ আছে; কিন্তু ধর্মাদর্শের সাধারণত

কঠিন-দেহ, কোনো ধর্মাদর্শ যদি একবার কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপ লাভ করে তবে তারও রূপান্তর সহজ সাধ্য হয় না। এর দৃষ্টান্ত বিপক্ষের সঙ্গে মুসলমানের সম্বন্ধ। সে-ক্ষেত্রে একবার যে তলোয়ারের সম্বন্ধ বড় হয়েছিল তারপর সে তলোয়ারকে কোষবদ্ধ করা দুঃসাধ্য হচ্ছে; যদিও হজরত মোহাম্মদের বহু কর্মের ও কোরআনে বিপক্ষের সঙ্গ সম্পর্কে প্রীতি অগ্রগণ্য হয়েছে, মুসলমান সভ্যতাও মাঝে মাঝে এর প্রকাশ মনোজ্ঞ হয়েছে।

মুসলমানের চিন্তার ইতিহাসে খুব বড় যে ব্যাপারটি চোখে পড়ে সেটি হচ্ছে বিচার-বুদ্ধি ও শাস্ত্রানুগত্য এই দুইয়ের ভিতরে কঠোর সংগ্রাম, আর সে সংগ্রামে জনসাধারণের প্রাধান্য। ভারতেও বিচার-বুদ্ধি ও বেদানুগত্যের ভিতরে যে সংগ্রাম হয়েছিল তা কঠোর, কিন্তু সে সংগ্রামে জনসাধারণ হয়েছিল অনুবর্তী, নেতা নয়। এর বড় কারণ হয়ত এই যে ইসলামের বাহন হয়েছিল একটি দুর্ধর্ষ চির-স্বাধীন জাতি। বহু বিরুদ্ধতার পরে একবার তারা হয়ত মোহাম্মদের বিরাট বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নত করেছিল; কিন্তু বিকাশোন্মুখ মানুষকে যে নানা মতবাদের কাছে বারবার নত করতে নয়, অবশ্য কৌতূহলে ও অনুরাগে, সে-কথা ভাল করে' বুঝবার মতো অনুকূল অবস্থার সৃষ্টির পূর্বেই আর একটি দুর্ধর্ষ জাতি, অর্থাৎ তাতার জাতি এসে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল ইসলামের পরিচালনার। তাই ইসলামের আবির্ভাব থেকে প্রায় চারশত বৎসরের মধ্যে চিন্তার প্রভূত বৈচিত্র্য মুসলমান জগতে প্রকাশ পেলেও সর্বসাধারণ মুসলমানের জন্য একাল পর্যন্ত বিশেষ শ্রদ্ধার সামগ্রী হয়ে আছে দুটি বিষয়— কোরআন ও হজরত মোহাম্মদের বাণী, অথবা, সোজাসুজি ভাবে এই দুইয়ের অনুবর্তিতা। এর বাইরে আর একটি ব্যাপারও দীর্ঘকাল তাদের চিত্ত আকৃষ্ট করেছিল— সুফীর অধ্যাত্ম-বাদ বা অন্তর্জ্যোতিবাদ, বিরাট ব্যক্তিত্বশালী ইমাম গাজ্জালীর প্রভাবে এই মতবাদের বিস্তার ঘটে। কিন্তু শাস্ত্রানুগত্যের সঙ্গে যেভাবে যুক্ত করে' এই তত্ত্ব তিনি জনসাধারণকে দিয়েছিলেন তারই ভিতরে নিহিত হয়েছিল এর ভবিষ্যৎ অসার্থকতার বীজ।

মুসলমানের চিন্তার ইতিহাসে বিচার-বুদ্ধির পরাভব ব্যাপারটি বেশ বুঝে দেখবার মতো। মুসলমান চিন্তাশীলদের তিনটি বড় দলে ভাগ করে দেখা যেতে পারে— বিচার পন্থী, মধ্য পন্থী, একান্ত শাস্ত্রানুগত্য পন্থী। বিচার-পন্থীরাও এক হিসাবে শাস্ত্রানুগত্য-পন্থী, তবে শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যায় বিচার বুদ্ধির সহায়তা তাঁরা বিশেষভাবে গ্রহণ করতেন। এই দলের এক আদি ব্যক্তি আব্বাসীয় শাসনের প্রারম্ভের ইমাম আবু হানিফা। তাঁর মতানুবর্তী হানাফী দল মুসলমান জগতে, বিশেষ করে' ভারতবর্ষে, সংখ্যাগরিষ্ঠ; কিন্তু নামে হানাফী হলেও তাঁর শিষ্যদের প্রভাবে প্রায় প্রথম থেকেই তাঁরা মধ্যপন্থী অর্থাৎ শাস্ত্রানুগত্যই তাঁদের জন্য বড়

কথা, তবে বিচার বুদ্ধির সাহায্য তাঁরা কখনো কখনো নেন। একান্ত শাস্ত্রানুগত্য পন্থীর দল মুসলমানের গৌরব-যুগে, যেমন আব্বাসীয় যুগে, তেমন প্রবল প্রতাপ হননি। কিন্তু এই আব্বাসীয় যুগেই বিচারপন্থীরা এই দলের নেতা ইমাম হাম্বলের উপরে যে কঠোর অত্যাচার করে তার ফলে বিচার পন্থীদের প্রতি মুসলমান জনসাধারণের ঘৃণা ও অবিশ্বাস প্রবল হবার সুযোগ পায়। এর পরে সর্বপ্রকারে যুক্তিবাদের অসারতা ইমাম গাজ্জালী যখন বিশেষ দক্ষতা সহকারে প্রতিপন্ন করলেন এবং শাস্ত্রানুগত্য ও অন্তর্জ্যোতিঃ-তত্ত্ব সত্যান্বেষীদের জন্য শ্রেয়ঃ জ্ঞান করলেন তখন বিচার-বাদ স্বভাবতঃই দুর্দশাগ্রস্ত হলো। ইমাম গাজ্জালীর মত খণ্ডন করে' বিচার-বাদের ধ্বজা পুনর্বার উত্তোলন করতে চেষ্টা করেন স্পেনীয় দার্শনিক ইবনে রুশদ (Averroes)। কিন্তু তিনিও যুক্তিবাদ জনসাধারণের জন্য কাম্য জ্ঞান করেননি। তাঁর মতের সমাদর হয় ইহুদিদের কাছেও তাঁদের সহায়তায় ইয়োরোপে। ইয়োরোপীয় বুদ্ধির মুক্তির ইতিহাসে (Averroes) এর আসন যে গৌরবের ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা সে-কথা স্বীকার করেন। ইসলামের বিচার-বাদ এইভাবে যে সাগর-পার হয়ে গেছে তারপর তাকে ফিরিয়ে আনবার কিছু সজাগ চেষ্টা করেছেন স্যার সৈয়দ আহমদ ও আমির আলি। তাঁদের পূর্বে রামমোহনের ভিতরে এই বিচার-বাদের প্রভাব বুঝতে পারা যায়।

আব্বাসীয় যুগের ইমাম হাম্বলের পরে একান্ত শাস্ত্রানুগত্য-বাদের বড় নেতা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের ইমাম ইবনে তায়মিয়া। "আদিম ইসলামে প্রত্যাবর্তন-বাদকে তাঁর অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে তিনি পূর্ণাঙ্গতা দান করেন। কেবল কোরআন ও বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত হজরত মোহাম্মদের বাণী মুসলমানের জন্য নির্ভরযোগ্য নয়, একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা জানানো যায়, পয়গাম্বর ইমাম সুফী এঁদের কাছে প্রার্থনা জানানো ধর্মবিরুদ্ধ— এই সব মত তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন। সুফীর অন্তর্জোতিঃ-তত্ত্ব তিনি আদৌ শ্রদ্ধা করতেন কি না বলা শক্ত, তবে কোরআন ও হজরত মোহাম্মদের বাণীর সহজ অর্থের একান্ত আনুগত্য তিনি মুসলমানদের জন্য যে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন এ সর্ববাদিসম্মত। তদানীন্তন সমাজের সুফী প্রাধান্যের জন্য তাঁকে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল; কিন্তু জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা তিনি লাভ করেন। তাঁর অষ্টাদশ শতাব্দীর শিষ্য আবদুল ওয়াহ্হাব ও তাঁর অনুবর্তিগণ এই মতবাদের প্রচারে সফলকাম হন, আবদুল ওয়াহ্হাব নাম অনুসারে এই চিন্তাধারার সাধারণ নাম হয়েছে ওয়াহহাবী মত। সত্য বটে পীর পূজা প্রভৃতি ওহাবী নিন্দিত কর্ম ও মত এখনো মুসলমান সমাজে লোপ পায়নি, কিন্তু এসব শাস্ত্রবিরুদ্ধ অতএব প্রশস্ত নয়, এই বাণী মুসলমান জনসাধারণের কর্ণেও প্রবেশ করেছে।

এই ওহাবী মত বা "আদিম ইসলামে প্রত্যাবর্তন"—বাদ বর্তমান মুসলিম জগতে, বিশেষ করে' ভারতের মুসলমানদের মধ্যে, প্রবলতম মত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এদেশে এই মতের প্রাদুর্ভাব ঘটে। পাঞ্জাবে মুসলমানদের উপরে শিখেরা অত্যাচার করে; ওহাবীরা সেখানে জেহাদ ঘোষণা করে। এই সংঘর্ষ ক্রমে ইংরেজও— ওহাবীতে বর্তে। ওহাবীদের দমন করতে ইংরেজ গভর্ণমেন্টকে বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু ওহাবী মত তখন যা ছিল এখন তার কিছু কিছু বদল হয়েছে। ভারতবর্ষ অমুসলমান রাজ্য, মুসলমান ধর্মকর্ম এখানে বাধাগ্রস্ত, এই বিবেচনায় ওহাবীরা একে "দরুল হরব' বলে ঘোষণা করে' 'দারুল হরব' এ শাসনকর্তার বিরুদ্ধে প্রয়োজন মত জেহাদ ঘোষণা করা ধর্মকর্ম।[৩১] কিন্তু এখন ভারতবর্ষকে সাধারণত "দারুল হরব" বলে গণনা করা হয় না "দারুল ইসলাম" বলা হয়, কেননা এখানে মুসলমানদের ধর্মকর্ম বাধাগ্রস্ত নয়। কাজেই ওহাবী মত এখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধং দেহি ভাব পরিত্যাগ করে' (এর মতে) ভারতের তথাকথিত মুসলমানদের মুসলমানীকরণে মন দিয়েছে। তাই বাংলার সাধু-সংকল্প হিন্দু যখন দুঃখিত হয়ে বলেন মুসলমানদের চাষীরা তো আগে আমাদের পূজা আর্চায় বেশ যোগ দিত, আমাদের বাড়িতে খেতেও তাদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু দিন দিন সব কেমন হয়ে যাচ্ছে— তখন তাঁর প্রতিবেশীদের ঘরের খবর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার পরিচয় তিনি দেন।

এই ওহাবী মত ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এমন প্রভাব বিস্তার করলে কেন সে-কথাটি বুঝে দেখার মতো। কিন্তু বিশাল ভারতের চাইতে এই সমস্যাটি মুখ্যত বাংলাদেশে সংকীর্ণ করে' দেখাই নানা কারণে সঙ্গত মনে করি। এই সম্পর্কে বাংলার মুসলমানদের উৎপত্তি-কথার কিঞ্চিত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে আদম শুমারীর রিপোর্টে মিঃ বেভেরলি (Mr. H. Beverley) বলেন, বাংলার অধিকাংশ মুসলমান বাংলার হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীর থেকে উদ্ভূত— ইসলামের তলোয়ারের জোরে তারা মুসলমান হয়। রিজলি সাহেব তাঁর Tribes and Castes of Bengal গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সহকারে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে বাংলার মুসলমান, বিশেষ করে' মুসলমান চাষী, বাংলার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর বংশধর।[৩২] এই মতের প্রতিবাদ করেন মুর্শিদাবাদের দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রাব্বি। তাঁর The Origin of the Mussalmans of Bengal গ্রন্থে (এটি তাঁর পার্শীতে লেখা "হকিকত-ই-মুসলমান-ই-বাঙ্গালা'র ইংরেজি অনুবাদ) তিনি এইভাবে এ মত খণ্ডন করতে চেষ্টা করেন :

---

৩১. Imperial Gazetter, Vol-VII, P. 437 দ্রষ্টব্য।

(১) তলোয়ারের জোরে এদেশে ইসলাম প্রচার হয়ে থাকলে উত্তর ভারতে মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেড়ে যেত। সেখানে মুসলমানের তলোয়ারের জোর বাংলার চাইতে কম ছিল না।

(২) বাংলার মুসলমান বাংলার উচ্চ বা নিচ কোনো স্তরের হিন্দুর বংশধর যে মুখ্যত নয় তার ঐতিহাসিক প্রমাণ এই :

(ক) "তারিখ-ই-ফেরেশতা", আবদুল কাদির বদাউনির "মনতাখাবাত্তাওয়ারিখ" প্রভৃতি ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে বাংলায় মুসলমানের আগমন থেকে আরম্ভ করে নবাব সুজা খাঁর রাজত্ব কাল পর্যন্ত বাংলার মুসলমান শাসকরা এদেশে মুসলমানদের বসবাসের সুবিধার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা অনেক মুসলমান পরিবারকে জায়গীর প্রভৃতি দান করে বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। বহু মুসলমান সৈন্যও এদেশে আগমন করেন।

(খ) দিল্লী রাষ্ট্রবিপ্লবের কেন্দ্রস্থল ছিল বলে অনেক মুসলমান সুদূর বাংলায় বসতি স্থাপন নিরাপদ মনে করতেন।

(গ) সম্রাট আকবর অনেক স্বধর্মনিষ্ঠ মুসলমানকে বাংলায় নির্বাসিত করেন।

(ঘ) সমুদ্র-পথে অনেক বিদেশী মুসলমান বাংলায় আগমন করে এবং বসতি স্থাপন করে।

(ঙ) বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানের ভিতরে ভাষাগত পার্থক্য আছে। দুজনেই বাংলা বলে কিন্তু ঠিক এক বাংলা নয়। মুসলমানের বাংলায় আরবী ফারসী শব্দের সংখ্যা অনেক বেশি।

(চ) রিজলি সাহেবের পদ্ধতি নির্ভুল নয়। কেননা, তিনি সব শ্রেণীর মুসলমানের নাকের মাপ নিয়ে গড় কষেননি, বেছে বেছে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের নাকের মাপ নিয়েছেন।

দেওয়ান সাহেবের গবেষণায় অন্তত এই কথাটি প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলায় বাংলার বাইরের মুসলমান কম আসেন নি, অবশ্য দেশের সমগ্র লোকসংখ্যার কত ভাগ তা বলা শক্ত। কিন্তু তাঁর সমস্ত যুক্তির বিরুদ্ধে এই বড় যুক্তিটি দাঁড় করানো যেতে পারে, যুক্তিটি মুসলিম-ইতিহাস-বেত্তা ঢাকার হাকিম হবিবুর রহমানের। বিজেতারা সাধারণ বিজিত দেশ থেকেই স্ত্রী গ্রহণ করে থাকেন, ভারতবিজয়ী মুসলমানদের বেলায়ও এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি, হিন্দুস্থানী সৈয়দ, হিন্দুস্থানী শেখ, হিন্দুস্থানী মোগল ও হিন্দুস্থানী পাঠানের উদ্ভব এইভাবে— এই তাঁর মত। এ মত যে গ্রহণযোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। তাহলে দেওয়ানী সাহেব যে বাংলার মুসলমানকে হিন্দু রক্তের সংস্রবশূন্য মনে করেছেন তা আর টেকে না। এদেশের প্রাচীন মুসলমানদের স্ত্রী-গ্রহণ সম্পর্কে একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার ইবনে বতুতার ভ্রমণ-কাহিনীতে আছে। মুসলমান রাজত্বের প্রায় সূচনায় তিনি এদেশে আসেন। তিনি লিখেছেন এদেশে স্ত্রীরূপে গ্রহণযোগ্য দাসী অল্প মূল্যে পাওয়া যেত, তাঁর সামনে একটি সুন্দরী যুবতী বিক্রীত হয়েছিল এক স্বর্ণ দিনারে অর্থাৎ দশ টাকায়। তিনিও প্রায় এই মূল্যে একটি অতি সুন্দরী দাসী কিনেছিলেন। অবশ্য এই সব

দাসী কোন জাতীয় ছিল তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে শুধু মুসলমানদের কণ্যাই যে এইভাবে বিক্রীত হতো তা মনে করবার হেতু নেই।

দেওয়ান সাহেব রিজলী সাহেবের মত যেভাবে খণ্ডন করতে চেয়েছেন তাও আপত্তিকর। বাংলার চাষী সম্প্রদায়ের অনেকে হিন্দুর সন্তান এই তাঁর প্রতিপাদ্য। সেক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের তিনি যদি তাঁর গবেষণার বিষয় বলে গণ্য না করে থাকেন তবে তাঁর সেই কাজটাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দিক দিয়ে অসঙ্গত হয় না। অবশ্য আজকাল নাকের গঠন দিয়ে জাতি নির্ণীত হয় কি না তা নৃতত্ত্ববিদরাই ভাল জানেন।

দেওয়ান সাহেবের প্রতিপাদ্যের বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি হান্টার সাহেবের গেজেটিয়ারে আছে। তিনি বলেছেন, কিছুদিন পূর্বেও বাংলার অনেক মুসলমান দুর্গা-কালী-লক্ষ্মী প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর পূজা করতো।

কিন্তু হান্টার সাহেবের এই যুক্তির বিরুদ্ধেও যুক্তি আছে বাংলার কোনো কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমানও দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবীর পূজা করতেন একথা সুপ্রসিদ্ধ। এর বড় কারণ বোধ হয় এই যে ওহাবী প্রভাবের পূর্বে মুসলমানদের মানসিক অবস্থা প্রতীক চর্চার একান্ত বিরোধী ছিল না। পীরের কবরে বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন, দিনক্ষণ পুরোপুরি মেনে চলা, সমাজে এক শ্রেণীর জাতিভেদ স্বীকার করা, এসব ব্যাপারে মুসলমানের মনোভাব প্রায় হিন্দুর মতোই ছিল। তাছাড়া মুসলমান লিখিত কাব্যে প্রতিমা পূজারির ভক্তি নিবেদনের সৌন্দর্য অনেকদিন থেকে বর্ণিত হয়ে আসছিল; কাব্য-কল্পনায় আর বাস্তব জীবনে ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলার চেষ্টা অনেক সময় মানুষের সমাজে হয়।

বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের ভাষাগত যে পার্থক্যের কথা দেওয়ান সাহেব এবং একালের কোনো কোনো পদস্থ মুসলমান বলেছেন সে সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে পূর্বে হিন্দুর ব্যবহৃত বাংলা ভাষায়ও আরবী ফারসী শব্দের সংখ্যা এখনকার চাইতে অনেক বেশি ছিল, টেকচাঁদের সাহিত্য তার এক প্রমাণ। একালে সাহিত্য যেভাবে গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে মুসলমানের চাইতে হিন্দুর যোগ অনেক বেশি বলে হিন্দুর মুখের ভাষায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

দেওয়ান সাহেব তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি খণ্ডন করতে ভুলে গেছেন। অথবা ইচ্ছা করেই সেটি তোলেন নি। সেটি এই যে অনেক মুসলমান ফকিরের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে এদেশের অনেক লোক মুসলমান হয়েছিল। শ্রীহট্টের শাহজালালের প্রভাবে সেই অঞ্চলের বহু অধিবাসী যে মুসলমান হয়েছিল ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তে তার উল্লেখ আছে।

বাংলাদেশের নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের বেশভূষা যে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের সঙ্গে তুলনায় স্বতন্ত্র রকমের ছিল এখনও যেমন আছে— সে কথা সিয়ারুল

মোতা' আখেরীন এর অনুবাদক প্রায় দেড়শত বছর পূর্বে উল্লেখ করে গেছেন। তিনি তাদের নামে মাত্র মুসলমান বলেছেন কেননা তারা মুসলমানী রীতিনীতি আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাদের মাথায় যে টুপি নেই এটি মুসলমানের পক্ষে তিনি খুব অদ্ভুত বিবেচনা করেছেন।

দেখা যাচ্ছে দেওয়ান সাহেবের মতের বিপক্ষেই যুক্তি প্রবল। বাংলার অধিকাংশ মুসলমান বাংলার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর সন্তান, কি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর সন্তান, সে-তর্ক অবশ্য অর্থহীন। ছোট বড় হয়, বড় ছোট হয়। কোনো একশ্রেণীর লোককে সম্ভাবনার দিক দিয়ে বড় ভাবা কুসংস্কার। তাছাড়া বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই বাংলার বিশাল বৌদ্ধ-সমাজ থেকে উদ্ভুত হবার সম্ভাবনা বেশি।[৩২]

কিন্তু দেওয়ান সাহেব প্রমুখ মুসলিম স্বাতন্ত্র-বাদীদের যুক্তি অপ্রবল হলেও একথাটি মানতেই হবে যে হিন্দু ও মুসলমান চাষীদের ভিতরে চরিত্রগত পার্থক্য বিদ্যমান। হিন্দু চাষী-শ্রেণীর লোকদের চাইতে মুসলমান চাষী কম শান্ত ও কষ্টসাধ্য কাজে মাথা দিতে বেশি অগ্রসর। এর কারণ কি? হিন্দু ও মুসলমানের এ রকম পার্থক্য শত বৎসর পূর্বে রামমোহনও লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এর কারণ মাংসাহার। কিন্তু পল্লীর মুসলমান মাংস অতি অল্পই খায়। হিন্দু-মুসলমানের একালের মারামারির পর থেকে কিন্তু বাস্তবিকই তা নগণ্য। খাদ্যের দিক দিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের ভিতরে এতদিন বড় পার্থক্য ছিল পেঁয়াজ আর রসুনের ব্যবহারে। কিন্তু এদুটি যদি এমন মহাশক্তি হবে তবে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা দিন দিন হীনবীর্য হয়ে পড়ছেন কেন?

চিন্তা ও বিশ্বাস-আদির পার্থক্য এই চরিত্রগত পার্থক্যের প্রধান কারণ বলে মনে হয়। এমতের সমর্থন পাওয়া যায় বাংলার হিন্দু সমাজের উচ্চ ও নিম্ন স্তরের লোকদের চরিত্রগত পার্থক্যের কথা ভাবলে। বাস্তবিকই চরিত্রগত পার্থক্য একালের বাংলার হিন্দু সমাজের এই দুই অংশের ভিতরে প্রকট হয়েছে। বহুদোষ সত্ত্বেও সে-সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের বলা যায় সাহসী ও চলন্ত-মন-বিশিষ্ট, বহুগুণ সত্ত্বেও তার নিম্ন স্তরের লোকদের বলা যায় সাহসী ও চলন্ত মন বিশিষ্ট বহুগুণ সত্ত্বেও তার নিম্নস্তরের লোকদের এই সব বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। হিন্দু সমাজের নানা আচার ও সংস্কারের চাপ থেকে সে-সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা কিছু অব্যাহতি পেয়েছে জ্ঞানকৃত চেষ্টায়, আর বাংলার মুসলমান সমাজের নিম্ন অংশের লোকেরা জীবনে কিছু সহজ সরল হতে পেরেছে উচ্চস্তরের

---

৩২. দ্রঃ 'বাংলার মুসলমানের কথা'

লোকদের অবহেলার ফলে। বাংলার মুসলমান সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা বাংলার হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের মতো কেন দিন দিন মুখ্যত আচার-ধর্মী হয়ে হয়ে পড়ছে তার উত্তর পাওয়া যাবে এই বিবরণের বহুস্থানে।

বাংলার এই মুসলমান-সমাজ, বিশেষ করে এর সুবিশাল নিম্ন অংশ, যে অসার্থক জীবন যাপন করতো না তার পরিচয় রয়েছে সেকালের লোক-সাহিত্যে। ওহাবী প্রভাবের পূর্বে মুসলমান সমাজের উপরে প্রবল ছিল সুফী প্রভাব। মোটের উপর সেটি উদার মানবতার প্রভাব, কিন্তু আচার পরায়ণতা অলৌকিকতাপ্রীতি এসবও ছিল তার সঙ্গে যুক্ত।

এই সমাজ মানস শক্তির দিক দিয়ে তেমন সবল না হলেও ওহাবী- প্রভাবকে বাধা দিতে যে চেষ্টা না করেছে তা নয়। লালন ফকির প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান বাউলদের গানে রয়েছে সেই প্রতিবাদের ঝঙ্কার। সে-চেষ্টা সফল হয়নি কেন সে সম্বন্ধে এই কটি কথার উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

(১) অলৌকিকতার উপরে সুফী ও ওহাবী দুই মতেরই শ্রদ্ধা। কাজেই ওহাবীরা যখন পরম অলৌকিক কোরআন ও হজরত মোহাম্মদের পয়গাম্বরত্বের দোহাই দিলেন মুসলমান হিসাবে তখন অপর পক্ষের প্রায় কোনো উত্তরই রইল না।

(২) অনুবর্তিতা দুইয়েরই ধর্ম। সে-ক্ষেত্রে পীরের অনুবর্তিতার চাইতে পয়গাম্বরের অনুবর্তিতার মহিমা বেশি মনে হওয়া স্বাভাবিক।

(৩) এই মুসলমান-সমাজে কদাচার যথেষ্ট ছিল। প্রাচীন ইসলামের উন্নততর আচারের সামনে সেসব নতশির না হয়ে পারেনি।

কিন্তু দীর্ঘকালের জীবনধারার প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক মমতা তাকে এই সব যুক্তি জয় করতে পারতো না যদি রাজনৈতিক কারণ এর সহায় রূপে এসে না দাঁড়াত। বস্তুত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ওহাবী আন্দোলনকে এক রাজনৈতিক আন্দোলন বলেও গণ্য করা যেতে পারে— ধ্বংসশীল মুসলিম জগতের গা ঝাড়া দেবারও এক চেষ্টা। ভারতে অথবা বাংলায় রাজনৈতিক কারণ যে এর প্রভাবের মূলে তা বোঝা যায় ব্রিটিশ শাসন-কালে মুসলমানদের অবস্থার ইতিহাসের কথা ভাবলে। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই :

হিন্দু সমাজের পদস্থ ব্যক্তিদের আনুকূল্যে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তনে মুসলমানেরা যে খুব বিচলিত হয় নি তা বোঝা যায় এই দুটি ব্যাপার থেকে—

১. ইংরেজের অধিকৃত বাংলায় প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলিকাতা মাদ্রাসা ইংরেজের আনুকূল্যে মুসলমানদের লাভ হয়;

২. ইংরেজ শাসনের সূচনায় হিন্দু প্রধানত রাজস্ববিভাগ ও মুসলমান প্রধানত বিচার-বিভাগে নিযুক্ত থেকে জীবিকা অর্জন করতে থাকে। সেদিনে বাংলার মুসলমান যে বাংলাদেশে উন্নততর সম্প্রদায় ছিল রামমোহন রায় তাঁর বিলাতে সাক্ষ্যদানকালে ও

হান্টার সাহেব তাঁর Indian Mussalmans গ্রন্থে সে কথা বলেছেন— "When the country passed under our Rule the Muslims were the superior race."

মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হলো দশসালা বন্দোবস্ত থেকে, আর তাদের সম্ভ্রান্তদের আর্থিক দুর্গতি চরমে পৌছলো সনদ দেখাতে না পেরে যখন তাঁদের বহু নিষ্কর জমিজমা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল— ইংরেজিতে এর নাম Resumption Proceedings আর যখন আদালতের ভাষা পার্শীর পরিবর্তে ইংরেজি হলো। দশসালা বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার কেমন পরিবর্তন হলো সে সম্বন্ধে হান্টার সাহেবের উক্তির সারাংশ এই :

Muslim landlords or collectors of revenue did not directly deal with the Muslim peasants, and they employed Hindu bailiffs to collect the revenue direct from the peasantry. So the Hindus in fact formed a Subordinate Revenue Service, and took their share of the profits before passing the collection on to the muslim Superiors. The latter however were responsible to the Emperor and formed a very essential link in the Muslim fiscal system. The series of changes introduced by Lord eornwallis and Sir John Shore ending in the Permanent Settlement in 1793 put an end to this fiscal system of the Muslims.

The Permanent Settlement most seriously damaged the position of Mahomedan houses, for the whole tendency of the settlement was to acknowledge as the landlords the subordinate Hindu Officers who dealt directly with the husbandmen.

It elevated Hindu collectors, who up to that time had held but unimportant posts to the position of the landlords, gave them a proprietory right in the soil and allowed them to accumula e wealth which would have gone to the Muslims under their own Rule.[৩৩]

---

৩৩. ১০৪-৫ পৃষ্ঠায় হান্টার সাহেবের মূল বক্তব্য দ্রষ্টব্য।

এসব ব্যবস্থা যে মুসলমানদের শক্তিহীন করবার জন্যই করা হয়েছিল তা মনে হয় না, রাজস্ব যাতে বেশি পাওয়া যায় ও নিশ্চিতরূপে পাওয়া যায় এইই ছিল শাসকদের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এর ফল মুসলমানদের জন্য শোচনীয় হলো। এই সময়ে ভারতে আসে ওহাবী আন্দোলন। বাংলার ওহাবী আন্দোলন যে মুখ্যত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তা বোঝা যায় বাংলার ওহাবীনেতা তিতুমিঞার বিদ্রোহ থেকেও ঃ-

Titu belonged to the Wahhabi Sect of Muhammadan fanatics, and was excited to rebellion in 1831 by a beard-tax imposed by Hindu landholders. He collected a force of insurgents 3000 strong, and cut to pieces a detachment of Calcutta militia which was sent against him. The magistrate collected reinforcements but they were driven off the field. Eventually the insurgents were defeated by a force of regulars and their stockade was taken by assault. (Imp. Gazt. Vol. XXIV–p. 71.)

ওহাবীরা ইংরেজের হাতে যখন অনেকখানি নিস্তেজ হলো তখন ইংরেজ ও মুসলমান সম্পর্ক দাঁড়াল এই— ইংরেজ সহজেই সকল মুসলমানকে শত্রুপক্ষ ভাবলো এবং তাদের সঙ্গে ব্যবহারের সদয়তা তার পক্ষে সম্ভবপর হলো না; মুসলমানদের সবাই যে ওহাবী মতাবলম্বী হলো তা নয় কিন্তু ইংরেজের প্রতি বিরূপতা তাদের ভিতরে ব্যাপক হলো। পার্শীর পরিবর্তে ইংরেজিকে রাজভাষা করা হলে মুসলমানরা প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু প্রতিবাদের ফল না পেয়ে তারা ইংরেজি শিখতে এগোলো না। হান্টার সাহেব বলেছেন— ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক-বিবর্জিত শিক্ষা মুসলমানেরা পছন্দ করতে পারলো না। কিন্তু মুসলমানদের খুব বড় অন্যায় এই হলো যে নতুন ব্যবস্থা সম্বন্ধে না-ই তারা বললে, ভাল করে বাঁচতে হলে কোন কোন ব্যাপারে হাঁ-ও বলতে হবে সে চেতনা তাদের ভিতরে দেখা দিল না। অচিরেই তাদের অবস্থা এমন হীন হয়ে পড়লো যে সিপাহী বিদ্রোহের পরে স্যার সৈয়দ আহমদ প্রধান কর্তব্য জ্ঞান করলেন শাসকদের বিষ-দৃষ্টির পরিবর্তে প্রসন্ন দৃষ্টি মুসলমানদের জন্য লাভ করা।

মুসলমানদের দুর্গতির সঙ্গে চললো হিন্দুদের উন্নতি-চেষ্টা ও তাদের প্রতি শাসকদের আনুকূল্য। তাই ওহাবীরা যখন শান্ত হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মুসলমানের ধর্ম ও সমাজের সংস্কারকরূপে এলেন তখন মুখে তাঁদের অনুবর্তিতা তেমন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত না হলেও ধীরে ধীরে এদেশের দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের

মনে এ ধারণা দৃঢ়মূল হওয়া বিচিত্র নয় যে ধর্মের আদিম ব্যবস্থার দিকে ফিরে যাওয়া ভিন্ন ইহকাল ও পরকালের জন্য তাদের আর কি করবার থাকতে পারে। হিন্দু-সমাজের সূচিত জাগরণ এ প্রতিক্রিয়া রোধ করতে সমর্থ হলো না কেন দ্বিতীয় বক্তৃতায় তার উত্তর দিতে চেষ্টা করা হবে।

আমরা দেখলাম ওহাবী প্রভাবে এদেশের মুসলমানদের একটি বিশেষ চেতনা লাভ হলো। এ আন্দোলনে তাদের কোনো উপকার যে না হয়েছে তা নয়— এর ফলে ভাববিলাসিতা থেকে কিছু উদ্ধার তারা পেয়েছে, কিছু সঙ্ঘবদ্ধও তারা হয়েছে। কিন্তু আদর্শ হিসাবে এর দুর্বলতা এইখানে যে এ অতীতের ব্যবস্থার দিকে যাওয়াই সব চাইতে বড় কাজ মনে করে— সেই ব্যবস্থাই এর কাছে চিরন্তন ধর্ম। বলা বাহুল্য এ মত সর্বপ্রকার চিন্তার সম্প্রসারণের বিরোধী; সমস্ত রকমের নতুন পরীক্ষা সন্দেহের চোখে দেখা এর প্রকৃতি। এ মত যে উন্নতিকামী জাতীয়তাবাদী আধুনিক মুসলিম জগতে বর্জিত হচ্ছে তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু ভারতের মুসলমান একে বর্জন করতে পারছে না— তার নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে চেতনা তার এ-মতের বর্জনের পথে বাধা হচ্ছে।

এই দশা থেকে এদেশের মুসলমান কি মুক্তি পাবে? না, নানা দিক থেকে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে এইখানেই তার দৃঢ়স্থিতি হবে! এর সদুত্তর নির্ভর করছে অনেকগুলো ব্যাপারের উপরে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বক্তৃতায় সে-সবের আলোচনার চেষ্টা হবে।

২৬ মার্চ, ১৯৩৫

ব্যর্থতার প্রতিকার

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ আমাদের সামনে যে-রূপ নিয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাকে অবিশ্বাস করেন। তাঁরা বলেন—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বহুরকমের পার্থক্য আছে, তার জন্য তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য কম, এসব কথা মানা যায়, কিন্তু তাদের যে উৎকট বিরোধ আজ দেশে জেগেছে তার যথেষ্ট কারণ এই ধরনের মনোমালিন্যই নয়, তাদের বিরোধের যা কারণ রাজনীতির ক্ষেত্রে তা সনাতন, তার ইংরেজি নাম Divide and Rule এর উত্তর বহুবৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন এ ভাবে সমস্যাটাকে দেখলে এর কোনো মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যাবে না, কেননা আমরা, অর্থাৎ দেশের হিন্দু ও মুসলমান, বড় দুর্বল আর যাঁরা Divide and Rule করেছেন তাঁরা অত্যন্ত সবল, বিচ্ছিন্ন কোনো দিন মিলিতের সঙ্গে বিরোধে জয় লাভ করতে পারে না।

কিন্তু সম্প্রতি তাঁরও মতের পরিবর্তন হয়েছে মনে হয়। অন্তত তাঁর "রাশিয়ার পত্রে" এই কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে ভারতের সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য মুখ্যত দায়ী ভারতের শাসকবর্গ। রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়ায় তখন ঢাকায় দাঙ্গা হয়। পরজাতির সামনে তাঁর স্বদেশবাসীদের সেই মূঢ়তা ও বর্বরতা তাঁর যে গভীর লজ্জার কারণ হয়েছিল, মনে হয়, তারই জন্য এমন একটি ক্ষোভের সৃষ্টি তাঁর মধ্যে হয়েছিল।

যাঁরা বলেন সরকারী Divide and Rule নীতি দেশের সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য দায়ী তাঁদের মোট বক্তব্য এই— ভারতে এখন হিন্দু কিছু প্রবল হয়েছে, তাকে দমিয়ে দেওয়া রাজনীতির দিক দিয়ে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই নীতি যদি বাস্তবিকই দেশের পরিচ্ছন্ন শাসন নীতি হতো তাহলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ এক পক্ষেরই বেশি জয়ী হওয়া স্বাভাবিক হতো। তা অবশ্য হয়নি। খবরের কাগজের কথা যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে বলতে হয়, এই সব বিরোধে কোনো কোনো স্থানে মুসলমান বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এমন ধরনের দাঙ্গা অনেক সময় হয়ে ওঠে হাটের মারামারির মতো; হাটে মারামারি লাগলে কে যে কার শত্রু অনেক সময়ে সেই জ্ঞানই পায় লোপ, কেবল চলে অন্ধ আঘাত আর প্রতিঘাত; কেউ নিরপেক্ষও থাকতে পারে না; সেইভাবে কোনো কোনো সরকারী কর্মচারীও কখনো কোনো পক্ষে ভিড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। আর নারদমনোবৃত্তিসম্পন্ন কর্মচারীও একান্ত দুর্বল না হতে পারেন। রাজশক্তির তরফ থেকে দেশের অনুন্নত শ্রেণীর

লোকদের অকৃত্রিম উন্নতিচেষ্টা দেশের উন্নত অসম্প্রদায়ের লোকদের মনোদুঃখের কারণ হলেও প্রকৃত রাজনীতি—ভেদনীতি নয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধে স্পষ্ট ভেদ-নীতির দোষ শাসকদের না থাকলেও অন্য রকমের দোষ থেকে তাঁরা মুক্ত নন। সেটি হচ্ছে এদেশের সমাজ ও ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপে তাঁদের ভীতি। সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি হয়ত তাঁরা মন থেকে মুছে ফেলবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ভারতবাসীর মনোভাবে যতটা অন্ধতা ছিল তার প্রভাব তাদের উপরে যে কম হয়েছে এ কথা স্বীকার করাও তাঁরা হয়ত সুবিবেচনা মনে করেন না। কিন্তু অন্ধতার প্রতিকার অন্ধতার দ্বারা হয় না। এদেশ যদি আচার-প্রধান হয়, অর্থাৎ বিচার এদেশের লোকদের কাছে সমাদৃত না হয়, তবে দেশের শাসন কার্যের লক্ষ্য হবে সেই সব বিচিত্র আচারকে শুধু বিবদমান হতে না দেওয়া এ নীতিতে বুদ্ধির পরিচয় থাকলেও দৃষ্টি ও শক্তির পরিচয় নেই। সেই জন্য এ নীতি শান্তির প্রার্থী হলেও পায় অশান্তিই; কেননা, বিবাদের অবসানরূপে যে শান্তি জীবনে তা লাভ করা সম্ভবপর নয়। জীবনে শুধু লাভ করা যায় সৃষ্টিধর্মের যে শান্তি অর্থাৎ দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পরের প্রতি বর্ধমান শ্রদ্ধা, তাই।

কাজেই যারা ভেদনীতিকে দেশের সমস্ত ব্যাধির মূল কারণ বলে' বুঝেছেন তাঁদের মত বদলাবার ক্ষমতা আমাদের না থাকলেও তাঁদের মতের বিরুদ্ধে যে যুক্তি আছে সে কথা বলবার অবসর আমাদের আছে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের যত কারণই থাকুক তাদের নিজেদের বহুকালের বিকৃত বুদ্ধি যে তার মূলে এ কথাটা সূত্রস্বরূপ ধরে নেওয়া সঙ্গত বৈ অসঙ্গত নয়, কেননা শুধু ইতিহাস নয় বিচার ও আত্মবিশ্বাস এর অনুকূলে। পল্লীর খড়ের ঘরে যে আগুন লাগে তার আশু-কারণ হয়ত আগুন ও গৃহস্থের অসাবধানতা, কিন্তু যিনি এর প্রতিকারে অগ্রসর হবেন তাঁর কাজ হবে সহজদাহ্য এই গৃহগুলির সংস্কার। আর এ সংস্কারে গৃহস্থের আগ্রহাতিশয্যই স্বাভাবিক।

হিন্দু ও মুসলমানের বিকৃত বুদ্ধিই যে তাদের বিরোধের মূলে এ চিন্তা আমাদের দেশের গত কয়েক শতাব্দীর শ্রেষ্ঠদেরও। তাঁরা এর নিরাকরণের চেষ্টাও কম করেন নি। তাঁদের সেই সব চেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।

হিন্দু ও মুসলমানের সংঘর্ষ এদেশে যখন হয়েছে তাদের মিলনের চেষ্টাও প্রায় তখন থেকে হয়ে আসছে। পাঠান-যুগের অনেক সাধু-সন্তের বাণীতে তার পরিচয় রয়েছে। কিন্তু এ-চেষ্টা বেশ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে কবীর ও আকবরের মধ্যেই। আকবরের হিন্দু মুসলমানের মিলনের চেষ্টার মূল্য তেমন দেওয়া হয়নি। তাতে অন্যায় তেমন হয়েছে মনে হয় না, কেননা আকবর অপূর্ব প্রতিভার অধিকারী হলেও তাঁর হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় চেষ্টায় খেয়ালিত্ব রয়েছে ঢের। তিনি যে

বিভিন্ন ধর্মের কিছু কিছু আচার গ্রহণ করেছিলেন সে-সমন্বয় তাঁর নিজেরই জন্য, সেটি সকলের হোক এ কামনা তিনি করেছিলেন ভাবা কঠিন। আকবরের ভিতরে কবি-প্রকৃতি ছিল, বিভিন্ন রূপের পূজায় মুখ্যত ব্যক্তিগত ব্যাপার বলেই মনে হয়। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সম্পর্কে তাঁর বড় কীর্তি হচ্ছে অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার— মধ্য যুগের শ্রেষ্ঠদের বা সর্বযুগের প্রেমিকদের যা সাধারণ ধর্ম।

মধ্যযুগের সমন্বয়কারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান বোধ হয় কবীরের ও তাঁর পরে দাদু ও রজ্জবজীর। এক হিসাবে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের শ্রেষ্ঠ সমন্বয় এঁদের চিন্তায়ই রয়েছে। মানুষকে এঁরা সব স্থূল আবরণ উন্মোচিত করে' দেখেছেন, আর সেই দেখাই যে সত্যকে দেখা সে-কথা পরম মনোহর ভাষায় প্রকাশ করে' গেছেন। তাই তাঁদের চিন্তা সমসাময়িকরূপে যা পেয়েছিলেন তাইই সে সবের চরম রূপ নয়। সব বিক্ষোভের ভিতরে সত্যকে শান্ত হয়ে দেখবার সঙ্কেত এসবে আশ্চর্যভাবে সঞ্চিত আছে।

কিন্তু এঁদের চেষ্টায় যে আশানুরূপ ফল ফলেনি তার কারণ শুধু জনসাধারণের অক্ষমতাই নয়। এই ব্যর্থতার কারণ এঁদের বাণীর ভিতরেই নিহিত আছে মনে হয়। হিন্দু ও মুসলমানের যে বিরোধ দেশে জাগলো তা শুধু চিন্তাধারার বিরোধ নয়, সেই বিরোধের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক রূপও প্রবল। কিন্তু সে সবের মীমাংসায় এই জ্ঞানীদের দৃষ্টি তেমনভাবে আকৃষ্ট হয়নি। কবীর বললেন— বেদ ও কোরআন ভব-বন্ধন স্বরূপ, ও সবের ভিতরে তুমি কেবল ঘুরপাক খেয়ে মরবে। তাঁর এ কথায় হিন্দু ও মুসলমানের আচার—পূজা যোগ্যভাবেই তিরস্কৃত হলো। কিন্তু বৃহত্তর সমাজ জীবনে আচার অর্থাৎ নিয়ম-কানুন বিসর্জন সম্ভবপর নয়, তাই বেদ ও কোরআনের প্রবর্তিত আচার যদি গ্রহণ না করা হয় তবে অন্য কি আচার গ্রহণ করতে হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ আবশ্যক। বলা বাহুল্য, মানুষের বৃহত্তর সমাজ জীবনের প্রয়োজন এই জ্ঞানীদের বাণীতে মেটেনি বলে এদের বাণীর বিদ্যুচ্ছটায় মানুষের অন্তর আলোকিত হয়েছে কিন্তু বিদ্যুতের মতোই ক্ষণকালের জন্য। সে-উপলব্ধিকে সমাজ জীবন সার্থক করা যাবে কি উপায়ে সে-সম্বন্ধে তেমন কোনো নির্দেশ না পাওয়ার ফলে প্রাচীন চিরাচরিত পন্থাই তাদের জন্য পন্থা রয়ে গেছে।

উচ্চচিন্তার এই যে সামাজিক রূপ গ্রহণে কুণ্ঠা, মনে হয় এ ভারতীয় চিন্তার মজ্জাগত দুর্বলতা। একে যদি কেউ ভারতীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য বলতে চান তিনি তা বলতে পারেন। এর স্বপক্ষেও কিছু বলা যে না যায় তা নয়। কিন্তু এ দুর্বলতাই কেননা, শুধু সুবিবেচনা নয় ভয়ও এর সঙ্গে সমাবেশ ঘটেছিল তার ফলে আচার প্রাধান্যের সাহায্যে দেশে শৃঙ্খলা বিধানের চেষ্টা হওয়া বিচিত্র নয়। সেই থেকে আচার ধর্ম এদেশে যে বড় ধর্ম হয়ে আছে তা বার বার কিছু কিছু আঘাত পেলেও মোটের উপর

বিশেষ প্রতিপত্তিই সম্ভোগ করে আসছে। মধ্যযুগের জ্ঞানীরাও এদেশের সমাজ জীবনে হস্তক্ষেপ করতে সঙ্কুচিত হয়েছেন এ কথা বলা যায়। এই আচার প্রাধান্যের জন্যই দেশের উচ্চচিন্তা যে মানসলোক থেকে কর্ম-লোকে পদার্পণ করতে এমন সঙ্কোচ বোধ করছে সেজন্য অদ্ভুতত্ত্বের সঙ্গে এসবের সংস্রব দুর্লভ হয়নি। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—একদিন মহাপ্রভু চিন্তিত হলেন এই কথা ভেবে যে যবনজাতি "গোব্রাহ্মণ" হিংসা করে মহাদুরাচার, তাদের উদ্ধারের কোনো উপায় দেখা যায় না; তখন হরিদাস বলেন তাদেরও মুক্তি অনায়াসে হবে, কেননা হারাম হারাম বলে তারা প্রকারান্তরে রাম নাম উচ্চারণ করবে— নৃহিংস পুরাণে আছে "দ্রংষ্ট্রীদ্রংষ্ট্রাহতে ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ উক্তাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন", (অন্তলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। এ প্রসঙ্গ বাস্তবিকই চৈতন্যদেবের সঙ্গে হয়েছিল, না নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এটি ভক্তদের অতি রঞ্জিত, তা শক্ত; তবে "চৈতন্যচরিতামৃতে"র মতো একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে এ কথা যে স্থান পেয়েছে এই থেকে অনেকটা বোঝা যাচ্ছে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠদের চিন্তা-ভাবনার ধারা। সত্যকে নানা রকমে বার বার পরীক্ষা না করে' পূর্ণ সত্য বলে' গ্রহণ করার যে মনোবৃত্তি মোটের উপর তা অজ্ঞানতার সঙ্গে আপোষ। আর সত্যের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক রূপ লাভ না হলে না বলা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে দেশে যে জাগরণ এলো মধ্যযুগের মতন মুখ্যত তা ধর্মান্দোলন একথা আমরা বলতে প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু সেদিক দিয়ে মধ্যযুগের চাইতে এযুগের আন্দোলন দুর্বল কেননা ব্যাপকভাবে মানুষের আত্মিক উৎকর্ষের কথা এ যুগের নায়করা যতটা ভেবেছেন তার চাইতে বেশি ভেবেছেন নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকদের পারমার্থিক ও আর্থিক উৎকর্ষের কথা। (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলেছিলেন বটে, ব্রাহ্ম হিন্দুর অংশ মাত্র নয়, কিন্তু সেটি এক অমূল্য মুহূর্তের প্রেরণার ফল, নিজেকে হিন্দু বলে পরিচিত করবার আগ্রহ তাঁরও ভিতরে কম নয়)। হিন্দু-মুসলমানবিরোধের মীমাংসা-চেষ্টা এযুগে হয়েছে গৌণভাবে মুখ্যভাবে নয়। তবু এই গৌণ চেষ্টার মূল্যও কম নয়। দেশের একটি স্থানে যদি প্রকৃত উন্নতি চেষ্টা চলে তবে তার প্রভাব সর্বত্র সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক। উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ-চেষ্টা যে সমাজধর্মী হয়েছিল এজন্য দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির ক্ষেত্রে তার মর্যাদা মধ্যযুগের সাধনার চাইতে কম নয় বরং বেশি। সেই চেষ্টা কিভাবে রাজনৈতিক মরীচিকায় বিভ্রান্ত হয়েছে তা আমরা দেখেছি। বাস্তবিক, দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরে যে প্রকৃত সংস্কার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল এইই হয়ত হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বলতে যা বোঝায় দেশের সেই দুরবস্থা উত্তরোত্তর অপনোদন করে চলত। এতেই এ সমস্যার মীমাংসা হয়ত হতো না, তবু বর্তমানে এ বিরোধ ঘৃণিত রূপ ধারণ করছে তা থেকে দেশ রক্ষা পেত।

দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আত্ম-অন্বেষণ চেষ্টা অনেকটা রুদ্ধ হলেও হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা বরাবরই হয়ে আসছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সে-চেষ্টা অপ্রবল, কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে তার প্রাবল্য কম নয়। এই চিন্তার ক্ষেত্রে একালের দুজনের চেষ্টাই বিশেষ শ্রদ্ধার্হ হয়েছে রামকৃষ্ণের ও রবীন্দ্রনাথের।

রামকৃষ্ণ দেবের "যত মত তত পথ" বাণী জগতের বিরোধ সামঞ্জস্যের এক বড়ো মন্ত্র বলে কোনো কোনো মনীষী মত প্রকাশ করেছেন। সে চিন্তা-পদ্ধতিতে সত্য দৃষ্টির চাইতে শুভ ইচ্ছা যে বড়ো একথা আমরা বলতে প্রয়াস পেয়েছি; কেননা পথ নির্দিষ্ট আছে এ সত্য নয়, পথ বারবার আবিষ্কার করতে হয় এইই সত্য রামকৃষ্ণ দেবের পথও চিরাচরিত পথ নয়, আবিষ্কৃত পথ।[৩৪] তবে দেশের লোকদের যে অবস্থা তাতে এ চিন্তারও বিশেষ মূল্য আছে। দেশের লোকে যদি অন্তত এই কথাটা বুঝতে পারে যে মানুষ বিচিত্র, মানুষের মতও বিচিত্র, সব এক ছাঁচে ঢালাই সম্ভবপর নয়, তাহলেও বিরোধ-শান্তির অনেকটা সহায়তা হয়। "যত মত তত পথ" কথাটিতে নবসৃষ্টি-প্রবণতা যতখানি তার চাইতে সমাজ ও ধর্মের প্রাচীন রূপের পূজার আগ্রহ বেশি। এর মধ্যে যে কাব্যসৌন্দর্য আছে তাতেই আকৃষ্ট হয়েছে অনেক ভাবুক ব্যক্তির চিত্ত, কিন্তু মানুষ আজ এত কাছাকাছি এসে হাজির হয়েছে যে তাদের দেশকালের পটে সাজিয়ে সাজিয়ে কল্পনার চোখে না দেখে সহজভাবে খোলা চোখে দেখবার প্রয়োজন বেশি হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়-বাদের দুইটি ধারা। একদিকে, তাঁকেও বলা যায় "যত মত তত পথ" বাদী— বিভিন্ন শ্রেণীগত ও দেশগত বৈশিষ্ট্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি শ্রদ্ধাপূর্ণ; আর একদিকে তিনি বিশেষভাবে সৃষ্টিধর্মী-মানুষকে দেশ কালে বিভক্ত না দেখে এক অখণ্ড বিকাশমান সমাজের সভ্যরূপে দেখেছেন, সমাজ-জীবনে উৎকর্ষ লাভ যার জন্য পরম সত্য। তাঁর Religion of Man গ্রন্থে তাঁর এই মত বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই যে বিকাশ-ধর্মী মানুষ সমাজ জীবনে অক্লান্তভাবে সৃষ্টিশীল হয়ে চলা যার জন্য সার্থকতার পথ, এর অভ্যুদয় দেশে না হলে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বলতে আমাদের যে দুঃখ বোঝায় তা দূর হবে না এইই আমাদেরও প্রধান নিবেদন।

এই বিকাশ-ধর্ম অথবা সৃষ্টিধর্ম কি? খুব ঘোরালো না করে' সহজভাবে বলা যায় জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের যে অন্তহীন কৌতূহল সেইটি তার সৃষ্টিধর্ম। শুধু নতুন কিছু করবার ঝোঁককে সৃষ্টি-ধর্ম বলা অসার্থক, কেননা, জ্ঞান সেখানে তেজোহীন। যুগে যুগে মানুষ যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেছে,

---

৩৪. দ্রঃ রামমোহন রায়

নূতন নূতন কর্মের উদযাপনে প্রাণপাত করেছে, সে-সব তার সৃষ্টিধর্মেরই প্রেরণায়। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে সৃষ্টিধর্মের প্রভাবে মানুষ রাতারাতি আগাগোড়া বদলে গিয়ে অদ্ভুত কিছু হয়ে ওঠে। হয়ত অন্তরের নতুন উপলব্ধির গাঢ়তার দিক দিয়ে সে বদলেই যায়; কিন্তু আসলে, মানুষ জীবনের পথে ধীরে ধীরেই চলে, একেবারে নতুন হয়ে ওঠা তার শক্তির বাইরে। চারপাশের জীবনের সঙ্গে মানুষ যে নিবিড় যোগে যুক্ত সৃষ্টিধর্ম তাকে কখনো অস্বীকার করে না, বরং পূর্ণভাবে স্বীকার করে তাকে ফুটিয়ে তোলে নতুন সম্ভাবনা—আর ক্রমাগত চলে এর কাজ।

এই যে মানুষের ক্ষমতা— পরিবেষ্টনকে নিয়ে নতুন হয়ে ফুটে ওঠা— এ শুধু পরমাশ্চর্য নয় অত্যাবশ্যক, যেমন অত্যাবশ্যক দেহের কোষাণুসমূহের অক্সিজেন সংস্পর্শে প্রতিমুহূর্তে দগ্ধ ও পুনর্গঠিত হওয়া। আর যে-কারণে দেহ-শুদ্ধির এই প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে— অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষায় অমনোযোগ অথবা ব্যাপক অমনোযোগ— সেই কারণেই ব্যাহত হয় সমাজজীবনে সৃষ্টিধর্ম। সমাজ-জীবনে এই অমনোযোগ বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করে, এত রূপে যে সে-সবের নামকরণ অসম্ভব— যেমন স্বাস্থ্যের এক নাম, কিন্তু ব্যাধির নামের অন্ত নেই— তবে আমাদের দেশে এর বড় পরিচয় স্থূল হয়েছে ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা। সে-ধারণায় অমনোযোগ, অন্য কথায় চারদিকের জীবনের সঙ্গে সংস্রবের অভাব এবং মোহের প্রভাব, এমন আশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছে যে তার প্রাচীনত্ব রীতিমত সম্ভ্রমের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

হিন্দু জাগরণ সম্বন্ধে আমাদের আরো আলোচনা করবার আছে। সেই জাগরণ-তত্ত্বেও দেখা যাবে, সেই প্রাচীন অমনোযোগের প্রভাব। হিন্দু-সমাজে সূচিত হয়েছিল এই জাগরণ এজন্য যদি একে হিন্দু জাগরণ বলতে হয় তবে জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের সাধনার সাম্প্রদায়িক রূপকে অসঙ্গতভাবে বড় করে দেখা হয়। তার চাইতে, এ জাগরণে হিন্দুত্ব কতখানি অহিন্দুত্বই বা কতখানি তা বোঝা যাবে যাঁরা জাগ্রত হয়েছিলেন তাঁদের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে। যে সব কর্ম, যে সব চিন্তা এমন কি যে সব ব্যক্তি থেকে তাঁরা প্রেরণা লাভ করেছিলেন সে সবে হিন্দুত্ব যতখানি আছে অহিন্দুত্ব তার চাইতে মোটেই কম নেই; আর যাঁরা প্রেরণা লাভ করেছিলেন, প্রগাঢ় স্বজনপ্রীতি সত্ত্বেও, কোনটি হিন্দু কোনটি অহিন্দু এই বিবেচনার দ্বারা তাঁরা প্রেরণালাভের পথে চালিত হননি। বাস্তবিক, যাঁরা সৃষ্টিধর্মী, সত্য ও সৌন্দর্যের প্রেরণা তাঁরা যে জগতের যে কোনো স্থান থেকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন, দেশ জাতি কাল এর কোনো ব্যবধান তাঁদের জন্য ব্যবধান হয় না, এই দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট কথা আমাদের দেশের অনেক সৃষ্টিধর্মী

ব্যক্তিও যে মাঝে মাঝে কেমন করে বিস্মৃত হয়েছেন একথা ভাবলে বিস্ময়ে বিহ্বল হতে হয়। এর মুখ্য কারণ বোধ হয় এই যে সৃষ্টি-প্রবণতা তাঁদের মধ্যে স্বল্পক্ষণস্থায়ী হয়েছে, আর দেশের উচ্চশ্রেণীর ভিতরেও অজ্ঞানতার বহু বিস্তারের জন্য বিচারের পথ তাঁদের মনে হয়েছে দুস্তর।

দেশের একালের এই জাগরণের মূলে যত বিচিত্র প্রভাবের ক্রিয়া আছে সেসব বিস্মৃত হয়ে এবং সমস্ত দেশের জন্য এ জাগরণ কত অর্থপূর্ণ সেই বৃহৎ দায়িত্বের পাশ কাটিয়ে হিন্দু-সমাজে আরব্ধ জাগরণ যে শুধু হিন্দু জাগরণ নাম পেল এই মোহ অথবা অমনোযোগ ধর্ম— মোহ না পাবারই যোগ্য। ধর্মের যে গোড়ার কথা মনুষ্যত্ব-বোধ তার সঙ্গে মোহের নিত্য-বিরোধ; এ-ধর্ম হচ্ছে দীর্ঘকালের বিচারহীন আচারপ্রিয়তা—সাংসারিক জীবনের প্রচ্ছন্ন ব্যর্থতা-বোধ এই আচার মোহকে অথবা ধর্ম মোহকে এমন মধুর করেছে মনে হয়। ধর্ম-মোহই যে এদেশে মানুষের অন্তর্নিহিত সৃষ্টি ধর্মের ব্যর্থতার প্রতিরূপ তার একটি বড় পরিচয় এই যে হিন্দু-জাগরণের প্রতিক্রিয়ায় দেশের মুসলমানদের ভিতরে বিশেষভাবে জাগলো সাম্প্রদায়িক ধর্ম-বুদ্ধি।

কিন্তু ধর্মকে যাঁরা আগাগোড়া মোহ বলেন তাঁদের মত আমরা গ্রহণ করি না, কেননা জীবনের সার্থকতা ধর্ম-বোধে, অর্থাৎ, সত্যে অথবা কোনো আদর্শে সমর্পিত চিত্ততায়। প্রচলিত ধর্ম-সম্প্রদায়গুলোর মধ্যেও এরূপ সমর্পিত চিত্তদের জন্ম হয়েছে। কাজেই এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদের হতে হয়— প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়কে মোহ থেকে মুক্ত করে' প্রকৃত ধর্ম-প্রীতিতে প্রতিষ্ঠিত করাই কি দেশের চিন্তাশীল কর্মীদের শ্রেষ্ঠ কাজ নয়? এই ভাবেই কি মানুষের সৃষ্টি ধর্ম বা বিকাশ-ধর্ম সক্রিয় করে তোলা হবে না।

বলা বাহুল্য আমাদের দেশে এতদিন প্রধানত এই চেষ্টাই হয়েছে। তাতে ফল যে হয়নি সে-কথা না বললেও চলে। কিন্তু ফল হয়নি চেষ্টার দোষও বটে; দেশের বিভিন্ন ধর্মকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার না করে' শুধু এই বিশ্বাসকে পাথেয়রূপে অবলম্বন করা হয়েছে যে সব ধর্মের ভিতরেই জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সত্য নিহিত রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের অর্থাৎ— ধর্ম-বিধানের জীবন নিয়ন্ত্রণের অধিকার পুরোপুরি স্বীকৃত হয়েছে।

এ-অনর্থের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভবপর হয় যদি ধর্মকে চিরস্থির বিধানরূপে গণ্য না করে' আবিষ্কার বিষয় বলে' ভাবা যায়, তাহলে ধর্মগ্রন্থ ও মহাপুরুষ হবেন জগতের চিন্তাশীল ও তাঁদের বাণীর মতো মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু—তার পূজা আরতির বস্তু নয়। কিন্তু ধর্ম-বিধানের পূজারি যাঁরা তাঁরা তাঁদের সাধ্যানুসারে উদারতম হয়েও এতে স্বীকৃত হবেন মনে হয় না। ধর্ম বিধানের উপরে বিচার-বুদ্ধির

স্থান দান তাঁদের চোখে ঘোর অধর্ম বলে' বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক, যদিও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁরা প্রতিনিয়ত বিচার-বুদ্ধিকে বিধানের উপরে স্থান দান করছেন, কেননা বিধানের ব্যাখ্যার পরিবর্তন নিয়তই হচ্ছে।

আমাদের দেশে ধর্মের যা প্রকৃতি তাতে নিছক আচার-পূজা না বলে' উপায় নেই, সৃষ্টি-ধর্ম তাই তার তরফ থেকে বাধাই বিশেষভাবে পায়। এহেন ধর্মকে জীবননিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া বাস্তবিকই বিপত্তিকর। কতখানি বিপত্তিকর তা বোঝা গেছে মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা থেকে। তিনি প্রত্যেক ধর্মকে এমন পূর্ণাঙ্গ জানেন যে ধর্মান্তর-গ্রহণ তাঁর চিন্তার অতীত। তিনি সজাগভাবেই এ-মত প্রকাশ করেছেন। ধর্ম বলতে তিনি যা বোঝেন তার ভিতরে আচার প্রিয়তা থাকলেও প্রবল বিচার-বুদ্ধি বেশি করে' আছে; তাই তাকে জীবন নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া অসঙ্গত বা অশোভন হয় না। কিন্তু তাঁর চিন্তার সেই অভিনবত্বের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি তেমনভাবে আকৃষ্ট না করে' তিনি যে তাদের হতে বলেছেন স্বধর্মে নিষ্ঠাবান এতে প্রকৃত ধর্ম-ভাব নয় ধর্মমোহই দেশে প্রবল হবার সুযোগ পেয়েছে। একালের বিবর্ধিত হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য তিনি আংশিকভাবে দায়ী একথা তাই বলা যায়। অসাবধানতা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিপজ্জনক। ধর্মের ক্ষেত্রে যাঁরা তাকে মনে করে সার্থকতার পথ, এত অভিজ্ঞতার পরে আমাদের বলতেই হবে, তাঁরা ভুল করেন।

কাজেই এই যে সুপরিচিত সিদ্ধান্ত যে হিন্দু হিন্দুত্বে নিষ্ঠাবান হলে' এবং মুসলমান মুসলমানত্বে নিষ্ঠাবান হলে তাদের মিলন সম্ভবপর হবে এর উপরে যাঁদের নির্ভর তারা সাধু-উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েও অন্ধকারে পা বাড়ান। এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে তাঁদের যাচাই করা উচিত—হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব বলতে তাঁরা কি বোঝেন। কিন্তু তেমনভাবে যাচাই করতে গেলে তাঁদের অবলম্বন হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব হবে না, হবে এই দুয়ের অন্তর্নিহিত সৃষ্টিধর্ম। অন্যভাবে কথাটা বললে দাঁড়ায়, হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব অতীতে ও বর্তমানে যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল ও করছে তাইই সে-সবের প্রকৃত রূপ একথা অর্থহীন, তার পরিবর্তে এই সব ধর্ম ভবিষ্যতে কিভাবে মানুষের জ্ঞান ও কর্ম শক্তির সূতিকাগার হবে এইই হওয়া চাই হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোকদেরই বিশেষ সাধনার বিষয়। এই কথাই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই বাণীতে— যা শাস্ত্র তাই বিশ্বাস্য নয়, যা বিশ্বাস্য তাই শাস্ত্র।[৩৫]

---

৩৫. পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীও এই অভিমত প্রকাশ করেন: লিখিত শাস্ত্রই পূর্ণাঙ্গ ধর্মশাস্ত্র নয়, ধর্ম হচ্ছে চিরন্তন বিবেক।

এই সৃষ্টি-ধর্ম অদ্ভুত বা দুঃসাধ্য কিছু যে নয় প্রতিদিন তা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। মানুষ আরো বড় হবে আরো সুন্দর হবে এ-বিশ্বাস মানুষের মর্মমূলে। এত যে ধর্ম জগতে প্রবর্তিত হয়েছে, এত বিচিত্র সভ্যতার বিকাশ হয়েছে, এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার হচ্ছে, সৃষ্টি-ধর্ম বা বিকাশ-ধর্ম ভিন্ন এসবের মূলে আর কিসের প্রেরণা থাকতে পারে! তবে, মানুষ সৃষ্টিধর্মী হলেও জাগ্রতভাবে নয়। জগতের মানুষ একালে প্রায় এক পরিবারভুক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সজাগ চেষ্টার পরিমাণ তাই যথেষ্ট বাড়াবার প্রয়োজন।

সৃষ্টিধর্মী না হলে দেশের যুগযুগান্তরের সংগৃহীত আচারের দাসত্বই যে দেশের লোকদের জন্য বড় হয়ে থাকবে, এদেশের মানোজীবন ও সমাজ জীবনের নব নব সম্ভাবনা তাদের মনে হতে থাকবে দুরাশামাত্র, একথাটা আরো মহামূল্য জ্ঞান করি বলেই যে-সব চিন্তাশীল বলেন, ভারতের যে বিশেষ প্রকর্ষ-ধারা জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক তারই হওয়া উচিত ভারতবাসীর জীবনের নিয়ামক, তাঁদেরও কথা আমাদের মনে কিছু সন্দেহের উদ্রেক করে। এই চিন্তাধারা যাঁদের তাঁরা খুব বড় এই কথাটি বলেন যে দেশের যে বহুকালের ভৌগোলিক পরিস্থিতি ও জীবন-ধারা তা সেই দেশের লোকদের স্বভাবের অঙ্গীভূত হয়ে যায়, সেই স্বভাবের দিকে দৃষ্টি রেখে না চললে স্বভাব সময়ে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেয়। এঁরা আহার-বিহার পোষাক পরিচ্ছদ থেকে আরম্ভ করে বিশেষ বিশেষ আদর্শের অনুসরণ পর্যন্ত জীবনের সর্ব ব্যাপারে দেশের লোকদের যে দেশের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে বলেন এ খুব সঙ্গত কথাই বলেন। কিন্তু এই চিন্তাধারার ভিতরে দুর্বলতা এই যে স্বভাব যে সৃষ্টিশীল আর সেই সৃষ্টিশীলতা মন্দ গতি হলেও অশ্রান্ত-গতি, মানুষের কোনো দুর্বলতার প্রতি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যেমন তার স্বভাব নয় তেমনি কোনো দুর্বলতাকে বরং দুর্বলতা জ্ঞান করাও তার স্বভাব নয়— এই বড় কথাটা এর শ্রদ্ধার বিষয় তেমন নয়। একটু ভাবলেই বোঝা যায়, এই চিন্তার অধিনায়করা বেশ একটি সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করলেও মোটের উপর নির্দেশহীন এঁদের বাণী। ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে কোন সংস্কৃতি বোঝা হবে— বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, মরমী, মোগল অথবা ব্রিটিশ? যদি এসবের মিশ্রণ হয় তবে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সে-মিশ্রণ কি কি ধরনের হবে কেন হবে? এসব প্রয়োজনীয় কথা সম্বন্ধে এঁদের কোনো সদুত্তর নেই। আসলে, এসব কথা যাঁরা বলেন তাঁদের শ্রেষ্ঠরা সৃষ্টিধর্মী, সেই সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁরা ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় থেকে কিছু কিছু প্রেরণা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদের বোঝা উচিত তাঁদের মতো সবাই যে কেবল ভারতের ইতিহাস থেকে প্রেরণা লাভ করবেন এ সম্ভবপর নয়, অপ্রয়োজনীয় এবং কতকটা অসম্ভবও বটে। তাঁরাও কেবল ভারতের

ইতিহাস থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেননি। শুধু বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় নয় জীবনের অনেক ব্যাপারে বিশ্বজোড়া একাকারত্ব একালে যেমন অপরিহার্য তেমনি বাঞ্ছনীয়। এরপরও বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য মানুষের জন্য দুর্লভ হবে না, যেমন এক পরিবারে বহু রুচির লোকের জন্ম হয়, একই ভাষায় বহু মতের সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে।

একালের হিন্দু চিন্তাশীলদের (ভারতীয় না বলে হিন্দু বলাই সঙ্গত কেননা এক্ষেত্রে মুসলমান চিন্তাশীলরা হিন্দু চিন্তাশীলদের অনুকারী মাত্র) এই যে বৈশিষ্ট্য-প্রীতি এটি ভাল করে' বুঝে দেখবার সময় এসেছে। কিন্তু আত্মসম্মানজ্ঞান, অর্থাৎ গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে না যাওয়ার ভাবটি, যে এর মধ্যে আছে সেটি অবশ্য ভাল, কিন্তু এ ভিন্ন এর বাকি সবটাই মনে হয় প্রচ্ছন্ন অভিমান, আরো সংকীর্ণ করে বলা যায়, প্রচ্ছন্ন জাতি-অভিমান অথবা ব্রাহ্মণত্বের অভিমান। যাদের রাজনৈতিক ভাগ্য মন্দ তাদের পক্ষে এমন অভিমানও মন্দ নয় কারো কারো এই মত, কিন্তু অভিমানের জন্য যে মন্দভাগ্য অচল হয় তা যথার্থ, কেননা অভিমান ও সৃষ্টি-ধর্ম পরস্পর-বিরোধী। এই অভিমান হিন্দুর জীবনী-শক্তির এক পরিচয়-চিহ্ন এই মত দেশে প্রসার লাভ করেছে। কিন্তু হিন্দুর জীবনী-শক্তি বলতে যে ব্যাপারটার প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করা হয় সেটি এত প্রশংসার্হ কি না তাও ভাবা দরকার। হিন্দু বেঁচে আছে এ যতটা সত্য, নিজের চোখে ও জগতের চোখে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে বেঁচে আছে এ তার চাইতে কম সত্য নয়। তার চাইতে গ্রীক মরে' গেছে কিন্তু মরে' গিয়েও সে জগতের প্রেরণা-স্থল হয়ে আছে, এর গৌরব হয়ত বেশি। শুধু বেঁচে থাকাই অবশ্য গৌরবের নয়, তাহলে সে-গৌরব হিন্দুর প্রাপ্য নয়। হিন্দুর গৌরব এই জন্য যে এক সময়ে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্ম হয়েছিল তাঁদের প্রভাব আজো তাদের জীবনে সক্রিয়। কিন্তু তাইই যদি সত্য হয় তবে অভিমানের অবকাশ নেই, কেননা শ্রেষ্ঠদের প্রভাব সক্রিয় হয় তাদের পূজা— প্রদক্ষিণে বা গৌরব কীর্তনে নয় তাঁদের মতো সৃষ্টিশীলতায়—আর সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে একান্ত যোগ বিনয় ও সত্যানুসন্ধিৎসারই। ভারতীয় সংস্কৃতিবাদ প্রভৃতি চিন্তা জীবনের দায়িত্ব পূর্ণভাবে স্বীকার না করারই নামান্তর বলে' মনে হয়। পরিবেষ্টনের সঙ্গে নিবিড় যোগের বাণী যে এতে প্রচারিত হয়েছে সেটি মহামূল্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সৃষ্টির ব্যাপারে স্বদেশ বিদেশ সবই উপকরণের ক্ষেত্র একথাও পুরোপুরি স্বীকার করতে হবে। যে সৃষ্টিধর্মী সে স্বদেশ-দেবতার অর্চনা করে বিশ্বজ্ঞান ও বিশ্বসৌন্দর্যের আলোকে।

পরিবেষ্টনের সঙ্গে নিবিড় যোগ এই কথাটি দেশের হিন্দু ও মুসলমানদের দুইভাবে বুঝবার প্রয়োজন আছে মনে হয়। মুসলমান-সমাজের নিম্ন অংশ সহজেই

দেশের সঙ্গে নিবিড় যোগে যুক্ত। এই বাংলাদেশে তাদের সেই যোগের অনবদ্য পরিচয় রয়েছে লোক-সাহিত্যে ও লোক সঙ্গীতে। কিন্তু মুসলমান-সমাজের উচ্চ বা সম্ভ্রান্ত অংশ সম্বন্ধে একথা তেমন ভাবে বলা যায় না। অথচ অল্প কিছুকাল পূর্বেও এই সম্ভ্রান্ত অংশ নিজেদের পূর্ণভাবে স্বধর্মনিষ্ঠ জেনেও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দান, অতিথী-সৎকার, দেশের গুণীদের সমাদর, ইত্যাদি ব্যাপারে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাঁদের বর্তমান আর্থিক অস্বাচ্ছল্য এর একটি বড়ো কারণ তা সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু তার চাইতেও বড়ো কারণ যে তাঁদের পরিবর্তিত মনোভাব বা "ওহাবী প্রতিক্রিয়া" সে কথা আমরা বলতে প্রয়াস পেয়েছি। তা কারণ যাইই হোক দেশের সঙ্গে সহজ প্রীতির যোগের অভাব তাঁদের মধ্যে যে ঘটেছে, এ শুধু তাঁদের জন্য লজ্জার কথা নয় শঙ্কার কথাও বটে, কেননা, এ তাঁদের জীবনের ব্যর্থতার এক নিদারুন পরিচয়-চিহ্ন। আর হিন্দুর জন্য এই পরিবেষ্টনের সঙ্গে যোগ অনেকটা স্বাভাবিক মনে হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তা নয়। হিন্দু সমাজ জীবনে উচ্চ ও নিচের ভিতরে যে ঘোর ব্যবধান তাইই তার জন্য প্রিয় করেছে রক্ষণশীলতা বিচিত্র ধরনের আত্মসম্পূর্ণতায় যার প্রকাশ। সে-রক্ষণশীলতায় জীবন কোনো রকমে রক্ষা পেলেও তার বিকাশ অথবা সৃষ্টি-ধর্ম যে কেবলই বাধা পায় সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে শিক্ষিত হিন্দুর অপারগতা শিক্ষিত মুসলমানের দেশাত্ববোধের অভাবের মতনই ভয়ঙ্কর। এক হিসাবে ভারতের যুগযুগান্তরের ইতিহাস ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ইতিহাস। হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, সব যুগেরই এই রূপ-ব্রাহ্মণ বা সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় রাজশ্রিত আর জনসাধারণ ভারবাহী। এমন ব্যাপার প্রাচীনকালে অবশ্য সব দেশেই ঘটেছে; কিন্তু এ-ব্যবস্থা ভারতে যে এমন চিরস্থায়ী হবার উপক্রম করেছে, মনে হয়, তার মূলে দেশের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের উৎকট রক্ষণশীলতাই পরিবেষ্টনের সঙ্গে যোগ যেখানে বিকৃত।

এই দুই ভাগ্য বিড়ম্বিত দলের বিরোধ বর্তমানে এমন দশায় এসে পৌছেছে যে একটিকে নির্মূল করে বিরোধ শান্তির কথা ভাবা অপরটির পক্ষে বিচিত্র নয়। এটি আসুরিক অতএব নিন্দনীয় এই কারো কারো মত। কিন্তু আসলে এ সম্ভবপর নয়। দেশের হিন্দু ও মুসলমান কারো গায়ে এত জোর নেই যে অপরকে পর্যুদস্ত করতে পারে। তাই সে-চেষ্টায় অগ্রসর হলে কিছুকাল মারামারি ও তারপর রেষারেষি এই হবে সার। যাঁরা বলেন এমন মারামারিতে দেশের লোকদের ক্ষাত্রতেজ বাড়বে তাঁদের মহাতেজা ক্ষত্রিয়দের কুরুক্ষেত্রে সম্মিলিত হওয়ার কথা স্মরণ করা ভাল। শুভ ও শুভ ইচ্ছা চিরদিনই অশ্রান্ত সাধনার অপেক্ষা রাখে।

কিন্ত এমন সাধনার দিকে দেশের লোকদের মন রুজু হতে পারার অবস্থায় আছে কি না সেটিও অবশ্য জিজ্ঞাসা। দেশের কর্ম-ও চিন্তানেতা যে ভগ্নোৎসাহ

হয়ে পড়েছেন তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সে-নৈরাশ্য তাঁদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা বলে ভাবাই ভাল। হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ-ব্যাধি থেকে দেশকে মুক্ত করাবার চেষ্টা যথেষ্ট হয়নি এ মিথ্যা নয়। মধ্যযুগ থেকে একাল পর্যন্ত এই বিরোধ-মীমাংসার যত চেষ্টা দেশে হয়েছে সেসব থেকে নূতন প্রেরণাই আমরা লাভ করে' চলব যদি সে সবের সত্যকার মূল্যের দিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি থাকে, আর এই জ্ঞানের অভাব আমাদের ভিতরে না হয় যে দেশকে সুন্দর ও সার্থক করতে আমাদের অক্ষমতা আমাদের জীবনের চরম অসার্থকতার নামান্তর।

এইখানেই বড় প্রয়োজন সৃষ্টিধর্মী নব নেতাদের। অতীতের প্রতি তাঁরা হবেন শ্রদ্ধান্বিত, তার পূজারি কখনো নয়— তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হবে বর্তমান ও ভবিষ্যত। সেইজন্য সুপ্রাচীন "হিন্দু" ও "মুসলমান" এর মিলন তাঁদের কাম্য হবে না, কেননা তা অসত্য ও অসম্ভব, তাঁদের কাম্য হবে একটি নব জাতি গঠন যার সূচনা নানাভাবে বহুকাল ধরে' দেশে হয়েছে, দেশের একালের জীবনের জন্য যার প্রয়োজনের অন্ত নেই। মনোজীবন ও রাষ্ট্রজীবন দুই ক্ষেত্রেই অশ্রান্তভাবে চলবে তাঁদের সৃষ্টির কাজ। একালের যে ধর্ম সম্প্রদায়গত রাষ্ট্রজীবন সেটি কদাচ তাঁদের সমর্থনের বিষয় হবে না, কেননা, তার ফলে এদেশের অভিশাপ-রূপ জাতি-ভেদ নব নব সম্ভাবনা লাভ করে' চলবে; তাঁদের সাধনার বিষয় হবে দেশের রাষ্ট্র-জীবনের, অথবা জীবনের, সত্যকার বিকাশ সম্ভাবনা।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞের অভিমত কতকটা এই। তবে মনে হয় তাঁরা বেশি খেয়ালী। তাঁরা যে বলেন যে বৈদেশিক শাসনের ফলে দেশের আর্থিক ও অন্যান্য বহুবিধ দুঃখ যত বেড়ে গেছে সেসব থেকে দেশকে মুক্ত করে' তবে তার শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে, এ মোটের উপর চমকপ্রদ কথাই বেশি। এর পরিবর্তে সৃষ্টিধর্মী কর্মীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত জাপানের দিকে। মাঝে মাঝে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ক্ষতি-স্বীকার তার নিয়তি কিন্তু সেই নিষ্ঠুর নিয়তি স্বীকার করে' চলছে তার উন্নতি চেষ্টা। মহাত্মা গান্ধী তাঁর কোনো এক কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে একবার বলেছিলেন, One step is enough for me এক পা বাড়াতে পারলেই আমি খুশী-কর্মের ক্ষেত্রে এ পাকা কথা। কোনো রকমের মোহ নয়, সত্যাশ্রয়িতা, প্রতিপদে সৃষ্টিধর্মী কর্মীদের অবলম্বন।

ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা নয় জ্ঞান ও জাতীয়তা দেশের লোকের শরণ্য হবে, নিঃসন্দেহে; কিন্তু জাতি বলতে কি বোঝা হবে? বাঙালী, মান্দ্রাজী, পাঞ্জাবী? —না ভারতীয়? ভারতবর্ষ বহুকাল ধরে' একটি দেশ। ভৌগোলিক পরিস্থিতির জন্য ভারতীয় না হয়ে ভারতবাসীর পরিত্রাণও নেই। তবু আপাতত বাঙালী, মান্দ্রাজী ও পাঞ্জাবী হওয়াই বেশি ভাল মনে হয়; কেননা তা বেশি স্বাভাবিক ও কম

কষ্টসাধ্য। অবশ্য ভারতীয়ত্বের বিরোধী যে বাঙালীত্ব মান্দ্রাজীত্ব বা পাঞ্জাবীত্ব তা কদাচ কাম্য নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—ভারতীয় জাতীয়ত্বের রূপ হবে ইসলাম-দেহ ও বেদান্ত-মস্তিষ্ক। তার চাইতে এই কথা বলাই ভাল, ভারতীয় জাতীয়ত্বের রূপ হবে পূর্ণাঙ্গ মানব-দেহ ও পূর্ণাঙ্গ মানব-মস্তিষ্ক, সৃষ্টি-শক্তির প্রকাশ যার ভিতরে হবে অবাধ। ইসলাম ও বেদান্ত মানুষের সৃষ্টি-শক্তিরই পরিচয় চিহ্ন। মানুষের সেই সৃষ্টি-শক্তি কোনো দিন নিঃশেষিত হবে না, চিরদিন অক্লান্ত ও অম্লান থাকবে, এইই তার জন্ম-অধিকার। সে-অধিকার সত্য হোক।

২৮ মার্চ, ১৯৩৫।

রামমোহন রায়

বাল্যজীবন

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে রামমোহন রায়ের জন্ম। মিস্ কলেটের এই মত নেবার যোগ্য।

তাঁর বালক-কালের দুইটি ব্যাপার বেশ চোখে পড়বার মতো; একটি, তাঁর মেধাশক্তি, অপরটি, গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে ভক্তি। প্রথমটির বাঞ্ছিততম পরিণতি তাঁর পরিবর্তী জীবনে ঘটেছিল একথা সবাই জানেন; দ্বিতীয়টির পরিণতি কিছু অদ্ভুত। কোনো কোনো ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুরুষের জীবনে এমন পরিণতি দেখতে পাওয়া গেছে, যেমন, বাল্যের চঞ্চল ও তার্কিক নিমাই হয়েছিলেন ভক্তিরসাপ্লুত শ্রীচৈতন্য। কিন্তু অনেকের জীবনে এমন পরিণতি দেখতে পাওয়া যায় না। বালক-বুদ্ধদেবকে আমরা দেখতে পাই সহানুভূতিসম্পন্ন ও পর্যবেক্ষণশীল; বালক-মোহম্মদ সম্বন্ধে যে-সব বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় সমসাময়িক উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ভিতরে তাঁর স্বাতন্ত্র্য; আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নাকি পুরোহিতের সন্তান হয়েও দেবতার সম্মুখে নিবেদিত নৈবেদ্য গ্রহণ করতে পারতেন না। —তবে রামমোহনের বাল্যের এই ভক্তিপ্রবণতা উত্তরকালে একটি সুন্দর পরিণতিও লাভ করেছিল। রামমোহনের যোদ্ধৃবেশ বন্ধুর চোখে এত মহিমময় ও শত্রুর চোখে এত নিষ্করুণ যে তাঁর অন্তরের পরমাশ্চর্য কোমলতা তাঁদের চোখে পড়বার অবকাশ পায় না। একটি অন্তঃপ্রবাহী ভক্তিধারা তাঁর ভিতরে ছিল, শুষ্ক জ্ঞানমার্গী তিনি ছিলেন না, একথা আজ সুবিদিত; তার সঙ্গে একথাও আমরা জানি যে এই পুরুষসিংহ অভিনয়ের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়ে অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি, বিগত জীবন বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে অশ্রু-তর্পন তাঁর জন্য ছিল অতি স্বাভাবিক। ইংল্যাণ্ডের লোকদের তাঁর সম্বন্ধে যে ধারণা হয়েছিল— The oriental gentleman, versatile, emotional yet dignified,[৩৬] এটি যথার্থ ধারণা।

এই মেধাবী বালকের ভবিষ্যৎ যাতে গৌরবোজ্জ্বল হয় পিতা রামকান্তের সে-কামনা ছিল। তৎকালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষালাভের জন্য বাল্যশিক্ষা সমাপনান্তে রামমোহন পাটনায় প্রেরিত হন নয় বৎসর বয়সে।

---

৩৬. (তিনি) একজন প্রাচ্যদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি— বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ, ভাবপ্রবণ, কিন্তু প্রভাববান্। কথাটি মিস্ কলেটের লিখিত জীবনীতে আছে।

রামমোহন ও মুস্‌লিম-ধারণা

পাটনায়[৩৭] কিশোর-রামমোহনের অবস্থিতিকাল সুদীর্ঘ নয়। কিন্তু তাঁর জীবনের উপরে এর প্রভাব গভীর। এই প্রভাবের স্বরূপ একটু বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

হিন্দু ও খ্রিস্টান শাস্ত্রের যে-সব আলোচনা রামমোহন করেছিলেন সৌভাগ্যক্রমে সে-সবের অধিকাংশই আমাদের জন্য রক্ষিত আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমান-শাস্ত্র সম্বন্ধে যে-সব সুসম্বদ্ধ ও বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেছিলেন, অথবা করবেন আশা করেছিলেন, তার কিছুই আমাদের হাতে এসে পৌঁছোয় নি। তুহ্‌ফাতুল্-মুওহ্‌হিদীন গ্রন্থে অবশ্য কোরআনের কয়েকটি বচন ও হাদিস সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য আছে; কিন্তু সে আলোচনা তিনি করেছেন শাস্ত্র বিসর্জন দিয়ে, শাস্ত্র স্বীকার করে' নয়। তবু এই তুহ্‌ফাতুল-মুওহ্‌হিদীন গ্রন্থ ও তাঁর রচনার নানাস্থানে ইস্‌লাম ও মুসলমান সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত উক্তি-আভাস-ইঙ্গিত ইত্যাদি থেকে মুস্‌লিম সাধনা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব, অথবা তাঁর চিত্তের উপরে মুস্‌লিম সাধনার প্রভাবের স্বরূপ, অনেকখানি বুঝতে পারা যায়।

অনেকেই বলেছেন, তাঁর স্বসম্প্রদায়ের প্রতীক-উপাসনার প্রতি তাঁর যে বিতৃষ্ণা, তাঁর মূলে রয়েছে কোরআনের শিক্ষা।—শুধু এইই নয়। খ্রিস্টান সমাজের ত্রিত্ব-বাদ, যিশুর রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, এ সমস্তের প্রতি তাঁর যে বিরূপতা, অথচ যিশু খ্রিস্টের প্রতি তাঁর যে গভীর শ্রদ্ধা, এ-সমস্তেরও মূলে রয়েছে কোরআনের শিক্ষা। যথা:

তারা বলে, আল্লাহ্ পুত্র গ্রহণ করেছেন। তাঁরই প্রশংসা! তিনি পরম সমৃদ্ধ। আকাশে ও মাটিতে যা কিছু আছে সব তাঁর। এর সমর্থক কিছু তোমাদের নেই। এমন কথা কি বলছ তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে যা তোমরা জান না? (১০:৬৮)

আর আমরা মেরী-তনয় যীশুকে পরিচ্ছন্ন নির্দেশ দান করেছিলাম ও তাকে "রুহুল্ কুদুস" (Holy Sprit) দ্বারা বলীয়ান করেছিলাম (২:৬৭)। যিশুর প্রার্থনা নামে কোরআনে একটি আয়াত আছে, তার অর্থ এই :

"তুমি যদি তাদের শাস্তি বিধান কর (তবে) —তারা তোমারই দাসানুদাস; আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা কর (তবে) —তুমি মহান ও জ্ঞানময় (৫:১১৮)।"

প্রসিদ্ধি আছে যিশু খ্রিস্টের এই কোরআনোক্ত পরম নির্ভরতার প্রার্থনাটি একদা হজরত মোহাম্মদ সমস্ত রাত্রি আবৃত্তি করেছিলেন।

---

৩৭. 'রামমোহনের বিরুদ্ধ পক্ষের বক্তব্য' দ্রষ্টব্য।

শুধু এই-ই নয়। কোরআনের বহু বাণী রামমোহনের মর্ম স্পর্শ করেছিলো। কোরআনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন, প্রকৃতির দিকে, মানুষের ইতিহাসের দিকে, কোরআন বারবার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরমকবিত্বপূর্ণ ভাষায় বলা হয়েছে— সূর্য চন্দ্র মেঘ বৃষ্টি বসন্ত—বায়ু কেমন করে' আল্লাহ্‌র মহিমাকীর্তন করছে, মানুষের সেবায় এ সবের নিয়োগ হয়েছে, ফলে জলে শস্যে মানুষের কেমন পরিতোষ-সাধন হচ্ছে, এবং এই সব বিশ্বপাতার অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রামমোহন তাঁর তুহ্‌ফাতুল্-মুওহ্‌হিদীন গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে এইসব যুক্তি যথেষ্ট অনুরাগের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

বিধর্মীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে সে-সম্বন্ধেও কোরআনে কয়েক জায়গায় সুন্দর উপদেশ আছে, যথা :

আল্লাহ্ ভিন্ন তারা অন্যান্য যাদের উপাসনা করে তাদের গালি দিও না, পাছে তারা অজ্ঞানবশত সীমা অতিক্রম করে' আল্লাহকে গালি দেয় ..... (৬:১০৯)।

যারা... ভালোর দ্বারা মন্দ বিদূরিত করে, তারা সুখকর আশ্রয় লাভ করবে। (১৩:২২)।

আমার ভৃত্যদের বল যা উত্তম তাই তারা বলুক (১৭:৫৩)।

তারাই পরমকারুণিকের দাস যারা বিনম্র হয়ে ধরণীবক্ষে বিচরণ করে, আর অজ্ঞরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে, "সালাম" (শান্তি) (২৫:৬৩)।

নারীজাতির পক্ষ রামমোহন আজীবন সমর্থন করেছেন। নারীর প্রতি সুবিচার ও সদয় ব্যবহার করবার উপদেশ কোরআনে বিস্তৃতভাবে আছে। যথা :

হে বিশ্বাসীগণ, এটি তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমরা তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করবে, আর তোমরা তাদের যা দিয়েছ তার কিছু অংশ ফিরে পাবার জন্য তাদের বিপন্ন করো না অবশ্য যদি তারা জ্বলজ্যান্তভাবে অন্যায়াচরণ না করে, আর তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর; এরপর যদি তোমরা তাদের ঘৃণা কর তা'হলে, হতে পারে, তোমরা এমন একটি জিনিস অবজ্ঞা করলে যার ভিতরে আল্লাহ্ পর্যাপ্ত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন (৪:১৯)।

নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ব্যবহার হজরত মোহাম্মদের নিজের চরিত্রেও লক্ষ্যণীয়। যখন তিনি মদীনার রাজা তখন তাঁর ধাত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁকে দেখেই তিনি গাত্রোত্থান করলেন ও নিজের উত্তরীয় বিছিয়ে দিলেন তাঁর বসবার জন্য।

কিন্তু কোরআন থেকে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটি রামমোহনের লাভ হয়েছিল সেটি মনে হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীতের অল্প কয়েকটিতে ঈশ্বরের মহিমা অতি সুন্দর রূপ লাভ করেছে, সে-সবের পাশে পাশে কোরআনের কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পারে।
সে অতীত গুণত্রয়
ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ তার কেমনে সম্ভবে।

ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে
ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই সত্য এই মাত্র নিতান্ত জানিবে।

কোরআন :

.... তার তুলনা ব্যক্ত করবার মতনও কোনো কিছু নেই (৪২:১১)।
আকাশ ও পৃথিবীর অপূর্ব স্রষ্টা, আর যখন তিনি কোনো কিছু সংকল্প
করেন তিনি শুধু সেটিকে বলেন, হোক, আর তা প্রকাশ পায় (২:১১৭)।
ভাব সেই একে জলে স্থলে শূন্যে যে সমভাবে থাকে।

যে রচিল এ সংসার
আদি অন্ত নাহি যার
যে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে।

কোরআন :

তিনি জানেন তাদের অগ্রে কি আছে ও তাদের পশ্চাতে কি আছে, তাঁর যেটুকু অনুগ্রহ সেটুকু ভিন্ন তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা ধারণা করতে পারে না; তাঁর সিংহাসন আকাশ ও পৃথিবীর উপরে বিস্তৃত, আর এই উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না.... (২:২২৫)।

কে বুঝিবে তার মর্ম
ইন্দ্রিয়ের নহে কর্ম
গুণাতীত পরব্রহ্ম সকল কারণ।

কোরআন :

দৃষ্টি তাঁকে দর্শন করতে পারে না, কিন্তু তিনি (সব) দৃষ্টি দর্শন করেন। তিনি সূক্ষ্মের পরিজ্ঞাতা সদাজাগ্রত (৬:১০৪)।

ঈশ্বর, আত্মার বা প্রত্যাদেশ, ইত্যাদির স্বরূপ-চিন্তার মানুষ বিব্রত হবে এ কোরআনের অভিপ্রেত নয়, যথা :

অভিপ্রেত নয়, যথা :

"তারা তোমাকে প্রেরণা (প্রত্যাদেশ, আত্মা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে, বল, আমার প্রভুর হুকুমে প্রেরণা আসে, আর জ্ঞানের অতি অল্প অংশই তোমাদের দান করা হয়েছে" (১৭:৮৫)।

ব্রহ্ম স্বরূপত দুর্জ্ঞেয়, তটস্থ লক্ষণের দ্বারা তাঁকে বুঝতে হয়, এ কথা রামমোহন বারবার বলেছেন।

অনেকের ধারণা— কোরআনের আল্লাহ্ এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ অধীশ্বর, তাঁর ভয়ে সমস্ত প্রাণী ভীত, দণ্ড বা পুরস্কার যা খুশী তাই তিনি সৃষ্ট জীবকে প্রদান করেন। এ-সব ভাব যে কোরআনে নেই তা বলবো না। কিন্তু কোরআন একটু বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়লে বুঝতে পারা যায়— কোরআনের আল্লাহ্

অনন্তমহিমান্বিত সদাজাগ্রত আর প্রেমপ্রবণ। এই আল্লাহ্‌র বশ্যতা স্বীকার করবার জন্য কোরআনে বারবার বলা হয়েছে—"আমানু ও আমালুস্ সালেহাত" —বিশ্বাস কর ও সৎকর্মশীল হও। এই সৎকর্ম বলতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সৎকর্মের কথাই ভাবা হয়েছে, যদিও অনেক মুসলমান-ধর্মাচার্য সৎকর্মের এই সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাখ্যার উপরে বেশি জোর দেন না। সৎকর্ম (লোকশ্রেয়ঃ) বলতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সৎকর্মের কথাই যে রামমোহন বুঝতেন সে কথা সর্ববাদিসম্মত।

মুসলমানের চিন্তায় কোরআনের স্থান সর্বোচ্চে। কিন্তু এই কোরআন কিভাবে বুঝতে হবে সে সম্বন্ধে সব মুসলমান নিশ্চয়ই একমত নন। মানুষের অন্তর্নিহিত বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে সব মুসলমান কোরআন বুঝতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মোতাজেলা-দল সুবিখ্যাত। মানুষের অন্তরের অনুভূতি বিশেষভাবে তার সত্যোপলব্ধির সহায়ক, এই মত যে-সমস্ত মুসলমান পোষণ করতেন তাঁদের মধ্যে সুফী সম্প্রদায়ের কোনো কোনো শাখা সুবিখ্যাত। রামমোহনের চোখে যে-ইসলাম মহিমা বিস্তার করেছিল সে-ইস্‌লাম সর্বসাধারণ মুসলমানের ইস্‌লাম তেমন নয়। ইস্‌লামের সেই পরিচিত রূপে যে তৃপ্ত হতে পারেন নি, তা বুঝতে পারা যায় তাঁর Second Appeal to the Christian Public –এর এই উক্তি থেকে।

Disgusted with the puerile and unsociable system of Hindoo idolatry, and dissatisfied at the cruelty allowed by Mussalmanism against Non-Mussalmans, I, on my searching after the truth of Christianity, felt for a length of time very much perplexed with the difference of sentiments found among the followers of Christ (I mean Trinitarians and Unitarians, the grand division of them) until I Met with the explanation of the unity given by the divine Teacher himself as a guide to peace and happiness. (Panini Office Edition, 1906, Page–580).[৩৮]

---

৩৮. হিন্দুর অসামাজিক ও বালকোচিত পৌত্তলিকতায় বিরক্ত হয়ে আর অমুসলমানদের প্রতি মুসলমান-ধর্মের নির্মমতায় দুঃখিত হয়ে আমি খ্রিষ্টধর্মের সত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হই; কিন্তু খ্রিষ্টঅনুবর্তীদের মধ্যে অর্থাৎ ত্রিত্ববাদী ও একত্ববাদী এই দুই বড় দলের মধ্যে যে-মতভেদ তা দেখে বহুদিন আমার দ্বিধাসন্দেহে কাটে। অবশেষে শান্তি ও আনন্দের নির্দেশ স্বরূপ সেই স্বর্গীয় আচার্যের প্রদত্ত একত্বের ব্যাখ্যার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে।

তিনি যে ইসলাম থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন সে ইসলাম মোতাজেলাদের ও শ্রেষ্ঠ সুফীদের ইসলাম।

সাদী হাফিজ প্রমুখ সুফী-সাহিত্যিকদের রচনা তাঁর চিত্তের সন্তোষ সাধন করেছিল। তাঁর কয়েকটি অতি প্রিয় বচনের মধ্যে একটি হচ্ছে হাফিজের একটি গজলের এই দুই চরণ :

ইহকাল ও পরকালের আরাম এই এক কথায়—
বন্ধুদের নিয়ে উৎসব কর, শত্রুদের সঙ্গে আপোষ কর ॥

তাঁর তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীন— এ হাফিজের আরো দুইটি বাণী উদ্ধৃত হয়েছে:

বায়াত্তর দলের ঝগড়া নিরর্থক,
সত্য না বুঝে তারা খেয়াল ও মূঢ়তার পথে চলেছে ॥
কারো অনিষ্টাচারী হয়ো না, আর যা খুশী কর,
আমাদের পন্থায় এ ভিন্ন আর কোনো পাপ নেই ॥

আর সাদীর এই বাণীটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল;

জীবের সেবা ভিন্ন ধর্ম আর কিছু নয়।
তস্‌বিহ্ জায়নামাজ (আসন) ও আলখাল্লায় ধর্ম পাই ॥

তিনি নাকি মাঝে মাঝে ইচ্ছাপ্রকাশ করতেন, এই বচনটি যেন তাঁর সমাধিগাত্রে উৎকীর্ণ হয়। আর ভারতীয় কৃষকদের নিদারুণ দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে তাদের দুঃখ দূর করবার জন্য East Indian Company-র কর্মকর্তাদের তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন সাদীর এই বাণীটি উপহার দিয়ে—

প্রজাদের সঙ্গে প্রীতিবদ্ধ হও ও (এই ভাবে) তোমার
শত্রুদের যুদ্ধ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হও।
কেননা ন্যায় পরায়ণ নরপতির সৈন্য হচ্ছে তার প্রজা ॥

সুফীদের যে সব— বাণী তিনি উদ্ধৃত করেছেন, সে সবের ভিতর দিয়ে তাঁর চিত্ত সুস্পষ্টভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। সবাই জানেন, ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দেশ সম্পর্কে সুফী সাহিত্যে অনেক তত্ত্বপূর্ণ কথা আছে। মৌলানা জালালুদ্দিন রুমির কবিতায় অদ্বৈত-তত্ত্ব আশ্চর্য সাহিত্যিক সার্থকতা লাভ করেছে। সে-সবে রামমোহন কতখানি আনন্দিত হতেন তা তেমন জানতে পারা যাচ্ছে না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সুফীদের সুগভীর মানব-প্রেম বা জীব-প্রেম যে তাঁর পরম আনন্দের বিষয় ছিল সেটি অতি সুন্দরভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছে। —বিশেষজ্ঞেরা আজ এ বিষয়ে একমত যে বিশ্বমানবের একত্বের ধারণা রামমোহন সুস্পষ্টভাবে করেছিলেন। সেই বিশ্বমানবের একত্ব সম্বন্ধে সাদীর এই বাণীটি সুবিখ্যাত—

আদম-সন্তানরা একে অন্যের অঙ্গস্বরূপ
কেননা তাদের উৎপত্তি একই মূল থেকে।

যদি এক অঙ্গে বেদনা বাজে
তাহলে অন্য অঙ্গও শান্তিতে থাকে না
মানুষের দুঃখ যদি তুমি না বোঝো
তাহলে মানুষ নাম নেওয়া তোমার অন্যায় হয়েছে।

সুফী-সাহিত্য রামমোহনের অন্তরকে আনন্দিত করেছিল, কিন্তু তাঁর অন্তর ও বাহির উভয়কে বীর্যবন্ত করেছিল মোতাজেলা-বাদ। তাঁর যুক্তিবাদের কয়েকটি প্রধান সায়ক গৃহীত হয়েছিল মোতাজেলাতূণ থেকে, যথা ঃ—

১. ঈশ্বর সর্বশক্তিমান কিন্তু তিনি নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন না, তাঁর সমকক্ষ আর একজন ঈশ্বর সৃষ্টি করতে পারেন না।

২. ঈশ্বরের গুণ তাঁর সত্তা থেকে পৃথক নয়, গুণের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করলে ঈশ্বরের একত্ব নষ্ট হয়। প্রধানত এই যুক্তির দ্বারা রামমোহন বিভিন্ন দেবদেবীর ঈশ্বরত্বের দাবি খণ্ডন করেছেন।

৩. রামমোহন বলেছেন বেদ নশ্বর। মোতাজেলারা বলতেন, কোরআন সৃষ্টবস্তু, স্রষ্টার মতো চিরন্তন নয়। প্রধানত এই মতের জন্য মোতাজেলারা সর্বসাধারণে মুসলমানের বিরাগভাজন হন।

তবে মোতাজেলাদের সঙ্গে রামমোহনের বড় পার্থক্য হয়ত এই— মোতাজেলারা সাধারণত বিচারপন্থী পণ্ডিত, রামমোহনের পাণ্ডিত্য অনন্য সাধারণ, কিন্তু বিচারপন্থী পণ্ডিত তিনি যতখানি তার চাইতে বেশি তিনি বিচারপন্থী কর্মী— স্বদেশ প্রেমিক ও মানব-প্রেমিক।

মুসলমান নৈয়ায়িকদের কাছে রামমোহন যে বিশেষভাবে ঋণী সে কথা সবাই স্বীকার করেছেন। তাঁদের আবিষ্কৃত তর্ক-বিজ্ঞানের 'যথেষ্ট হেতু'— বাদ "তর্জি বেলা মুরাজ্জেহ্" (Principle of sufficient reason) আধুনিক বিজ্ঞানের এক শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

রামমোহন মুসলিম সাধনাকে যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন সেই দৃষ্টি তাঁর সমকালে কোনো মুসলমানের ভিতরে ছিল কি না, তার পরিচয় পাওয়া যায় না।[৩৯] শুধু তাঁর জীবন-চরিতে পাওয়া যাচ্ছে, মুসলমানরা তাঁর কোনো কোনো মন্তব্যের জন্য এক সময়ে বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কলিকাতা-বাসকালে মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মেছিল। এমন কি মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব বেশি ছিল বলেই তাঁর স্বসম্প্রদায়ের লোক তাঁর উপর বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট ছিলেন,— তাঁরা সন্দেহ করতেন, হয়ত মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর পানভোজনও

---

৩৯. সিয়ারুল্ মোতা অখেরীন এর লেখক সৈয়দ গোলাম হোসেন রামমোহনের অব্যবহিত পূর্বের লোক। তাঁর স্বদেশ-প্রেম ও কাণ্ডজ্ঞান প্রশংসার্হ, কিন্তু ধর্মে তিনি রামমোহনের মতো উদারহৃদয় নন।

চলে। তৎকালের উচ্চশ্রেণীর মুসলমান রাজকর্মচারীরা যে কৃতবিদ্য ও দক্ষ ছিলেন, বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রবলে শারীরিক বীর্যে পোষাকে-পরিচ্ছদে তৎকালের মুসলমান যে তৎকালে হিন্দুর চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, বিলাতে সাক্ষ্যদান-কালে স্পষ্টভাবেই তিনি সে কথা বলেছিলেন।

কিন্তু তবু মনে হয়, মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর এই যে সম্প্রীতি, সম-মতের সম্প্রীতি এ নয় সম-বৈদগ্ধ্যের এ সম্প্রীতি। মুস্‌লিম সাধনা ও তৎকালের মুসলিম প্রকর্ষ তাঁর প্রিয় ছিল, কিন্তু এসবের প্রতি তাঁর মোহ ছিল না। তাই পার্শীর পরিবর্তে ইংরেজিকে রাজভাষা করবার পরামর্শ তিনি শাসকদের দিয়েছিলেন; উদ্দেশ্য, এর ফলে দেশের জনসাধারণের বিচারালয়ে কিছু সুবিচার পাবে, আর দেশবাসীর পক্ষে ইয়োরোপীয় বিদ্যালাভের পথ সুগম হবে।

রামমোহন ও হিন্দু-সাধনা

পাটনা থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরে পিতার সঙ্গে রামমোহনের মতান্তর ঘটে। তার ফলে তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করেন ও তিব্বত গমন করেন। তিব্বত গমনের বাসনা হয়তো পাটনা-বাস-কালেই তাঁর হয়েছিল, তাতে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সম্ভাবনা ছিল, পার্বত্য জাতিদের বিচিত্র পূজা-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয়লাভও তাঁর অবাঞ্ছিত ছিল না। এইভাবে নরপূজা পিশাচ-পূজা ইত্যাদি বিচিত্র অজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হয়েই নিরাকার একেশ্বরবাদের দিকে তাঁর অত প্রবণতা জন্মেছিল মনে হয়।

তিব্বত প্রভৃতি ভ্রমণের পরে তাঁর জীবনের বড় ঘটনা হচ্ছে কিছুকাল কাশীবাস ও হিন্দুশাস্ত্র চর্চা। এই চর্চা তিনি যে গভীরভাবে করেছিলেন পণ্ডিতেরা সে কথা স্বীকার করেন। আর রামমোহন যত শাস্ত্রের চর্চা করেছিলেন তার মধ্যে হিন্দু শাস্ত্রের চর্চাই এ পর্যন্ত বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে। হিন্দু-সমাজও তাঁকে আশানুরূপভাবে গ্রহণ করেন নি, তবু তাঁরাই যে তাঁকে বেশি গ্রহণ করেছেন এ সত্য।

নগেন্দ্র-চট্টোপাধ্যায় কৃত রামমোহন-চরিতকথায় তাঁর হিন্দুশাস্ত্রের চর্চা বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বেদান্তের শঙ্করভাষ্য অবলম্বন করলেও রামমোহন জোর দিয়েছেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্যজীবনের উপরে, আর শঙ্করাচার্য জোর দিয়েছেন সন্ন্যাসের উপরে, এসব কথা বলা হয়েছে। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রামমোহনের ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে পূর্ণ অদ্বৈতবাদ না বলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অথবা দ্বৈতবাদ বলতে চান। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর রাধাকৃষ্ণন শঙ্করদর্শনের যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে মনে হয়, হিন্দু-মনীষার এই শ্রেষ্ঠ উপার্জন অদ্বৈতবাদ রামমোহন যে-ভাবে বুঝেছিলেন সেইভাবেই তা বোঝা হয়ত সঙ্গত। যথা—

Sankara does not assert an identity between God and the world but only denies the independence of the world..... If we raise question as to how the finite rises from out of the bosom of the infinite, Sankara says that it is an incomprehensible mystery, maya. We know there is the absolute reality, we know that there is the empirical world, we know that the empirical world rests on the absolute; but the how of it is beyond our knowledge..... The greatest thinkers are those who admit the mystery (of the relation of God to the world) and comfort themselves by the idea that the human mind is not omniscient Sankara in the East and Bradley in the West adopt this wise attitude of agnosticism. (Hindu View of Life, pp. 66–68).[৪০]

অন্যত্র

No theory has ever asserted that life is a dream and all experience events are illusions. One or two late followers of Sankara lend countenance to this hypothesis, but it cannot be regarded as representing the main tendency of Hindu thought (p. 69).[৪১]

রামমোহনের হিন্দু-শাস্ত্রের বিচার তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুদের চির-বিস্ময়ের সামগ্রী। হিন্দুর অতলস্পর্শ অতীতের অন্তহীন শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করে' তিনি যে-ভাবে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ও লোকশ্রেয়ঃ- তত্ত্ব তাঁদের উপহার দিয়েছেন, সেটি

---

৪০. শঙ্করের মত এ নয় যে ব্রহ্ম ও জগৎ অভেদ, তিনি শুধু জগতের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করেন। ..... অসীম থেকে সসীমের উৎপত্তি কেমন করে হয় এ প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলেন– এ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য, মায়া। আমরা জানি, শুদ্ধ সত্তা আছেন আর ব্যবহারিক জগৎ আছে, আর এই শুদ্ধ সত্তার উপরে ব্যবহারিক জগৎ নির্ভরশীল; কিন্তু কেমন করে' সেটি আমাদের জ্ঞানের বাইরে। ..... শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলেরা ব্রহ্ম ও জগতের এই রহস্যময় সম্বন্ধের কথা স্বীকার করেন। তাঁরা জানেন যে মানবমন সর্বজ্ঞ নয়। প্রাচ্যের শঙ্কর ও পশ্চিমের ব্র্যাডলি জ্ঞানিজনসুলভ এই অজ্ঞেয়াতাবাদের সমর্থক।

৪১. এমন কোনো মত নেই যাতে বলা হয়েছে যে জীবন স্বপ্ন, আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা অলীক শঙ্করের বহুপরের দুই একজন শিষ্যের ভিতরে এই মতের কিছু সমর্থন পাওয়া যায়, কিন্তু সেই দিকেই যে হিন্দু-চিন্তার বিশেষ প্রবণতা তা বলা যায় না।

যে কত বড় দান সে-সম্বন্ধে তাঁর স্বসম্প্রদায়ের সর্বসাধারণ এ পর্যন্ত তেমন অবহিতচিত্ত হন নি এইজন্য যে তাঁর সিদ্ধান্তকে তাঁরা হিন্দু সাধনা সম্বন্ধে বাস্তবিকই একটি শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত বলে ভাবতে পারেন নি। যে কারণেই হোক প্রতীক-উপাসনার সঙ্গে হিন্দু-সাধনা বহুকাল ধরে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রয়েছে। এই প্রতীক-উপাসনাকে কোনো কোনো হিন্দু–সাধক অপকৃষ্ট সাধনা জ্ঞান করেছেন; কিন্তু এটি সে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য (অথবা— জীবনের জন্য) হানিকর এমন নির্মম কথা রামমোহনের মতো এতখানি জোর দিয়ে আর কোনো হিন্দু-সাধক বলেছেন মনে হয় না। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের "ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা" গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে, রামমোহনের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে শিবনারায়ণী সম্প্রদায় বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ছিলেন; কিন্তু এ রকম প্রতীক উপাসনার বিরোধী একেশ্বরবাদী-দল হিন্দু-সমাজে এত কম যে এঁদের গণনার ভিতরে না আনলেও চলে। প্রতীক-উপাসনার প্রতি এরূপ বিরূপতার জন্যই যে রামমোহন তাঁর সমকালে তাঁর স্বসম্প্রদায়ের দ্বারা তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন ও বর্তমান কালেও অনেকখানি অবহেলিত হচ্ছেন এ সত্য। এর সঙ্গে তাঁর অপ্রিয় হবার আর একটি বড় কারণ হচ্ছে— তাঁর বেশভূষা হিন্দুর চিরপরিচিত চিরশ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীর বেশভূষা নয়। রামমোহন তাঁর বেশভূষা ও আহারাদি প্রবলভাবেই সমর্থন করেছেন, তিনি তাঁদের বোঝাতে চেয়েছেন— সুরুচিপূর্ণ বেশ মানুষের জন্য বাঞ্ছনীয়, আর মাংস-আহারাদির দ্বারা তাঁদের নষ্ট বীর্যের পুনরুদ্ধার হতে পারবে।

রামমোহনের হিন্দু-সাধনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষিতদেরও তেমন শ্রদ্ধার বস্তু হয় নি হিন্দু-সাধনা সম্বন্ধে পরমহংস রামকৃষ্ণের সিদ্ধান্তের ফলে। তাঁর সুবিখ্যাত বাণী "যত মত তত পথ" দেশের লোকদের অনেক বেশি স্বস্তি দিয়েছে রামমোহনের "লোকশ্রেয় ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত শাস্ত্র" এই মন্ত্র থেকে। আর "যত মত তত পথ" বাণীতে দেশের লোক শুধু স্বস্তিলাভই করে নি, একালের কোনো কোনো শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল, যেমন ফরাসী ভাবুক রোমাঁ রোলাঁ ও ভারতের স্বনামধন্য মহাত্মা গান্ধী, এই বাণীকে বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী বলে' মত প্রকাশ করেছেন। এ সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁর যুক্তি এই :

I have never seen anything fresher or more potent in the religious spirit of all ages than this enfolding of all the Gods existing in humanity, of all the faces of truth, of the entire body of human Dreams, in the heart and the brain, in the Paramahangsa's great love and

Vivekananda's strong arms. ..... But you must not suppose that this immense diversity spells anarchy and confusion..... Each note has its own part....polyphony reduced to unison with the excuse that your own part is most beautiful! Play your own part perfectly and in time, but follow with your ear the concert of the other instruments united to your own..... And this teaching condemns all spirit of propaganda, whether clerical or lay, that wishes to mould other brains on its own model (the model of its own God or of its own Non-god who is merely God in disguise).[৪২]

এই সঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধীর অভিমত উদ্ধৃত করেছেন :

"My veneration for other faiths is the same as for my own faith. Consequently the thought of conversion is impossible..... Our prayer for others ought never to be: "God, give them the light thou hast given to me!" –but "God, give the all them light and truth they need for their highest development."[৪৩]

---

৪২. পরমহংসের মহান প্রেমে ও বিবেকানন্দের বীর্যে যেমন মিলন ঘটেছে বিশ্বমানবের সমস্ত উপাস্য দেবতার, সত্যের সর্ববিধ প্রকাশের, মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমস্ত কল্প-রূপের, যুগযুগান্তের ধর্মভাবের ইতিহাসে এর চাইতে সজীবতর ও সতেজতর কোনো কিছু আমার চোখে পড়ে নি।.... কিন্তু একথা মনে করবার হেতু নেই যে এই বিরাট বৈচিত্র্য একটি বিরাট অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা মাত্র। .... এই সুর-সামঞ্জস্যের প্রত্যেক সুরেরই বিশিষ্ট স্থান আছে। কোনো সুর-সমষ্টিকেই এই বলে নীরব করে দেওয়া চলবে না (তাতে বহুসুর পরিণত হবে একসুরে) যে, কোনো একজনের বাজানো সুর সব চাইতে ভাল। যার যা বাজাবার তা চমৎকার করে' বাজাক, কিন্তু তার সেই সুরের সঙ্গে অন্যান্য যে-সব সুরের সঙ্গত হচ্ছে তা সে কান পেতে শুনুক। .... এই মতে সর্বপ্রকার প্রচারব্রত—তা ধর্ম-বিষয়ক হোক বা কোনো জাগতিক বিষয়ক হোক— নিন্দনীয়; কেননা এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যের বুদ্ধি-বিচার নিজেদের ছাঁচে গড়া। এক্ষেত্রে সেশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদী দুইই তুল্যমূল্য -নিরীশ্বরবাদ ছদ্মবেশী সেশ্বরবাদ মাত্র।

৪৩. স্ব-ধর্মের প্রতি আমার যে-শ্রদ্ধা পর-ধর্মেরও প্রতি আমার সেই শ্রদ্ধা। সেই জন্য ধর্মান্তরগ্রহণ আমার চিন্তায় অসম্ভব। আমরা যেন অন্যের জন্য এই প্রার্থনা না করি– ভগবান আমাকে যে আলোক তুমি দান করেছ সে-আলোক তুমি তাদের দাও; এর পরিবর্তে আমাদের প্রার্থনা যেন এই হয়– ভগবান শ্রেষ্ঠ পরিণতির জন্য যার যে-আলোক ও যে-সত্যের প্রয়োজন তুমি সেই সব তাকে দাও।

মানুষে মানুষে মৈত্রীকামী রোলাঁ ও গান্ধী যে গভীর বেদনা থেকে এসব কথা বলেছেন তা বুঝতে পারা কষ্টসাধ্য নয়। রোলাঁ স্পষ্টই বলেছেন—

At this stage of human evolution where in both blind and conscious forces are driving all natures to draw together for "Co-operation or death", it is absolutely essential that the human consciousness should be impregnated with it until this indispensable principle becomes an axiom: that every faith has an equal right to live, and that there is and equal duty incumbent upon every man to respect that which his neighbour respects. (Life and Gospel of Vivekananda, p. 353°55).[৪৪]

কিন্তু উদ্দেশ্য সাধু হলেই সব সময়ে যে কার্যসিদ্ধ হয় তা নয়। মানুষে মানুষে যে-মৈত্রীর কামনা করে' এই সব মনীষী এই ব্যবস্থা সমীচীন মনে করেছেন এর প্রবর্তনের ফলে সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কি না, অথবা মানুষের জন্য এই ব্যবস্থা সত্যতার প্রয়োজন আছে কি না, সে-সবও বিচার্য।

ধর্ম যদি ললিত কলার মতো মুখ্যত মানস ব্যাপার হতো তাহলে জগতের সমস্ত ধর্মকে এমন পরম আদরে সঞ্জীবিত রাখবার চেষ্টা হতো মানুষের সভ্যতার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু সাধারণত জীবনে ও ললিতকলায় যে প্রভেদ, ধর্মে ও ললিতকলায়ও সেই প্রভেদ। ধর্ম ও জীবনের অভেদত্বের কারণ, ধর্ম একই সঙ্গে জীবনের নিয়ামক ও জীবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু ললিতকলাকে তেমনিভাবে জীবনের নিয়ামক বলা যায় না। জীবন অস্থির অপূর্ণাঙ্গ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল; ললিতকলা অচঞ্চল, পূর্ণাঙ্গ, সৌন্দর্য-লোকে অবিশ্বর; জীবন সত্য ললিতকলা স্বপ্ন। ধর্ম কখনো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের অথবা ব্যক্তি বিশেষের এমন মানস ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু সেটি স্বাভাবিক বা সাধারণ ব্যাপার নয়। স্বভাবত ধর্ম মানুষের মানস ব্যাপার ও রাজনৈতিক ব্যাপারে যেমন পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অসম্ভব ও অসত্য, ধর্মের ব্যাপারেও তেমনি নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য অবাঞ্ছিত, তাতে ধর্মের যে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য—মানুষের বৃহত্তর সমাজ-জীবনে কল্যাণের আয়োজন—তাইই ব্যাহত হয়। মানুষের

---

৪৪. মানব-সমাজে ক্রম-অভিব্যক্তির এই অবস্থায় অন্ধ ও সচেতন শক্তি দুইই সমস্ত প্রকৃতির মানুষকে একত্র করেছে "সহযোগিতার জন্য অথবা ধ্বংসের জন্য" এ সময়ে শ্রেষ্ঠতম প্রয়োজন হচ্ছে মানবের অন্তর্লোকে এই আবির্ভাব ঘটা— প্রত্যেক ধর্মেরই বেঁচে থাকবার তুল্য অধিকার আছে, আর প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে তার প্রতিবেশীর ধর্ম-বিশ্বাস শ্রদ্ধা করে চলা। এটিকে একটি স্বতঃসিদ্ধান্তরূপে পরিণতি করা চাই।

বয়স কম হয়নি, অভিজ্ঞতাও কম হয় নি। সেই অভিজ্ঞতার ফলে আজ এ কথা সে বুঝেছে যে জ্ঞান ও সত্যের অভিমানের মতো বিড়ম্বনা আর নেই। কিন্তু এই নূতন জ্ঞান লাভ করে' সে যদি ধর্মে ধর্মে Laissez-faire[৪৫] নীতি অবলম্বন করে তা'হলেও কম ভুল সে করবে না। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের চিত্ত বিকশিত হয়। তার কর্মজীবনও বিকশিত হয়। এই ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়েই বিরাট জগতের সাহচর্য যে তার লাভ হয়, সেটি তার জন্য অমূল্য। রোঁলা ও গান্ধীর এই নূতন ব্যবস্থার যে শান্তি ও স্বস্তি, লোক-সমাজে সতেজ ও সন্ধান-তৎপর মানসিকতা সৃষ্টির সহায়ক না হবার সম্ভাবনাই তার বেশি।

হয়ত বলা হবে, অন্তত বিভিন্ন জাতীয় বা সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা তো চাইই, নইলে মানুষ পরস্পরকে চিনবে ও বুঝবে কেমন করে? এই চিন্তা-ধারার মূলেও রয়েছে একটি বড় ভুল— অতীত ও কতকাংশে বর্তমানকে এ ক্ষেত্রে মনে করা হচ্ছে চিরকালের পরিচায়ক বলে'। অতীতে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন দুর্লঙ্ঘ্য ভৌগোলিক ক্ষেত্রে লালিত হয়েছিল। কতকটা সেই ব্যবধানের প্রভাবে তাদের স্বাতন্ত্র্য হতে পেরেছিল সুস্পষ্ট। কিন্তু আজ সে-ব্যবধান চূর্ণ হবার পথে দাঁড়িয়েছে, মানুষের কৌতূহলও বর্ধিত হয়ে চলেছে, জাতিতে জাতিতে আন্তর ও বাহ্য স্বাতন্ত্র তাই পরস্পরের অজ্ঞাতসারেও নিশ্চিহ্ন হবার পথে চলেছে। মানব সভ্যতার এই এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও যদি বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য বা type এর কথাই ভাবা হয়, তাহলে ভাবনার পরিচয় যা দেওয়া হয় তার চাইতে বেশি পরিচয় দেওয়া হয় অতীত প্রীতির। কোনো কোনো চিন্তাশীল ভবিষ্যৎ মানবসমাজের একাকারত্বের কথা ভেবে আনন্দ পান না এই ধারণা থেকে যে তেমন একাকারত্বে হবে বর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন, সুতরাং অসুন্দর। কিন্তু কত অনাবশ্যক ও অর্থহীন বৈশিষ্ট্যের শৃঙ্খলে এখনো মানুষ বন্দী, এখনো কত অবিকশিত তার সৃষ্টিশক্তি, এ চিন্তা মনে স্থান দিতে পারলে সেই বর্ণ ও বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য্যের কথা ভেবেই তাঁরা আহ্লাদিত হবেন।

ধর্ম জ্ঞানেরই প্রকার-ভেদ, এই কথাটি তেমন স্পষ্টভাবে মনে না রাখার ফলেই ধর্ম সমস্যা মানুষের জন্য এমন অশোভন ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যুগ যুগ ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের, অন্য কথায়, প্রত্যয়ীভূত জ্ঞানেরও, উৎকর্ষ লাভ হয়েছে। একালে ধর্মের উপরে

---

৪৫. Laissez-faire (Let alone)—যে যার পথে চলুক। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই নীতির প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই নীতির সমর্থিত ব্যক্তিত্ববাদ অচিরেই সমষ্টি-বাদের দ্বারা পরাভূত হয়।

বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির প্রভাবও সেই একই সত্যের পানে অঙ্গলি নির্দেশ করছে। জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে যেমন অপ্রতিহত সন্ধানপরতা ও কল্যাণের আয়োজন ভিন্ন আর কোনো দিকে লক্ষ্য রাখলে শেষ পর্যন্ত বিড়ম্বিতই হতে হয়, ধর্মের ব্যাপারেও তেমনি সত্য ও কল্যাণ জিজ্ঞাসাকে কিছুমাত্র শিথিল করবার প্রয়োজন আছে তা মনে হয় না। রামকৃষ্ণ ও গান্ধীর কর্মজীবনের দিকে চাইলে দেখা যায় তাঁরাও যথাসম্ভব অভিমান বিবর্জিত হয়ে তাঁদের আবিষ্কৃত সত্যপথ অনুসরণ করে চলেছেন, তাতে অন্যের অন্তরে কতখানি বেদনা বাজলো সেটি তাঁদের চিন্তার মুখ্য বিষয় নয়।

তাই মনে হয় মানব-সভ্যতার নব সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পেরে রামমোহন যে তাঁর দেশবাসীকে অতীত বা বর্তমান-প্রীতির পরিবর্তে লোকশ্রেয়ঃ ও বিচারবুদ্ধির মন্ত্র দান করেছিলেন, সে-মন্ত্রের যথাযোগ্য সমাদার হয় নি সেই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত কোনো ত্রুটির জন্য নয়— তাঁর দেশবাসীর সত্যপ্রীতির ও বৃহত্তর দেশের কল্যাণকামনার অভাবের জন্যই।

রামমোহনের হিন্দুশাস্ত্র-বিচারে এত চমৎকারিত্ব রয়েছে, পাণ্ডিত্য ও বিচার-বুদ্ধির এমন স্ফুরণ সেখানে হয়েছে যে সে-সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীর তেমন কৌতূহল না থাকা তার মনন-শক্তির উৎকর্ষের পরিচায়ক হয়ত নয়। এই সব বিচারে তাঁর কোনো কোনো শাস্ত্র-ব্যাখ্যা খুবই নূতন, যেমন গীতার এই সুবিখ্যাত শ্লোকের ব্যাখ্যা—

> ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম।
> যোজয়েৎ কর্মকর্মানি বিদ্বান যুক্তঃ সমাচরন।

গীতার গান্ধীভাষ্যে এর অর্থ লেখা হয়েছে এই : "কর্মে আসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তির বুদ্ধিকে জ্ঞানী যেন ওলট পালট না করে, বরঞ্চ সমত্ব রক্ষাপূর্বক ভাল রকমে কর্ম করিয়া তাহাকে যে সর্ব কর্মে প্রেরণা দেয়"। —এইটি এর প্রচলিত ব্যাখ্যা, আর ব্যাখ্যার দ্বারা প্রচলিত আচারপদ্ধতি (প্রতিমাপূজা ইত্যাদি) মান্য করতে বলা হয়। রামমোহন এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই :

"জ্ঞানবান ব্যক্তি আপনি কর্ম করিয়া অজ্ঞানী কর্মসঙ্গিকে কর্মে প্রবর্তক হইবেন, যেহেতু জ্ঞানির নিষ্কাম কর্ম দেখিয়া অজ্ঞানীও সেই প্রকার কর্ম করিবেক। সুতরাং জ্ঞানির কদাপি কাম্য কর্মে অধিকার নাই তাঁর নিষ্কাম কর্ম দেখিয়া অজ্ঞানীও চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম করিবেক। কর্ম-সঙ্গিদের কি প্রকার কর্ম কর্তব্য তাহা ভুরি স্থানে ঐ গীতাতে লিখিয়াছেন। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচান। .... যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অর্থাৎ ফল কামনা করিয়া কর্ম করিলে সে কর্ম দ্বারা লোক বন্ধন প্রাপ্ত হয়। এবং স্মার্তধৃত মষ্টকক্ষ বচন। .... "স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্মহি। ন রাতি রোগিণে পথ্যম বাঞ্ছতেপি ভিষকত্তমঃ। আপনি জ্ঞানবান ব্যক্তি অজ্ঞানকে সকাম কর্ম করিতে উপদেশ করেন না, যেমন রোগী মনুষ্য কুপথ্য প্রার্থনা করিলেও উত্তম বৈদ্য কুপথ্য দেন না।" (গ্রন্থাবলী—পৃষ্ঠা ২১৫)

রামমোহন ও খ্রিষ্টধর্ম

রামমোহন তাঁর Precepts of Jesus- a guide to peace and happiness- এর ভূমিকায় বলেছেন, খ্রিষ্টের এই যে উপদেশ, অন্যের প্রতি তেমন আচরণ কর যেমন আচরণ তুমি প্রত্যাশা কর, মানুষের নৈতিক জীবন গঠনের সহায়ক এমন পূর্ণাঙ্গ উপদেশ তিনি আর কোনো ধর্মগ্রন্থে পান নি। ধর্মশাস্ত্র হিসাবে বাইবেলের স্থান তাই অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের চেয়ে উচ্চে তিনি নির্দেশ করেছেন। কিন্তু তাঁর সেই বাইবেল ত্রিত্ববাদ, খ্রিষ্টের রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, ইত্যাদি দুর্জ্ঞেয়-তত্ত্ব বিবর্জিত বাইবেল। বলা বাহুল্য বাইবেলের এই ধরনের ভক্তের প্রতি বাইবেলের ভক্ত সাধারণের সন্তুষ্ট হওয়া অসম্ভব। খ্রিষ্টান সমাজের এই অসন্তোষের ফলেই বাইবেলের প্রকৃত শিক্ষা নির্ণয়ে তিনি দীর্ঘ তিন বৎসর কাল সুকঠোর পরিশ্রম করেন। তিনখানি সুবিস্তৃত গ্রীক ও-হিব্রুবচন কন্টকিত Appeal to Christian Public তাঁর এই কঠোর পরিশ্রমের ফল। তাঁর এই পাণ্ডিত্য দর্শনে তৎকালীন খ্রিষ্টান-জগত চমকিত হয়েছিলেন।

আধুনিক খ্রিষ্টান-জগত তাঁর এই খ্রিষ্টানশাস্ত্র বিচারের কি মূল্য দেন দুর্ভাগ্যক্রমে সে-বিষয়ে কিছু জানি না। কিন্তু তাঁর দেশবাসীর কাছে এর মূল্য কম হওয়া উচিত নয়। তাঁর এই খ্রিষ্টানশাস্ত্র-বিচারের ভিতর দিয়ে এই কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে পরস্পরের প্রতি প্রেমপূর্ণ জীবনকেই তিনি কাম্যজীবন জ্ঞান করতেন।

রামমোহন সাধনা

রামমোহনের খ্রিষ্টান-শাস্ত্রের বিচারে দেখা যায়, তিনি নিজেকে খ্রিষ্ট-অনুবর্তী বলে প্রচার করেছেন। তাঁর তুহফাতুল, মুওহহিদীন গ্রন্থে কিন্তু দেখা যায়, তিনি "ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ" "প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ" এসবের কিছুই মানেন নি। এজন্য তাঁর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা প্রায় একমত যে প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একান্ত যুক্তিবাদী, কিন্তু পরে তাঁর সেই শাস্ত্রনিরপেক্ষ স্বাধীন যুক্তিবাদ ধর্মাশ্রিত যুক্তিবাদে পরিণত হয়েছিল; আর মানুষের জন্য এই ধর্মাশ্রিত যুক্তিবাদই তিনি কাম্য জ্ঞান করতেন।

কিন্তু রামমোহন সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত কিনা সে-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবার অবসর আছে। তাঁর হিন্দুশাস্ত্রের বিচারেও দেখা যায়, তিনি নিজেকে শাস্ত্রানুগামী হিন্দু বলে প্রচার করেছেন ও সেইভাবে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেদান্ত আশ্রয় করে হিন্দুর জন্য প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞান অপাহরণের চেষ্টা করেছেন। অথচ তাঁর লর্ড আমহার্স্টকে তিনি যে পত্র লেখেন তাতে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভের দুরূহতার কথা বলেছেন, আর বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায় প্রভৃতির শিক্ষাকে বেশ উপহাস করেছেন।

বলা যেতে পারে, বেদান্ত মীমাংসা ন্যায় প্রভৃতি প্রচলিত ব্যাখ্যাতে তিনি উপহাস করেছেন, প্রকৃত বেদান্ত মীমাংসা ও ন্যায়কে নয়; তাহলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত মধ্যযুগীয় জ্ঞানচর্চার চাইতে ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান-দর্শন চর্চাকে তিনি বেশি মর্যাদা দিয়েছেন। বাইবেলের প্রতি তাঁর কিছু বেশি শ্রদ্ধা থাকলেও এর আলোচনাকালেও তাঁর যুক্তিবাদ বাস্তবিকই যে শিথিল হয়নি তার প্রমাণস্বরূপ এই কয়েকটি কথার উল্লেখ করা যেতে পারে : প্রথমত Precepts of Jesus- a guide to peace and happiness গ্রন্থখানি তিনি বাইবেল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে এই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব বিবর্জিত সহজ সরল উপদেশ মালায় বিধাতা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা উন্নততর হবে ও তাদের একের অন্যের প্রতি ও সমাজের প্রতি ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত হবে; তাঁর তুহফাতুল মুওহহিদীন গ্রন্থে বিচার বুদ্ধির কার্য-কারিতা সম্বন্ধেও তিনি এই ধরনের কথা বলেছেন যথা,-সব ধর্ম আত্মা ও পরকালের বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত; যদিও এই দুয়ের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় তবু এতে বিশ্বাস তেমন দোর্ষাহ নয় কেননা মানুষ দুষ্কর্ম থেকে নিরস্ত থাকে পরলোকের ভয়ে ও রাজভয়ে। কিন্তু এই দুই প্রয়োজনীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পান আহার পবিত্রতা শুভ অশুভ ইত্যাদি বিষয়ে শত শত অকল্যাণকর ও বুদ্ধিমানকর বিশ্বাস সম্মিলিত হয়েছে, ও তাতে মানুষের দুঃখ বেড়ে গেছে। তবু মানুষের অন্তরে এই শক্তি নিহিত আছে যে এই সব বিশ্বাস সত্ত্বেও সে যদি নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন জাতির ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয় তাহলে কি সত্য আর কিইবা অসত্য, তা সে নিরূপণ করতে পারবে আশা করা যায়; ও এইভাবে অর্থহীন ধর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এক অদ্বিতীয় মঙ্গলবিধাতার প্রতি ও সমাজকল্যাণের প্রতি মনোযোগী হতে পারবে। দ্বিতীয়ত— রামমোহনের প্রতিপক্ষ এই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, খ্রিস্টধর্মের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বসমূহে বিশ্বাসী না হয়ে প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসী হওয়া যায় না; রামমোহন দেখিয়েছিলেন, খ্রিস্টের ভিতরে যা কিছু অলৌকিক বা অসাধারণ সব ঈশ্বর প্রসাদে, তাঁর একান্ত নির্ভর ঈশ্বরের উপরে, আর বাইবেল থেকেই প্রমাণ করা যায় যে ঈশ্বরের সমস্ত আদেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের পরস্পরের প্রতি কি কর্তব্য তাই শিক্ষা দেওয়া।

তাই আমাদের বলতে ইচ্ছা হয়, তুহফাতুল মুওহহিদীন গ্রন্থে রামমোহন যে অলৌকিকতা নিরপেক্ষ একেশ্বরতত্ত্বে ও লোকশ্রেয়বাদে উপনীত হয়েছিলেন পরে এই মতের কোনো বিশেষ পরিবর্তন তাঁর ভিতরে ঘটে নি। যাঁরা এই পরিবর্তন দেখবার জন্য উৎকণ্ঠিত তাঁরা বোধ হয় এই অদ্ভুত ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন নি, তুহফাতুল মুওহহিদীন গ্রন্থেও রামমোহন একদিকে যেমন প্রখরযুক্তিবাদী অন্যদিকে তেমনি সহজভাবে ঈশ্বরানুরাগী ও মানব-কল্যাণকামী।

বিলাতগমনের পূর্বে রামমোহন Unitarian (ঈশ্বরের একত্ব-বাদী) খ্রিস্টানদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ও ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টানদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু ইংল্যান্ড গমনের পরে উভয় শ্রেণীর খ্রিস্টানদের সঙ্গে তিনি আলাপ আলোচনা করেন ও উভয় দলেই তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু লাভ হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে কোনো কোনো ধর্মযাজক মত প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি ত্রিত্ববাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন এবং আরো কিছুকাল বেঁচে থাকলে ত্রিত্ববাদ পূর্ণভাবেই গ্রহণ করতেন। মিস্ কলেট— লিখিত জীবনীর সম্পাদক এসব কথা গণ্য করেন নি। তবে তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন যে রামমোহনের ভিতরে ধর্ম ব্যাকুলতা চিরদিনই অত্যন্ত প্রবল ছিল; সেই ব্যাকুলতার বশে প্রথম জীবনে তিনি স্বাধীন যুক্তিবাদ গ্রহণ করেন ও পরবর্তী জীবনে যুক্তিবাদের অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করে' "ধর্মবিশ্বাসে"র দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই মতের স্বপক্ষে তিনি এই প্রমাণটি দিয়েছেন: রামমোহন তাঁর সর্বশেষ রচনায় উচ্চশ্রেণীর ইয়োরোপীয়দের ভারতে বসতিস্থাপন সমর্থন করেন। এই বসতি স্থাপনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু তর্ক উত্থাপন করেন, সে-সবের একটি এই উচ্চশ্রেণীর ইয়োরোপীয়দের ভারতে বসতি স্থাপনের ফলে ও তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ভারতবাসীর যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা; এই উন্নত ভারতবাসীরা ও ইয়োরোপীয়েরা সম্মিলিত হয়ে ব্রিটিশের সহিত সম্বন্ধ ছেদন করতেও পারেন; তাহলেও তাঁদের ভিতরে বাণিজ্য-সম্পর্ক থাকবে ও এই নব-আলোকপ্রাপ্ত ভারতবর্ষ এশিয়ার শিক্ষাগুরু হবে। রামমোহনের মূল বক্তব্য এই :

Americans were driven to rebellion by misgovernment ..... The mixed community of India, so long as they are treated liberally and governed in an enlightened manner, will feel no inclination to cut off its connection with England.....yet if events should occur to effect a separation, still a friendly and highly advantageous commercial connection may be kept up between two free and Christian countries, united as they will be by resemblance of language, religion and manners.[৪৬]

---

৪৬. আমেরিকা-বাসীরা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিল কুশাসনের ফলে। .... ভারতের এই মিশ্রিত জাতি যতদিন সদয় ব্যবহার ও উদার শাসন লাভ করবে ততদিন তারা ইংল্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন করবার কোনো প্রয়োজন অনুভব করবে না। ..... ঘটনাক্রমে সম্পর্ক যদি ছিন্নই হয় তবু এই দুই স্বাধীন ও খ্রিস্টান দেশের মধ্যে বন্ধুভাব ও পরস্পরের কল্যাণ সাপেক্ষ বাণিজ্যসম্পর্ক থাকবে— ভাষা ধর্ম ও আচার-ব্যবহারের সাদৃশ্য তখন এই দুই দেশের ভিতরে যোগ রক্ষা করবে।

এখানে সম্পাদক মহাশয় এই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে রামমোহন তাঁর দেশবাসীদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হবার কথা ভেবেছেন, এটি সুসিদ্ধান্ত বলে' গ্রহণ করা যায় না কয়েকটি কারণে। প্রথমতঃ যে সমস্ত গণ্যমান্য ইয়োরোপীয় ভারতবর্ষে বসতিস্থাপন করবেন তাঁরা খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ও ভারতের শ্রেষ্ঠ অধিবাসী হবেন, তাঁদের অধ্যুষিত ভারতবর্ষকে রামমোহন খ্রিস্টান ভারতবর্ষ বলতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর প্রিয় খ্রিস্টান নীতির Do unto others as you like to be done by দ্বারা প্রভান্বিত ভারতবর্ষকে তিনি খ্রিস্টান-ভারত বলতে পারেন। তৃতীয়তঃ তাঁর দেশবাসীরা সোজাসুজি যিশুর উন্নতর ধর্মে দীক্ষিত হবে এ চিন্তা রামমোহনের জন্য একান্ত অপ্রীতিকর হয়ত ছিল না কেননা কোনো রকমে তাঁর দেশবাসীর ভালোর দিকে একটু পরিবর্তন হোক এ কামনা তিনি করতেন, তবু এই চিন্তা যে তাঁর খুব প্রীতিকরও ছিল না তা বুঝতে পারা যায় আমেরিকার Bishop Ware কে লিখিত তাঁর এই পত্রাংশ থেকে—

I am led to believe from reason, what is set forth in the scripture, that "in every nation he that feareth God and worketh righteousness is accepted with him," in whatever form of worship he may have been taught to glorify God.[৪৭]

Bishop Ware কে লিখিত এই পত্রে আরো একটি লক্ষ্য করবার কথা আছে। রামমোহনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ভারতে খ্রিস্টধর্মের প্রসারের সম্ভাবনা কিরূপ; তাতে তিনি শেষ পর্যন্ত এই উত্তর দেন বিজ্ঞান ইংরেজি সাহিত্য ও ধর্ম-নিরপেক্ষ সুনীতি শিক্ষার আয়োজন যদি এদেশবাসীর জন্য তাঁরা করতে পারেন তবে সেই ভাবেই তাঁরা এদেশবাসীর মনকে খ্রিস্ট-ধর্ম গ্রহণের উপযুক্ত করতে পারেন।

এই থেকে রামমোহনের সংস্কার চেষ্টার অথবা সমগ্র সাধনার স্বরূপ জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হবার প্রয়োজন হয়। এই সম্পর্কে তাঁর সাধনার দুইজন শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী, রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ, যে মত প্রকাশ করেছেন তার মর্যাদা নিরূপণ প্রথমেই কর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিশ্বমানবের একত্ববোধ তাঁর সমকালে জগতে আর কারো ভিতরে এমন পূর্ণভাবে দেখা যায় না। বর্তমান জগৎ সহযোগিতার জগৎ, স্বদেশের প্রাচীন অবিনশ্বর যা-কিছু, তা আয়ত্ত করে' অন্যান্য সাধনার দিকে তিনি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই সকল কথার প্রমাণ

---

৪৭. (খ্রিস্টান) শাস্ত্রে এ-কথা আছে, আর বুদ্ধির সাহায্যেও আমি এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি, যে, প্রত্যেক জাতির ভিতরে যারা ঈশ্বরের ভয় রাখে ও ধর্ম আচরণ করে তারা তাঁর (যীশুর) করুণা লাভ করে, তা যে-ভাবেই তারা ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে শিখুক।

রামমোহনের বিরাট সাধনার ভিতরে নিশ্চয়ই আছে— যদিও রামমোহনের সমকালে শুধু তাঁকেই বিশ্বমানবের একত্ববোধের পূর্ণ অধিকারী বলে ভাবতে আমাদের কিছু আপত্তি, কেননা রামমোহনের সমকালে, অথবা কিছু পূর্বে, মহামনীষী গ্যেটের আবির্ভাব; নবযৌবনেই তিনি নিজেকে বলেছিলেন Welt-kind (বিশ্বসন্তান); আর পরিণত বয়সে তাঁর বিশ্বমানবতার পরিপূর্ণ বোধ সুবিদিত। তবু যিনি দূর স্পেনের জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার লাভে উল্লসিত হয়ে নিজ-ব্যয়ে এক বড় উৎসবের আয়োজন করেছিলেন, ও Neples-এর পরাধীনতা-দুঃখের অবসান হয়নি জানতে পেরে জগতের অত্যাচারীদের উদ্দেশ্যে এই অভিসম্পাত উচ্চারণ করেছিলেন—

I consider the cause of the Neapolitans as my own and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotims have never been, and never will be, ultimately successful.[৪৮]

মানুষের সঙ্গে তাঁর এই সহজ যোগ জাতিতে জাতিতে সহযোগিতার যোগের চাইতে নিবিড়তর বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

রামমোহনের সাধনার স্বরূপ-নির্দেশ সম্পর্কে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের মন্তব্য পরম হৃদয়গ্রাহী, কল্পনার সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। তিনি রামমোহনকে দাঁড় করিয়েছেন জগতের বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মর্মোদ্‌ঘাটক রূপে। তাঁর মতে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতা হচ্ছে বিশ্বজনীনতার এক একটি রূপ, এর কোনটি মিথ্যা নয়, কিন্তু প্রত্যেকটির লক্ষ্য হওয়া উচিত তার সর্বোচ্চ পরিণতির দিকে। বিভিন্ন ধর্ম-শাস্ত্রের আলোচনা করে রামমোহন তাদের সেই সর্বোচ্চ পরিণতির পথ সুগম করতে চেষ্টা করেছেন।—কিছু ভিন্ন বেশে এই চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের আগেই পরিচয় হয়েছে। এই চিন্তাধারা দার্শনিকপ্রবর রাধাকৃষ্ণনের লেখনীতে রূপ পেয়েছে এইভাবে—

.... If we believe that every type means something final, incarnating a unique possibility, to destroy a type will be to create a void in the scheme of the world. (Hindu View of Lief).[৪৯]

---

৪৮. নেপলস-বাসীদের দুঃখ আমারও দুঃখ বলে আমি জ্ঞান করি॥ তাদের শত্রু আমাদেরও শত্রু। যারা স্বাধীনতার শত্রু ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের সমর্থক তারা কখনো সফলকাম হয়নি আর শেষ পর্যন্ত কখনো সফলকাম হবে না।—এইটি একটি পত্রাংশ। পত্রখানি বাকিংহাম সাহেবকে লেখা, তারিখ– ১১ই আগস্ট, ১৮২১।

৪৯. যদি আমরা বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক সভ্যতা হচ্ছে এক একটি চরম পরিণতি, এক অতুলনীয় সম্ভাবনা রূপ পরিগ্রহ করেছে তার ভিতরে, তবে এর একটি ধ্বংস হলে জগদবিধানে অভাব দেখা দেবে।

এই চিন্তাধারা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যও নিবেদন করতে চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্মের যে-রূপ সহজভাবে প্রতিদিন আমাদের সামনে উন্মুক্ত হচ্ছে সেই পরিচিত রূপের পানে এঁরা তাকান নি, এঁদের আলোচিত ধর্ম ভাবলোকের ব্যাপার— সেখানে কোনো type-কে পূর্ণাঙ্গ ও অবিনশ্বর ভাবলে আপত্তির কারণ তেমন ঘটে না।

এই সম্পর্কে আরো কয়েকটি কথা ভাববার আছে। আচার্য রাধাকৃষ্ণন প্রমুখ "স্বাতন্ত্র"-বাদী চিন্তাশীলেরা ভারতের জাতিভেদে দেখেছেন প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বা জাতির স্বাতন্ত্র্যরক্ষার একটি প্রয়াস। হয়ত তাঁদের এই অভিমতের মূলে সত্য আছে; কিন্তু এর ফল কি হয়েছে সেটিও বিচার্য। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বিচ্ছিন্নতা ভারতের পতনের এক বড় কারণ অনেক মনীষী এই মত ব্যক্ত করেছেন; তারপর এই বিচ্ছিন্ন বা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত অংশসমূহ যে কালে অসুন্দর বৈ সুন্দর হয় নি তার পরিচয় পাওয়া যায় রামমোহনের সমসাময়িক ব্রাহ্মণ-সমাজের জীবনে —তাঁরা পূর্বপুরুষের সাধনা বিস্মৃত হয়ে রামমোহনের উদ্ধৃত উপনিষৎ-বচনাবলী ভেবেছিলেন রামমোহনের নিজের রচিত শ্লোক বলে। আর হিন্দু সমাজের এই বিচ্ছিন্ন খণ্ডসমূহে শক্তি-তরঙ্গ খেলছে তখন যখন দয়ানন্দ বা বিবেকানন্দের মতো স্বতন্ত্র-ধ্বংসকারীর আবির্ভাব সেখানে ঘটেছে।

স্বাতন্ত্র্য-বাদের বড় অপরাধ হয়ত এই যে এর প্রভাবে মানুষে মানুষে অপরিচয়ের, সুতরাং অপ্রেমের, সৃষ্টি হয় —সৃষ্টিধর্মী কৌতূহলবৃত্তিরও খর্বতা সাধন হয়। সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যলোভীর কোনো সার্থকতা হয়ত নেই; পারশ্য সর্বপ্রকারে আরবের বশ্যতা স্বীকার করেছিল কিন্তু জগতে পারশ্যের বিলোপ-সাধন হয় নি; ব্যক্তিগত জীবনেও দেখা যায়, আমাদের মধুসূদন সর্বপ্রকারে স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বাঙালীত্ব ও মানবত্ব কিছুই পরিম্লান হয় নি— হয়ত বা উজ্জ্বলতর হয়েছে। রামমোহনকে বলা হয় প্রাচীন সত্যদৃষ্টা ঋষির যোগ্য বংশধর, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার প্রয়াস তিনি যা করেছেন তার চাইতে অনেক বেশি করেছেন স্বাতন্ত্র্য ধ্বংসের ও সর্ব অভিমানশূন্য সত্যোপলব্ধির প্রয়াস।

বাস্তবিক, হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান ইত্যাদি প্রাচীন নামে রামমোহনকে পরিচিত করতে যাওয়া অসার্থক বলেই মনে হয়। তিনি ছিলেন সহজভাবে সত্যজিজ্ঞাসু-আর জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা হয়ত এই সহজ পরিচয়েই পরিচিত। কিন্তু এই সহজ সত্য-জিজ্ঞাসার প্রেরণাও মানুষ ধর্ম-সংস্কারক সমাজ-সংস্কারক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি বহুকিছু হতে পারেন, রামমোহন এর কোন শ্রেণীর অর্ন্তগত? বলা বাহুল্য জীবন এক অখণ্ড ব্যাপার, তাই কোনো শক্তিমান একই সঙ্গে ধর্ম-সংস্কারক সমাজ-সংস্কারক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হতে পারেন। তবু বিশেষ বিশেষ দিকে শক্তিমানদের প্রবণতা দেখা যায়— রামমোহনের প্রবণতা কোন্ দিকে?

ইতিহাসে রামমোহনের পরিচয় এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা রূপে, যদিও তিনি নিজে বার বার বলেছেন কোনো নূতন ধর্মমতের প্রর্বতক তিনি নন। কিন্তু চিন্তাশীল মাত্রেই নূতন কিছুর প্রবর্তক, কেননা জগৎ চিরনূতন, কাজেই তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে এক নূতন মতের প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে। একালের অনেক শিক্ষিত বাঙালীর অভিমত, রামমোহনকে ধার্মিক পুরুষরূপে না দেখে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাশালী সমাজ-সংস্কারক রূপে দেখাই সঙ্গত; কেননা, তাঁদের মতে, ধর্মভাবের যে মূল কথা বিশ্বাতীত কোনো শক্তিতে একান্ত আত্মসমর্পণ, সেই অহমিকাপরিশূন্য আত্মসমর্পণ তাঁর বিচিত্রবাদ-প্রতিবাদের ভিতরে ভিতরে দুর্লভ। কিন্তু এই অভিমত তেমন মূল্যবান নয় বলেই মনে হয় কেননা রামমোহনের সমস্ত বাদ-প্রতিবাদের উৎস-স্বরূপ যে অবিচলিত মানবকল্যাণ-বোধ তার প্রতি এর দৃষ্টি নেই। রামমোহনের নিজের এই মন্তব্যটিও এই সম্পর্কে স্মরণীয়— "ধর্ম যদি ঈশ্বরের', রাজনীতি তবে কি শয়তানের?"

যে-সম্প্রদায়ের তিনি নেতা তাকে বর্তমানে একটি ভক্ত-সম্প্রদায় বলা চলে; কিন্তু ধর্মজীবন সম্বন্ধে রামমোহনের নিজের ধারণা অনেক ব্যাপক, অভিনবত্বও তাতে কম নয়। প্রথমতঃ একটি বিশেষ ধর্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব উদ্ভাবনের দিকে তাঁর দৃষ্টি বেশ কম। সত্য বটে, তিনি এক নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনার কথা বলেছিলেন ও নাস্তিকতার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এ সব বিষয়ে অনাবশ্যকভাবে ব্যস্ত তিনি ছিলেন না তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই দুইটি ব্যাপার থেকে ঃ হিন্দুসমাজের পৌত্তলিকতার তিনি বিরোধী হয়েছিলেন কেননা তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল—

Hindu Idolatry, more than any other pagan worship, destroys the texture of Society (Introduction to the Vedanta):[৫০]

কিন্তু যখন তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা বলেছিলেন তাঁরা প্রকৃতই মূর্তিপূজা করেন না, মূর্তির ব্যাপদেশে ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণের পূজা করেন, রামমোহন তাঁদের এই উক্তি যথার্থ বলে স্বীকার করেন নি, তবু বলেছিলেন, হিন্দু-সমাজের লোকেরা মূর্তিপূজার যে এমন রূপক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করেছেন এ শুভ লক্ষণ। আর বিলাতে গমন করে ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টানদের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশেছিলেন তার কারণ মনে হয় এরূপ ধর্মবিশ্বাস সত্ত্বেও তাঁদের সমগ্র জীবনের উৎকর্ষ। দ্বিতীয়তঃ সুফীমত,

---

৫০. অন্যান্য পদ্ধতির প্রতীক-উপাসনার চাইতে হিন্দু-পৌত্তলিকতা সমাজ-বিধানের সমধিক ক্ষতিকর।

যোগ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মসাধন-প্রণালী তিনি ব্যবহার করেছিলেন দেহ ও মনের উৎকর্ষ বিধানের উপাদান রূপে। কিন্তু সেই উৎকর্ষ-সমন্বিত দেহমনের ব্যবহার করেছিলেন জ্ঞানান্বেষণে ও মানব সেবায়, অর্থাৎ তাঁর চারপাশের লোকদের দৈনন্দিন জীবনের উন্নতি বিধানে। এদেশের প্রাচীন অকল্যাণকর প্রথা-সমূহের বিলোপ- সাধন উন্নতর শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, অত্যাচারিত কৃষকদের আর্থিক স্বাচ্ছল্যবিধান, দেশের সর্বসাধারণের জন্য উন্নততর বিচার ব্যবস্থার প্রচলন, ইত্যাদি বিষয়ে রামমোহনের অশেষ প্রয়াসের কথা সুবিদিত। শুধু দুঃখ এই, এই প্রাণপ্রদ চিরন্তন ধর্ম-ভাগ্যবান জাতির লোকেরা যার মর্যাদা উপলব্ধি করতে প্রায়ই ভুল করেন না— আমাদের দেশের ভাবুক ও কর্মীদের যথাযোগ্য অনুধাবনের বিষয় হয়েছে এ কদাচিৎ।

গ্যেটে সম্বন্ধে ক্রোচে বলেছেন, অল্প বয়সেই তাঁর চিত্তের আশ্চর্য বিকাশ সাধন হয়েছিল, আর আমৃত্যু তা অক্ষুণ্ন ছিল। রামমোহন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তাঁর যৌবনের তুহফাতুল মুওহ্হিদীন গ্রন্থেই তাঁর মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর বিভিন্ন ধর্মের আলোচনাকে গণ্য করা যেতে পারে মানুষের বিচারবুদ্ধিকে সমস্ত বক্রতা থেকে উদ্ধার করে ঋজু করাবার প্রয়াস রূপে। "তুহফাতুল মুওহ্হিদীন" এর মস্তিষ্ক ও বিভিন্ন জনহিত-প্রচেষ্টার মানব-প্রেম ও কর্মশক্তি-রামমোহনের প্রতিভার মর্যাদা এ-সব ক্ষেত্রে অন্বেষণ না করলে তাঁর প্রতি অবিচার করার সম্ভাবনাই বেশি।

রামমোহন শতবার্ষিকী—ঢাকা।

সুবিখ্যাত দার্শনিক ক্রোচে গ্যেটে সম্বন্ধে যে বইটি লিখেছেন তাতে গ্যেটের মনীষা ও কাব্য সম্বন্ধে নানা বিচার বিশ্লেষণের পর বলেছেন— সাহিত্যের ক্রমবর্ধনের ধারায় গ্যেটের স্থান কি তা নির্দেশ করতে তিনি অক্ষম। বলা বাহুল্য, এ অক্ষমতার অন্য নাম আপত্তি, কারণ তাঁর মতে— প্রত্যেক কবি হচ্ছেন এক একজন স্বতন্ত্র স্রষ্টা, আর তাঁর সৃষ্টির বিষয় হচ্ছে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব, তাঁর জীবনের সঙ্গে যার অবসান; পরে পরে যারা আসেন তাঁরা যদি সত্যকার কবি হন তবে নূতন-কিছু সৃষ্টি করেন, আর তা না হলে অনুকরণ করেন, কিন্তু অনুকারীর স্থান কাব্যের ইতিহাসে সত্যই নেই। —তবু তিনি স্বীকার করেছেন—

...in Goethe's poetry, in his rich, varied, impressionable and highly intelligent mind were mirrored for the first time in conspicuous fashion many sides of the modern spirit.[৫১]

অনেক সাহিত্যিকই গ্যেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সব চাইতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বোধ হয় কার্লাইলের। তিনি তাঁর Hero and Hero worship গ্রন্থে Hero as man of letters অধ্যায় গ্যেটের কথা দিয়ে শুরু করেছেন, এবং গ্যেটের প্রতিভা যে জগতে এক নূতন বিস্ময়ের সামগ্রী, যে-হজরত মোহাম্মদের তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন তাঁর প্রতিভার চাইতেও যে গ্যেটের প্রতিভা উচ্চতর গ্রামের, ইত্যাদি কথা বলবার পর বলেছেন— গ্যেটের কথা থাকুক, কেউ আপাতত তাঁকে বুঝবে না। এই বলে তিনি রুসো বার্ণস প্রমুখ সাহিত্যিকদের মাহাত্ম্য কীর্তনে মনোনিবেশ করেছেন। —কিন্তু ক্রোচে যে গ্যেটের প্রতিভাকে modern spirit-এর (আধুনিকতার) এক বড় প্রতীক বলেছেন সেইটি ভাল করে বুঝতে পারলে গ্যেটের সঙ্গে আমাদের সত্যকার পরিচয় হয়ত খানিকটা হবে।

গ্যেটের ভিতরে এই যে সুবৃহৎ নূতন মন, বলা যেতে পারে, Renaissance (নবজাগরণ)—সূচিত মানসিকতার তা এক বড় পরিণতি। শিক্ষিত ব্যক্তিরা জানেন, ইয়োরোপের Renaissance কয়েক শতাব্দীব্যাপী ব্যাপার, বহু লক্ষণের দ্বারা জটিল, আর তা শুধু সৌন্দর্য ও আনন্দের কাহিনীই নয়, সেই সৌন্দর্য ও আনন্দের সঙ্গে মিশে রয়েছে অনেকখানি কদর্যতাও—টলষ্টয় তাঁর শেষ বয়সের কতগুলো রচনায় যার দিকে তাঁর বলিষ্ঠ তর্জনী নির্দেশ করেছেন। তবু এ সত্য যে

---

৫১. গ্যেটের কাব্যে, তাঁর সারবান বৈচিত্র্য-বিলাসী রূপগ্রাহী ও প্রখরবুদ্ধি মনে প্রথম স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় আধুনিকতার বহু দিক।

Renaissance কাহিনী মোটের উপর মানুষের ঊষর চিত্তক্ষেত্রে পল্লবিত করবার কাহিনী, মানুষের জাগতিক জীবনের সুখ-সম্ভোগের এক করুণ মধুর কাহিনী। — কিন্তু এই Renaissance পুষ্পের সৌরভে ফ্রান্স ইতালি ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশ আমোদিত হলেও তুহিনাবৃত জার্মানী বহু দিন পর্যন্ত তা থেকে বঞ্চিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে সেখানে দেখা দিল ধর্মান্দোলন Reformation. আপাতদৃষ্টিতে যা বহুদিক দিয়ে Renaissance-এর আত্মীয়তা বেশী। কিন্তু জার্মেনীর Classicism—তার পূর্ববর্তী Reformation-এর বিপরীতধর্মী। অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মানীর যে Classicism— প্রাচীন গ্রীক শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভের চেষ্টা— তার সঙ্গেই বরং Renaissance এর আত্মীয়তা বেশী। কিন্তু জার্মেনীর Classicism তার পূর্ববর্তী Reformation-এর বিপরীতধর্মী বোধ হলেও বাস্তবিকপক্ষে এটি Renaissance ও Reformation-এর বেশ এক সমন্বয়। এই Classicism-এর প্রবর্তকদের সৌন্দর্যানুরাগ Renaissance -এর, কিন্তু তাঁদের সত্য ও স্বদেশানুরাগ, অন্য কথায়, কল্যাণানুরাগ, Reformation-এর। এই Classicism -এর এক শ্রেষ্ঠ নায়ক Lessing এর একটি উক্তি খুব প্রণিধানযোগ্য। সৌন্দর্যতত্ত্ব বোঝাবার জন্য তিনি লিখেছেন Laokoon, এক জগদবিখ্যাত বই, যদিও আকারে ক্ষুদ্র; তিনিই বলেছেন—ঈশ্বর যদি এক হাতে পূর্ণজ্ঞান অপর হাতে প্রয়াসের অনন্ত দুঃখ এই দুটি নিয়ে বলেন, কোনটি নেবে বলো, তাহলে বলব, পিতঃ, প্রমাদহীন পূর্ণজ্ঞান তোমাকেই সাজে, আমাকে দান কর অনন্ত প্রয়াস।[৫২]

জার্মেনীর এই অষ্টাবিংশ শতাব্দীর Classicism —এর শ্রেষ্ঠ প্রতীক গ্যেটে। সত্য বটে তিনি নিজেকে খ্রীস্টান বলে পরিচিত করবার জন্য ব্যগ্রতা দেখেন নি, বরং বলেছেন, "আমি পেগ্যান" (Pegan), প্রকৃতির পূজারি, (মুসলমানী ভাষায় "কাফের"), সেই পরমসৌন্দর্য প্রেমিক গ্যেটের ভিতরেও সত্যান্বেষণের বীরব্রত কতখানি ছিল তা তাঁর এই উক্তি থেকেই বোঝা যাবে।

"In religious scientific and political matters, I generally brought troubles upon myself because I was no Hypocrite and had the courage to experss what I felt."[৫৩]

---

৫২. If God were to hold in his right hand all truth, and in his left hand the single everactive impulse to seek after Truth, even though with the condition that I must eternally remain in error, and say to me, "Choose", I would with humility fall before his left hand and say, "Father, Give! For pure thoughts belong thee alone."

৫৩. ধর্ম বিজ্ঞান ও রাজনীতি-সম্পর্কিত ব্যাপারে বহু সময়ে আমি নিজের উপর বিপদ ডেকে এনেছি, তার কারণ ভন্ডামি আমার পোষাত না, আর যা মনে প্রাণে বুঝতাম তা প্রকাশ করে, বলবার সাহস আমার ছিল।

একটা জাতির জাগরণে প্রতিবিম্বিত যেন বসন্ত ও বর্ষার নৈসর্গিক প্রাচুর্য। বসন্তের আগমনে দেখা দেয় গাছে নূতন পাতা, ডালে ডালে লাখো পাখির আনন্দ-গান; বর্ষায় দেখতে দেখতে নদী নালা ভরে ওঠে উপরের নিরন্তর বর্ষণে,—একটা জাতির জাগরণ সময়ে তিন একই সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু কর্মীর আবির্ভাব ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান জাগরণে দেখতে পাই—চিত্রের ক্ষেত্রে Oeser, Winckelmann; সাহিত্যে Klopstock, Herder, Wieland, Goethe, Schiller, দর্শনে Kant, Schelling, Hegel, Schopenhauer; সমালোচনায় Schlegel; সঙ্গীতে Mozart, Beethoven ..... ইত্যাদি এ যেন দেখতে দেখতে গগন বিদীর্ণ করে দাঁড়ালো বিচিত্রশীর্ষ এক বিরাট পর্বত! বিশেষজ্ঞরা বলেন— এই শৃঙ্গমালার উচ্চতম মহত্তমটির নাম গ্যেটে।

গ্যেটের চরিতখ্যায়ক Lewes বলেছেন—

.....of all the failings usually attributed to literary men Goethe had the least of what could be called jealuosy; of all the qualities which sit gracefully on greatness he had the most of magnanimity. [৫৪]

এ আদৌ অতিরঞ্জন নয়। এই অসাধারণ প্রতিভা তাঁর প্রতিভার ভারে আদৌ টলটলায়মান হন নি। কত সহজভাবে তিনি বলেছেন—

.....Even the greatest genius won't go far if he tried to owe everything to his own internal self. But many very good men do not comprehend that and they grope in darkness for half a life with their dream of originality.....I by no means owe my work to my wisdom alone, but a thousand things and persons around me who provided me with material. There were fools and sages, minds enlightened and narrow, childhood, youth and mature age-all told me what they felt, what they thought, how they lived and worked and what experience they had gained; and I had nothing further than to put out my hand and reap what others had sown for me.[৫৫]

---

৫৪. সাহিত্যিকজনসুলভ দুর্বলতার মধ্যে ঈর্ষাতাঁতে ছিল না বলেই চলে; মহত্ত্বের শোভাবর্ধক গুণাবলীর মধ্যে মহানুভবতা তাঁতে ছিল অপর্যাপ্ত।

৫৫. শুধু অন্তর-সত্তার উপরে নির্ভর করে' শ্রেষ্ঠতম প্রতিভাও বেশি দূর অগ্রসর হতে পারবেন না। কিন্তু অনেক সাধু সঙ্কল্প ব্যক্তি একথা বুঝে উঠতে পারেন না, আর তার ফলে তাঁদের মৌলিকতার স্বপ্ন নিয়ে অর্ধেক জীবন তাঁরা অন্ধকারে হাৎড়ে কাটান। .....আমি যা করতে পেরেছি তা শুধু আমার নিজের জ্ঞানের ফলে কখনো নয়, আমার চারপাশের শত সহস্র বস্তু ও ব্যক্তি আমাকে যে-সব উপকরণ যুগিয়েছে তারও ফলে। মূর্খ ও পণ্ডিত, উদারমনা ও সংকীর্ণমনা, বালক যুবক ও প্রবীণ—সবাই আমার কাছে ব্যক্ত করেছে কি তারা অনুভব করেছে চিন্তা করেছে, কেমন করে তারা জীবন নির্বাহ করেছে কাজ করেছে, ও কি অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করেছে; আমার কাজ হয়েছিল এরা যা আবাদ করেছে হাত বাড়িয়ে তাই সংগ্রহ করা।

অন্যত্র তাঁর পূর্ববর্তী Winckelmann, Lessing, Herder প্রভৃতির নিকট তাঁর ঋণ তিনি বার বার স্বীকার করেছেন। কিন্তু তবু এ সত্য যে গ্যেটে যদি অপরিসীম কীর্তি মণ্ডিত গ্যেটে না হতেন তাহলে তাঁর পূর্ববর্তীদের মাহাত্ম্য অমন পরিকীর্তিত হবার সম্ভাবনা কম ঘটত —যেমন, কোনো পরিবারকে লোকচক্ষুতে গৌরবমণ্ডিত করেন তার বহু স্বল্পকীর্তি সন্তান নন, তার একজন অতুলকীর্তি সন্তান। তাই গ্যেটে নিজে তাঁর মাহাত্ম্য বিশ্লেষণে উদাসীন হলেও তাঁকে যাঁরা বুঝতে চান তাঁদের পক্ষে সে-ঔদাসীন্য অসার্থক।

১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে Frankfort নগরে এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে গ্যেটের জন্ম হয়। তাঁর আত্মচরিতে তিনি তাঁর বাল্যজীবনের ছবি নিপুণ হস্তে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর সেই বাল্য-কাহিনীতে বেশী করে চোখে পড়ে দুইটি ব্যাপার— তাঁর স্বভাবদত্ত প্রতিভা আর তাঁর পিতার শিক্ষা-ব্যবস্থা। —তিনি যখন সাত আট বৎসরের বালক তখন এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। তিনি তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, এই ঘটনা তাঁর বালক-মনের উপরে গভীর রেখাপাত করে। সবারই মুখে যিনি দয়াল প্রেমময় ইত্যাদি নামে পরিকীর্তিত তাঁরই সামনে এমন ধ্বংস কি করে সম্ভবপর, সেই চিন্তায় তাঁর চিত্ত কিছুদিন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর স্বভাবত সৌন্দর্যানুরাগী মনে এ দুশ্চিন্তার ভার স্থায়ী হয় নি। —তার উপর ধর্ম সম্বন্ধে বহু বাদানুবাদ তিনি অনেক সময়েই শুনতেন। এইসব থেকে ইহুদি-পুরাণের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ক্রোধপরায়ণ ঈশ্বরে অপ্রত্যয় ও প্রকৃতির অধীশ্বর শান্ত সুন্দর ঈশ্বরে প্রত্যয় তাঁর বালক-মনে প্রবল হতে থাকে। কিন্তু এই ঈশ্বরকে তিনি কেমন করে তাঁর অন্তরের পূজা নিবেদন করবেন? তাঁর পিতা বহু খনিজ দ্রব্য সংগ্রহ করেছিলেন, তিনি ঠিক করলেন সেইসব খনিজ দ্রব্য প্রকৃতির বৈচিত্র্যের প্রতীকরূপে একখানি সুদর্শন কাষ্ঠখণ্ডের উপরে সাজাবেন। কিন্তু কেমন করে মানুষের মনের স্তব পরিব্যক্ত হবে? শেষে ঠিক হলো তাঁর ছবি আঁকার Pastel পেন্সিল সেই সব ধাতুদ্রব্যের উপরে দাঁড় করিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেবেন, তা থেকে যে ধূম কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠবে সেই হবে মানুষের মনের স্তরের প্রতিচ্ছবি। —এক প্রভাতে তিনি এইভাবে ঈশ্বরের প্রতি স্তুতি নিবেদন করলেন Pastel পেন্সিলে আগুন ধরালেন উদীয়মান সূর্যের দিকে আতস-কাচ ধরে। কিন্তু এই স্তব নিবেদনের এক মন্দ ফল ফলেছিল —Pastel পেন্সিল পুড়ে গিয়ে সেই সুদর্শন কাষ্ঠখণ্ডে আগুন ধরেছিল, আর তাতে তার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এর উপরে গ্যেটে একটি সুগভীর মন্তব্য করেছেন—

The accident might almost be considered a hint and warning of the danger there always is in wishing to approach the Deity in such a way.[৫৬]

---

৫৬. এইভাবে ঈশ্বরের উপলব্ধি-চেষ্টায় যে বিপদ এই দুর্ঘটনাকে গণ্য করা যেতে পারে সেই সম্বন্ধে সঙ্কেত ও সাবধান-বাণীর তুল্য।

তাঁর বাল্য-জীবনের অপর একটি লক্ষ্যযোগ্য ঘটনা এই : একদিন স্কুলে তাঁর সহপাঠীরা এই বলে তাঁকে জব্দ করতে চেষ্টা করে যে তাঁর পিতা তাঁর পিতামহের ছেলে নন, অন্য কোনো বড় লোকের ছেলে (তাঁর পিতামহ দর্জি ব্যবসায়ী ছিলেন)। সঙ্গীদের এই নির্মম কথার উত্তরে বালক গ্যেটে শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন— এ যদি সত্য হয় তাতেই বা এমন কি ক্ষতি, জীবন এমন এক মহা দান যে এর জন্য কার কাছে কে ঋণী সে কথা না ভেবেও পারা যায়, কেননা এতটুকু তো সত্য যে ঈশ্বরের কাছ থেকেই তা' এসেছে, আর তাঁর সামনে সবাই সমান।

তাঁর পিতা উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু নিজে জীবনে বেশী কিছু করতে পারেন নি। তাঁর ব্যর্থ জীবন তাঁর পুত্রের ভিতর দিয়ে সার্থকতা লাভ করুক এই ছিল তাঁর সাধনা। পুত্রকে প্রায় সর্ববিদ্যাবিশারদ করবার আয়োজন তিনি করেছিলেন। কলেজে প্রবেশের পূর্বে চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সে গ্যেটে মাতৃভাষা ভিন্ন ল্যাটিন্, ইতালীয়, হিব্রু, গ্রীক, ফরাসী, ও ইংরেজি শিখেছিলেন এর উপর চিত্রাঙ্কন, নৃত্যগীত, অসিচালনা, উদ্যানরচনা ইত্যাদিতেও অভ্যস্ত হয়েছিলেন। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু প্রথমে Leipsig এ গিয়ে তিনি তা করেন নি। পরে Strasburg এর তিনি আইন অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রাণের সামগ্রী বারবারই ছিল কাব্যচর্চা ও চিত্রাঙ্কন।

গ্যেটের সাহিত্যিক গুরুদেব কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের সাহায্যে তাঁর জ্ঞান দিন দিন গভীরতর হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর কাব্যের সত্যকার উৎস তাঁর এই গুরুদেব প্রেরণা তত নয় যত তাঁর নিজের প্রণয় ব্যাপার। সেই প্রেমের দহন তিনি সারাজীবন ভোগ করেছেন। বাস্তবিক, গ্যেটের ভিতরে একই সঙ্গে দুই অদ্ভুত ধারা যথেষ্ট লক্ষ্যযোগ্য একটি জ্ঞানান্বেষণ, অপরটি প্রেমবিধুরতা।

গ্যেটের প্রণয়-কাহিনী তাঁর জীবন ও কাব্যের ইতিহাসে খুব বড় জায়গা দখল করে আছে। কিন্তু এখানে তাঁকে ভুল বুঝা এতই স্বাভাবিক যে তাঁর স্বদেশবাসীরাও বহুকাল পর্যন্ত তাঁকে এ ব্যাপারে নিকৃষ্ট রঙ্গে রঞ্জিত করে এসেছেন। আমাদের জন্য ব্যাপারটি আরো কঠিন এইজন্য যে আমাদের সংস্কার বিভিন্ন, তা যতই কেন আমরা ইয়োরোপের প্রতি প্রীতি-সম্পন্ন না হই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যেতে পারে Frau Von Stein —এর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী সম্বন্ধ। তাঁর চরিতাখ্যায়কদের কেউ কেউ বলেছেন, গ্যেটে ও Von Stein পত্নীর সম্বন্ধ মোটের উপর একটি প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্বন্ধ, তাঁর বেশ কিছু নয়; অপরে এ মত আদৌ গ্রাহ্য করেন নি। তেমনিভাবে জটিল বৃদ্ধবয়সে যুবতী বন্ধুপত্নী Marianne Von Willemer সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ— যা থেকে উদ্ভুত হয়েছিল হাফিজের অনুসরণে তাঁর সুবিখ্যাত West-Eastern Divan কিন্তু এর জন্য যাঁরা তাঁকে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বলতে চান তাঁদের মত গ্রহণ করতে আমাদের বাধে এইজন্য যে কবির অন্তরাত্মা প্রতিবিম্বিত হয় যাতে সেই কাব্যে

গ্যেটে যে প্রেমের ছবি অঙ্কিত করেছেন তাতে ফুটে রয়েছে এক আশ্চর্য পবিত্রতা। তাঁর Sorrows of Werther এ ভের্টের Albert এর বিবাহিতা Charlotte-র প্রেমে আত্মহারা; সে এক জার্মান "মজনু" কিন্তু সেই Werther ই এক জায়গায় বলেছেন— "Is not me love for her the purest, most holy has my soul ever been sullied by a single sensual desire?"[৫৭]

তাঁর "Elective affinities" গ্রন্থে নায়ক Eduard তাঁর স্ত্রীকে বিস্মৃত হয়ে Ottile-র প্রেমে পাগল হয়েছেন; কিন্তু Ottile তাঁর কাছে দেববিগ্রহের মতো পবিত্র, Ottile —এর একটু ইঙ্গিতে কঠোরতম সংযমে তিনি নিজেকে বাঁধছেন। —ক্রোচে বলেছেন, Faust প্রথম খণ্ডে Margaret —এর সঙ্গে Faust এর সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা বেশী প্রকাশ পেয়েছে, Faust তাঁর সমস্ত জ্ঞানান্বেষণ বিস্মৃত হয়ে বৃদ্ধা দূতীর সাহায্যে Margaret কে আয়ত্ব করেছেন। দূতীর মধ্যবর্তীতাই যদি ক্রোচের কাছে প্রধান আপত্তিকর ব্যাপার হয় তবে সেই কালের দোহাই দিয়ে সহজেই তাঁকে অনেকখানি নিরুত্তর করা যেতে পারে। তাছাড়া, প্রথম কয়েক দৃশ্যের সেই বিশ্বজ্ঞানের পিপাসু সুন্দর ও সবল-চিত্ত Faust যে পরে বদলে কামুক হয়ে গেছেন তা সত্য নয়। Margaret-র প্রেমে বাস্তবিকই তিনি আত্মহারা: Margaret এর কক্ষে গোপন প্রবেশ করে তিনি তাঁর নিজের ভিতরে এক রহস্যের পরিবর্তন অনুভব করেছেন :

...And I? What drew me here with power?
How deeply am I moted, this hour!
What seek? Why so full my heart and sore?
Miscrable Faust! I Know thee now no more.
Is there a magic vapour here?
I came with lust of instant pleasure,
And lie dissolved in dream of love's sweet liesure..."[৫৮]

---

৫৭. তাঁর প্রতি আমার প্রেম পরম শুদ্ধ পরম পবিত্র নয় কি?.... আমার অন্তরাত্মা কি কখনো একটি ভোগাকাঙ্ক্ষার দ্বারাও কলুষিত হয়েছে

৫৮. আর আমি? কিসের সবল আকর্ষণ আমাকে এখানে এনেছে?
কি প্রবল ভাবেই না আন্দোলিত হচ্ছে আমার অন্তর!
কি আমি চাই? কেন এখন হৃদয় আমার এমন উদ্বেলিত ও ব্যথিত?
হায় ফাউস্ট! তোমাকে আর চেনা যায় না।
এখানে কি কোনো যাদু বাষ্প আছে?
আপাত তৃপ্তির কামনা নিয়ে আমি এসেছিলাম;
কিন্তু প্রেমের স্বপ্নরসে আমি এখন নিমজ্জিত।

তাঁর Tasso. Iphigenie. প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেও এই ধরনের প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু এমনি করে তাঁর পক্ষ সমর্থন করলেও আমাদের দেশের সর্ব-সাধারণের কথা ছেড়ে দিয়ে শিক্ষিত-সাধারণকে নিয়েও নরনারীর এমন সম্বন্ধ কল্পনা করা খুব সহজ কি? এই সুন্দর স্বেচ্ছাচার আমাদের দেশে হিন্দু দেবদেবীর লীলায় বেশ আছে, মুসলমানের বেহেশতের প্রচলিত ধারণায় খানিকটা আছে, কিন্তু এরই ভিতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে শ্রেয়ে পৌছানো— এ আজো আমাদের সহজ ধারণার বহির্ভূত।[৫৯] —কেউ কেউ বলেছেন, গ্যেটের ভিতরে 'পাপ বোধ' 'অন্যায় বোধ' এসব ছিল না, মানুষের জন্য বিশেষ কোনো দরদ তিনি অনুভব করতেন না, যেমন Amiel বলেছেন—

""He is a Greek of the great time, to whom the inward crises of the religious consciousness are unknown... he takes no more interest than Nature herself in the disinherited, the feeble, and the oppressed.."[৬০]

কিন্তু এ মত যে সত্য নয় তা Amiel নিজেই সেই দিনের ডায়রীর শেষের দিকে ব্যক্ত করেছেন—

"One must never be too hasty in judging these complex natures"[৬১]

প্রকৃতির সমস্ত ভাঙ-চুর ছাপিয়ে জাগে প্রাণের সবুজ উৎসব, —আমাদের মনে হয় গ্যেটের প্রতিভা ছিল প্রকৃতির মতো অপরিসীম বীর্যবন্ত, তাই তাঁর ভিতরকার সমস্ত দুঃখ-বিপত্তি বেদনা বিক্ষোভ আত্মগোপন করেছিল এক পরম রমণীয় প্রফুল্লতার অন্তরালে। এই সম্পর্কে গ্যেটে নিজেও বলেছেন—

Only he who has been the most sensitive can become the hardest and coldest of men, for he has to encase himself in triple steel...and often his coat of mail oppresses him.[৬২]

---

৫৯. তবে ব্যাপারটি অন্য দিকে দিয়েও ভাবা যেতে পারে। নারীর ব্যক্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না; সেই ব্যক্তিত্ব স্বীকার করলে গ্যেটের জীবন ও প্রয়াস হয়ত মানুষের স্বাভাবিক জীবনের ব্যাপার বলেই আমরা ধারণা করতে পারবে।

৬০. তিনি হচ্ছেন গৌরব-যুগের একজন গ্রীক 'ধর্মবোধের'র অন্তর-বেদনা যাঁর কাছে অজ্ঞাত। জগতের বঞ্চিত দুর্বল ও অত্যাচারিতদের প্রতি প্রকৃতির মতোই তিনি উদাসীন।

৬১. এই জটিল প্রকৃতির লোকদের সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি কোনো মত প্রকাশ করা অসঙ্গত। Amiel's Journal-P. 187

৬২. যিনি সব চাইতে অনুভূতিপ্রবণ কেবল তিনিই হতে পারেন সব চাইতে কঠিন ও নির্বিকার; কেননা তাঁর পক্ষে প্রয়োজন হয় নিজেকে বহুস্তর বর্মে আবৃত করা....আর অনেক সময় এই বর্ম হয় তাঁর জন্য পীড়াদায়ক।

গ্যেটের ভিতরে একই সঙ্গে প্রেমবিধুরতা ও জ্ঞানান্বেষণ বিদ্যমান এর ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে বহু কথা বলবার আছে— গ্যেটে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুদের এটি বিশেষ অনুধাবনের বিষয়। প্রেমে তিনি যেন একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েন আর তাঁর আর একটি চেতনা যেন বসে বসে তাঁর মত্ততার কাহিনী সংগ্রহ করতে থাকে। এই আশ্চর্য বাস্তবপ্রীতি, এই যেন গ্যেটে প্রতিভার সবখানি কথা। তাঁর গুরু ও বন্ধু Merk তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন— বাস্তব (সত্য) যা তুমি তাকে দাও কাব্য-রূপ you give poetic from to the real. তাঁর কাব্যের এর চাইতে সুন্দরতম পরিচয় হয়ত আর দেওয়া যায় না। অথচ তাঁর এই বাস্তব-প্রীতি কেন তথাকথিত realism এ (বস্তুতন্ত্রতায়) পরিণত হলো না সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন :

প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পীর সম্বন্ধ দ্বিবিধ; তিনি একই সঙ্গে তার প্রভুত্ব ও দাস। দাস এই কারণে যে পার্থিব সামগ্রীর সাহায্যে তাঁকে কাজ করতে হয় নিজেকে বোঝাবার জন্য; আর প্রভু এই কারণে যে এইসব পার্থিব সামগ্রী তিনি উপায়স্বরূপ ব্যবহার করেন তাঁর উচ্চতর উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলতে। —সমগ্রতার সাহায্যে শিল্পী তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। এই সমগ্রতা কিন্তু প্রকৃতিতেই নেই; এটি তার নিজের চিত্তের ফল, অথবা বলা যায়, ফল সঞ্চারী ঐশ্বরিক প্রেরণা।[৬৩]

গ্যেটের এই ধরনের মতামত অনুসরণ করে Dr. Rudolf Steiner একটি বই লিখেছেন, তার নাম তিনি দিয়েছেন Goethe as the founder of a new Science of Esthetics. তার মূল কথা কতকটা এই— প্রকৃতির ভিতরে বুঝতে পারা যায় এক উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত, মানুষের জীবনে রয়েছে তারও চাইতে বৃহত্তর উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত, শিল্পীর রচনায় তারই প্রকাশ; যেমন গ্যেটে বলেছেন :

In that Man is placed on Nature's pinnacle, he regards himself as another whole Nature, whose task is to bring forth inwardly yet another Pinnacle. For this purpose he heightens his powers imbuing himself with all perfections and virtues, calling on choice, order, harmony, and meaning, and finally rising to the

---

৬৩. The artist has a twofold relation to nature; he is at once her master and her slave.He is her slave in as much as he must work with earthly things in order to he understood, but lee is her master, in as much as he subjects these earthly means to his higher intentions and rnders them subservient.
The artist would speak to the world through an entirety; however, he does not find this entirety in nature; but it is the fruit of his own mind, or if you like it, of the aspiration of a fructifying divine breath.

production of the work of art, which takes a prominent place by the side of his other actions and works. Once it is brought forth, once it stands before the world in its ideal reality, it produces a permanent effect-it produces the highest effect-for as it develops itself spiritually out of a unison of forces, it gathers into itself all that is glorious and worthy of devotion and love, and thus breathing life into the human form uplifts man above himself, completes the cycle of his life and activity, deifies him for the present in which the past and future are included...[৬৪]

এ সম্বন্ধে গ্যেটের আরো কয়েকটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

.....Occasional poems (are) the first and most genuine of all kinds of poetry..

.....The first and last demanded of genius is love of truth...

.....I seek in everything a point from which much may be develop...[৬৫]

---

৬৪. প্রকৃতির চূড়ায় অধিষ্ঠিত মানুষ নিজেকে জ্ঞান করে আর-এক পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতি বলে, তার কাজ হচ্ছে অন্তর্লোকে আর-এক চূড়ার সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে সে তার ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন করে—সমস্ত সৌষ্ঠব ও গুণপণায় সে নিজেকে করে ভূষিত, নির্বাচন শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য অর্থবোধ, এ-সবের হয় তার বিশেষ প্রয়োজন, অবশেষে লাভ হয় তার শিল্প-সৃষ্টির যোগ্যতা যা তার অন্যান্য কর্ম ও কীর্তির পাশে লাভ করে বিশেষ মর্যাদার স্থান। একবার যদি এর সৃষ্টি হয়, একবার যদি এই শিল্পসৃষ্টি জগতের সামনে দাঁড়ায় মানস-সত্য রূপে, তা হলে এর লাভ হয় এক স্থায়ী প্রভাব-শ্রেষ্ঠতম প্রভাব; কেননা বহু শক্তির সম্মিলন-ক্ষেত্রে আত্মিক শক্তিরূপে এ যে নিজেকে বিকশিত করে তোলে এই জন্য জীবনে যা-কিছু শ্রেয় প্রেয় ও গৌরবের সে-সবই নিজের ভিতরে সঞ্চিত করে, আর এইভাবে মনুষ্যমূর্তিতে (নূতনভাবে) প্রাণ সঞ্চার করে মানুষকে করে মহত্তর, তার জীবন ও কর্মের পরিধিকে করে পূর্ণাঙ্গ, আর অতীত-ও-ভবিষ্যৎ-সমন্বিত বর্তমানে তাকে দান করে দেবত্ব। Dr. R. Steiner তাঁর বইখানিতে শেষ মন্তব্য করেছেন এই :- Beauty is not the divine in a cloak to physical reality; no, it is physical reality in a cloak that is divine.
সৌন্দর্য পার্থিব আবরণে এক দিব্য বস্তু নয় বরং দিব্য আবরণে পার্থিব সত্য। (তিনি এখানে দার্শনিক schelling-এর সৌন্দর্য-তত্ত্বের প্রতিবাদ করেছেন।)

৬৫. সাময়িক কবিতাই আদি ও অকৃতিম কবিতা।
প্রতিভার সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ কর্তব্য-সত্যপ্রীতি।
প্রত্যেক বিষয়ে আমি এমন একটি স্থান খুঁজি যা থেকে প্রভূত বিকাশ সম্ভবপর।

Theodore Watts-Dunton Encyclopaedia Britannica য় Poetry শীর্ষক লেখায় কবি দৃষ্টিকে দুইভাগে ভাগ করেছেন— Absolute Vision শুদ্ধদৃষ্টি ও Relative Vision আপেক্ষিক দৃষ্টি। সেই Absolute Vision —এর দৃষ্টান্ত তিনি দেখেছেন Shakespeare এ ও Homer এ। Absolute Vision বলতে তিনি বুঝেছেন বস্তুর নিজস্বতার বিবৃতি; কবি নিজের রাগ-দ্বেষ একেবারে ভুলে গিয়ে কোনো বস্তুর বা কোনো ব্যক্তির মধ্যে প্রবেশ করে তাকে বিশ্লেষণ করছেন; রূপময় করছেন। এইভাবে সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে Absolute Vision লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর কি না, অর্থাৎ শেকস্‌পীয়র ও হোমর তাদের Absolute Vision এর মুহূর্তেও শেকস্‌পীয়র ও হোমর বিবর্জিত হয়েছিলেন কি না, সে বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক চলতে পারে। তবে এই আত্মবিলোপ কবির পক্ষে মানুষ হিসাবে যতখানি সম্ভবপর সেদিক দিয়ে দেখলে হয়ত বোঝা যাবে, সত্যকার Absolute Vision অর্থাৎ মানুষের মনের বহু স্তরের বহু গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে Vision গ্যেটের চাইতে শেকস্‌পীয়রে ও হোমরে বেশী নয়। কিন্তু সাহিত্যের প্রচলিত শাস্ত্র অনুসারে এ হয়ত blasphemy " কাফেরী কালাম" —তাই বেশী কিছু না বলাই শোভন।

অল্প বয়সেই গ্যেটে বলেছিলেন—আমি প্রকৃতির মতো অকৃত্রিম হব, ভাল হব, মন্দ হব, তোমাদের কোনো আদর্শ আমাকে বাধা দিতে পারবে না। (All your ideals shall not prevent me from being genuine, and good and bad-like Nature).

এই যাঁরা সাধনা প্রচলিত কথায় যাকে বলা হয় কবিত্ব, কাব্য-সৌন্দর্য, তাতেই যে তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন তা সম্ভবপর নয়। ঘটেছেও তাই; গ্যেটে শুধু কবি নন, তিনি বিজ্ঞানবিৎ (বিজ্ঞানে তাঁর দান স্বীকৃত হয়েছে), চিত্র-সমঝদার, শেষ বয়সে সঙ্গীত- সমঝদার, ধর্ম-তত্ত্বজ্ঞ, এমন-কি মরমী-সাধনার সঙ্গেও সুপরিচিত তাঁর চিত্তের এই বিরাটত্বের জন্যই জনৈক লেখক তাঁকে আধুনিক জগতের সমস্ত চিন্তাশীলের গুরু বলেছেন :

.....we are all disciples of Goethe whether we know it or not, and any liberal mind has but to be brought into contact with the master to realise that inevitable discipleship...." John Macy-The Story of the World's Literature.[৬৬]

---

৬৬. আমরা সবাই গ্যেটের শিষ্য তা আমরা জানি আর নাই জানি; যে-কেন উদারচিত্ত ব্যক্তি এই গুরুর সংস্পর্শে এলেই সেই অবশ্যম্ভাবী শিষ্যত্বের কথা বুঝবেন।

গ্যেটে নিজেও বলেছেন— যিনি প্রকৃতই আমার রচনা ও চরিত্রের মর্মগ্রাহী হয়েছে তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে তার ফলে তিনি এক প্রকার চিত্তের অবন্ধন লাভ করেছেন।[৬৭]

প্রচলিত ধর্মে আস্থাবান না হয়েও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সব কথা তিনি বলেছেন বাস্তবিকই বিস্ময়কর— ভাবুকের জন্য আনন্দের অফুরন্ত প্রস্রবণ। তাঁর Faust এর সেই who dare express Him"[৬৮] ইত্যাদি সুবিখ্যাত, এভিন্ন অন্যান্য সুন্দর উক্তিও আছে, যেমন

---

৬৭. ".....And any one who has really learnt to understand my works and my character is bound to acknowledge that the has thereby attained to a certain freedom of the spirit."

৬৮. "মার্গারেটের মনে সন্দেহ জেগেছে হয়ত ফাউস্ট ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন; তার প্রশ্নের উত্তরে ফাউস্ট বলেছেন ঃ-

Who dare express Him?
And who profess Him?
Saying: I believe in Him!
Who, feeling, seeing,
Deny His being,
Saying: I believe Him not!
The All-upholding,
The All-sustaining,
Folds and upholds He not
Thee, me Himself?
Arches there not the sky above us?
Lies not beneath us firm the earth?
And rise not, on us shining,
Friendly, the everlasting stars?
Look I not, eye to eye, on thee,
And feel' st not, thronging
To head and heart, the force,
Still weaving its eternal secert?
Invisible, visible, round the life?
Vast as it is, fill with what force thy heart,
And when thou in the feeling wholly blessed art,
Call it then, what thou wilt,
Call it Bliss! Heart! Love! God!
I have no name to give it!
Feeling is all in all:
The Name is sound and smoke,
Obscuring heaven's clear glow.

"....what know we of the idea of the Divinity? and what can our narrow ideas tell of the Highest Being? Should, I, like a Turk, name it with a hundred names, I should still fall short and it comparison with the infinite attributes, have said nothing."[৬৯]

"Let men continue to worship Him Who gives the ox his pasture and to man food and drink, according to his need. But I worship Him Who has filled the world with such a productive energy, that if only the millionth part became embodied in living existences the globe world so swarm with them that War, Pestilence, Flood, and Fire would be powerless to diminish them. That is my Good."[৭০]

স্পর্ধা কার তাঁকে ব্যক্ত করবে?
বলবে কে—তাঁকে জানি, তাঁতে বিশ্বাস রাখি!
অনুভূতি ও দৃষ্টি অব্যাহত রেখে
অস্বীকার করবে কে তাঁকে!
বলবে কে॥বিশ্বাসী তাঁকে নই!
সর্বধর
সর্বাশ্রয়
ধারণ কি করছেন না তিনি তোমাকে, আমাকে, নিজেকে?
মাথার উপরে নেই কি আকাশের খিলান?
পায়ের নিচে শান্ত ধরনী?
সামনে জ্বলজ্বল-করা বন্ধুর-মতো-চেয়ে-থাকা চিরদিনের তারা?
চোখ কি আমার দেখছে না তোমাকে?
অনুভব কি করছ না তুমি, মনে প্রাণে,
তোমার জীবন ঘিরে চলেছে কি রহস্যময় শক্তির শীলা?
—কখনো দৃশ্য কখনো অদৃশ্য!
বিরাটের দ্বারা তোমার হৃদয় পূর্ণ কর নিঃশেষে!
আর যখন তুমি ভাগ্যবতী এই অনুভূতি-ধনে
তখন নাম দিয়ো এর
পরমা শান্তি, হৃদয়, প্রেম, ঈশ্বর—যা খুশী!
আমি অক্ষম এর নাম দিতে।
অনুভূতিই আমার সব।
নাম শুধু কোলাহল ও কুহেলী
আকাশের প্রোজ্জ্বলতা তাতে হয় আচ্ছন্ন।

৬৯. ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে আমাদের কিইবা জ্ঞান আছে। আমাদের সংকীর্ণ পরিসর ভাবনা সেই পরমপুরুষের সম্বন্ধে কতটুকুই বা ব্যক্ত করতে পারে। যদি মুসলমানের মতো শতনামে আমি তাঁকে ডাকি তবু অকথিত থাকবে বহু, আর তাঁর মহিমার কথা ভাবলে বুঝব—কিছুই বলা হয়নি।

৭০. অন্যেরা পূজা করুন তাঁকে যিনি ষাঁড়কে দিয়েছেন চরবার মাঠ আর মানুষকে দিয়েছেন তার প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয়। কিন্তু আমি পূজারী তাঁর যিনি জগৎকে পূর্ণ করেছেন এমন প্রাণশক্তিতে সে যদি তাঁর অযুততম অংশও সক্রিয় হয় তবে জগত তাঁর দ্বারা এমনভাবে পূর্ণ হবে যে যুদ্ধ মড়ক বন্যা প্রভৃতির সাধ্য হবে না তার শক্তি হ্রাস করতে। এই আমার ঈশ্বর।

অথবা—

তাঁর আর একটি উক্তিও প্রণিধানযোগ্য— যাঁরা ধর্মপ্রাণ সৃষ্টি শুধু তাঁদের দ্বারাই সম্ভবপর— Only religious men can be creative.

গ্যেটের ভিতরে স্বজাতিপ্রেমের তীব্রতা ছিল না। এজন্য তাঁকে কম নিন্দা ভোগ করতে হয় নি। কিন্তু দার্শনিক ক্রোচে এতে মহা আনন্দিত হয়েছেন—

"...I consider it singularly fortunate that among all the sublime poets, perennial sources of deep consolation, there should yet be one who, possessing a knowledge of human nature in all its aspects, such as no other poets ever possessed, nevertheless keeps his mind above and beyond political sympathies and the inevitable quarrels of nations.[৭১]

এ সম্বন্ধে গ্যেটে নিজে বহু কথা বলেছেন,

"National literature is now rather an unmeaning term; the epoch of world literature is at hand, and each one must try to hasten its approach."[৭২]

অন্যত্র

Altogether national hatred is something peculiar. You will always find it strongest and most violent where there is the lowest degree of cultuer. But there a degree where it vanishes altogether and where one stands to a certain extent above nations and feels the weal or woe of a neighbouring people as if it had happened to one's own. This degree of culture was conformable to my nature, and I had become strengthened in it long before I had reached my sixtieth year.[৭৩]

---

৭১. মহাকবিরা হচ্ছেন আশা ও আনন্দের অফুরন্ত প্রস্রবণ, সেই মহাকবিদের মধ্যে এমন একজনও যে আছেন যিনি মানব-প্রকৃতির সর্ব ক্ষেত্রের জ্ঞানে সর্বাগ্রগণ্য হয়েও রাজনৈতিক পক্ষপাত ও জাতিতে অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বের বহু উর্দ্ধে নিজের চিত্ত স্থাপন করতে পেরেছেন, এ এক মহা সৌভাগ্য বলে আমি জ্ঞান করি।

৭২. জাতীয় সাহিত্য এখন বরং এক অর্থহীন কথা। বিশ্বসাহিত্যের যুগ আসন্ন হয়েছে আর প্রত্যেকেরই উচিত একে এগিয়ে আনা।

৭৩. মোটের উপর বিজাতিবিদ্বেষ অদ্ভুত ব্যাপার। যেখানে চিত্তোৎকর্ষের যত অল্পতা সেখানে এর তীব্রতা তত বেশি। কিন্তু চিত্তোৎকর্ষের এমন স্তর আছে যেখানে এর সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে, ফলে এর অনুভাবকের স্থান লাভ হয় জাতীয়তার উর্দ্ধে। পরজাতির দুঃখবিপত্তি তখন তার মনে হয় নিজের জাতির দুঃখ-বিপত্তির মতো। চিত্তোৎকর্ষের এই স্তরের সঙ্গে আমার প্রকৃতির সহজ যোগ ছিল, আর ষাট বৎসর বয়সের বহু পূর্বেই এতে আমার স্থিতিলাভ হয়েছিল।

গ্যেটে সম্বন্ধে যে ক'জন আলোচকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তাঁদের কেউই কয়েক শত পৃষ্ঠার কমে তাঁদের বক্তব্য শেষ করতে পারেন নি। তবু তাঁদের লেখা ফেলানো লেখা নয়। তাঁর সুদীর্ঘ জীবন-কাহিনী, তাঁর কাব্যের কিছু কিছু পরিচয়, আপাতত অকথিতই রইল।[৭৪]

গ্যেটে-সমুদ্রের হাওয়া মানস স্বাস্থ্যের জন্য অমূল্য, এই একটি কথাই বলতে চেষ্টা করেছি হয়ত।

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। চৈত্র, ১৩৩৬

---

৭৪. কবিগুরু গ্যেটে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড দ্রঃ।

বাংলার জাগরণ

আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা এই যে বাংলার জাগরণ পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু পুরোপুরি সত্যও যে নয় সে-দিকটা ভেবে দেখবার আছে। যাঁরা এই জাগরণের নেতা তাঁরা কি উদ্দেশ্য-আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ও এই জাগরণের ফলে দেশের যা লাভ হয়েছে তার স্বরূপ কি, এই সমস্ত চিন্তা করলে হয়ত আমাদের কথা ভিত্তিশূন্য মনে হবে না। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার থেকে আরম্ভ ক'রে বাজনা ও গোহত্যা নিয়ে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা পর্যন্ত আমাদের দেশে চিন্তা কর্মধারা, আর ডিইষ্ট এনসাইক্লোপিডিষ্ট থেকে আরম্ভ ক'রে বোল্‌শেভিজ্‌ম পর্যন্ত পাশ্চাত্য চিন্তা ও কর্মধারা, এই দুইয়ের উপর চোখ বুলিয়া গেলেও বুঝতে পারা যায়— আমাদের দেশ তাঁর নিজের কর্মফলের বোঝাই বহন করে চলেছে, পাশ্চাত্যের সঙ্গে তার পার্থক্য যথেষ্ট লক্ষ্যযোগ্য। —এই পার্থক্য একই সঙ্গে আমাদের জন্য আনন্দের ও বিষাদের। আনন্দের এই জন্য যে এতে করে' আমাদের একটা বিশিষ্ট সত্তার পরিচয় আমরা লাভ করি— অসভ্য বা অর্ধসভ্য জাতির মত আমরা শুধু ইয়োরোপের প্রতিধ্বনি মাত্র নই; আর বিষাদের এই জন্য যে আমাদের জাতীয় চিন্তা ও কর্ম-পরম্পরার ভিতর দিয়ে আমাদের যে ব্যক্তি সুপ্রকট হয়ে ওঠে সেটি অতীতের অশেষ অভিজ্ঞতাপুষ্ট অকুতোভয় আধুনিক মানুষের ব্যক্তিত্ব নয়, সেটি অনেকখানি অল্প পরিসর শাস্ত্রশাসিত মধ্যযুগীয় মানুষের ব্যক্তিত্ব।

এই সঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে রামমোহন থেকে আমাদের দেশে যে নবচিন্তা ও ভাবধারার সূচনা হয়েছে পরে পরের চিন্তা ও কর্মধারা কেবল যে তা'র পরিপেতষক হয়েছে তা নয়, এমন কি প্রবল ভাবে তার বিরুদ্ধাচারীই হয়েছে বেশী। আর উদ্দেশ্য-আদর্শের এই সমস্ত একটা বীর্যবন্ত সামঞ্জস্য লাভ করে আমাদের জাতীয় জীবন ও কর্মের যে একটা বিশিষ্ট ধারা সূচিত করবে তা থেকেও আমরা এখনো দূরে।

(২)

বাংলার নবজাগরণের প্রভাত-নক্ষত্র যে রাজা রামমোহন রায় সে সম্বন্ধে কোনো মতভেদ নেই। কিন্তু তাঁকে জাতীয় জাগরণের প্রভাত-নক্ষত্র না বলে প্রভাত-সূর্য বলাই উচিত; কেননা, জাতীয় জীবনে কেবলমাত্র একটি নব চৈতন্যের সাড়াই তাঁর ভিতরে অনুভূত হয় না, সেই দিনে এমন একটি বিরাট নব আদর্শ তিনি জাতির সামনে উপস্থাপিত করে গেছেন যে এই শত বৎসরেও আমাদের

দেশে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেননি যার আদর্শ রামমোহনের আদর্শের সঙ্গে তুলিত হতে পারে। এমন কি, এই শত বৎসরে আমাদের দেশে অন্যান্য যে সমস্ত ভাবুক ও কর্মী জন্মেছেন তাঁদের প্রয়াসকে পাদপীঠ-রূপে ব্যবহার করে তার উপর রামমোহনের আদর্শের নব প্রতিষ্ঠা করলে দেশের জন্য একটা সত্যকার কল্যাণের কাজ হবে—এই আমাদের বিশ্বাস।

এই রামমোহন যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ ইত্যাদির দিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তবু একথা সত্য যে এই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্রবের তিনি এসেছিলেন পূর্ণ যৌবনে। তার আগে আরবী ফারসী ও সংস্কৃত-অভিজ্ঞ রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাদানুবাদ করেছেন, গৃহ ত্যাগ করে তিব্বত উত্তর ভারত ভ্রমণ করেছেন, আর সেই অবস্থায় নানক কবীর প্রভৃতি ভক্তদের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন— যাঁরা হিন্দু-চিন্তার উত্তরাধিকার স্বীকার করেও পৌত্তলিকতা অবতারবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। এই সব ভেবে দেখলে ও তাঁর চিত্তের উপর মোতাজেলা সুফি প্রভৃতির প্রভাবের কথা স্মরণ করলে বলতে ইচ্ছে হয়, ভারতে মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের সভ্যতা ও ধর্মের সংঘর্ষ থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন যে নানক কবীর দাদু আকবর আবুল ফজল দারাশেকো প্রভৃতি ভক্ত ভাবুক ও কর্মীর দল, অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের রামমোহন তাঁদেরই অন্যতম। অবশ্য মধ্যযুগের সমস্ত খোলস চুকিয়ে দেওয়া একেবারে আধুনিক কালের এক পরম শক্তিমান মানুষের চিত্ত ক্রমেই আমরা তাঁর ভিতরে বেশী করে অনুভব করতে পারছি। কিন্তু সেটি হয়ত তাঁর উপর আধুনিক কালের ইয়োরোপের প্রভাবের জন্যই নয়, আধুনিক ইয়োরোপ যেমন করে মধ্যযুগেরই কুক্ষি থেকে উদ্গত হয়েছে রামমোহনের বিকাশও হয়ত সেই ধরনেরই ব্যাপার।

এই একটি লোক রামমোহন হিন্দুর সঙ্গে তর্ক করেছেন বেদ উপনিষৎ রামায়ণ মহাভারত পুরাণ তন্ত্র সংহিতা ও সেই সমস্তের টীকা নিয়ে, মুসলমানের সঙ্গে তর্ক করেছেন কোরআন হাদিস ফেকা মন্তেক ইত্যাদি নিয়ে, আর খ্রিষ্টানের সঙ্গে তর্কে ব্যবহার করেছেন ইংরেজি গ্রীক ও হিব্রু বাইবেল ও বড় বড় খ্রিষ্টান পণ্ডিতের মতামত। এই লোকটিই আবার সতীদাহ নিবারণের জন্য লড়েছেন— মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা চীনের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য, নারীর অধিকার, বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজের শাসনের সমালোচনা ও সেই ক্ষেত্রে পথনির্দেশ, এই একটি লোকেরই কর্মের প্রেরণা যুগিয়েছে। এই বিরাট পুরুষের জীবন-কথা ও বিভিন্ন রচনার আলোকে-পথের পথিক দেশের তরুণ-সম্প্রদায়ের নিত্য-সঙ্গি হবার যোগ্য। কিন্তু এই আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের দ্রষ্টব্য—দেশের সামনে কি নির্দেশ তিনি রেখে

গেলেন। সেই সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে বলতে পারা যায়, ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ এক নিরাকার পরমব্রহ্মের উপাসনা, লোকশ্রেয়ঃ ও বিচার বুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত শাস্ত্র, সেইজন্য পরে পরের উপশাস্ত্রসমূহ প্রত্যাখ্যান করে প্রত্যাবর্তন মূল শাস্ত্রসমূহে; শিক্ষার ক্ষেত্রে-ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ অনুশীলন; সমাজের ক্ষেত্রে—লোকহিতকর অনুষ্ঠানসমূহের প্রবর্তনা, যা অনিষ্টকর তা প্রাচীন হলেও বর্জনীয়; আর রাজনীতির ক্ষেত্রে Dominion Status এর মতো একটা কিছুর আশা রাখা। এমনিভাবে নানা আন্দোলনে সমগ্র দেশ আন্দোলিত করে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন —সেই যাত্রা তাঁর মহাযাত্রা।[৭৫]

(৩)

রামমোহন জাতীয় জীবনে যে সমস্ত কর্মের প্রবর্তনার সঙ্কল্প করেছিলেন তার মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু কলেজ অনতিবিলম্বে ফল প্রসব করতে আরম্ভ করে। হিন্দু কলেজের সঙ্গে ডিরোজিওর নাম চিরদিনের জন্য এক সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। এই ডিরোজিও যে গুরুর শিষ্য ফরাসী-বিপ্লবের চিন্তার-স্বাধীনতা-বহ্নি তাঁর ভিতরে প্রজ্জ্বলিত ছিল। ডিরোজিওর সেই বহ্নি-দীক্ষা হয়েছিল। অল্প বয়সে যথেষ্ট বিদ্যা অর্জন করে কবি ও চিন্তাশীল রূপে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বিশ বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক রূপে নিয়োজিত হন, আর তিন বৎসর শিক্ষকতা করার পর সেখান থেকে বিতাড়িত হন। এরই ভিতরে তাঁর শিষ্যদের চিত্তে যে আগুন তিনি জ্বালিয়ে দেন তাঁর কলেজ পরিত্যাগের বহুদিন পর্যন্ত তার তেজ মন্দীভূত হয় নি। শুধু তাই নয়, নব্যবঙ্গের গুরুদের ভিতরে এই ডিরোজিওর এক বিশিষ্ট স্থান আছে। এর শিষ্যেরা অনেকেই চরিত্র বিদ্যা সত্যানুরাগ ইত্যাদির জন্য জাতীয় জীবনে গৌরবের আসন লাভ করেছিলেন এরই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের আচার-বিচার বিধি-নিষেধ ইত্যাদির লঙ্ঘন দ্বারা সুনাম বা কুনাম অর্জন করে সমস্ত সমাজের ভিতরে একটা নব মনোভাবের প্রবর্তনা করেন।

ডিরোজিওর দলকে আমাদের কোনো কোনো সাহিত্যিক প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছেন রামমোহনের বিরুদ্ধ দল বলে; কেননা এই দল ধর্ম বিষয়ে উদাসীন তো ছিলেনই অনেক সময় নাস্তিকভাবাপন্ন ছিলেন, আর "If we hate anything from the bottom of our heart it is Hinduism" একথা তাঁদের কেউ কেউ প্রকাশ্যভাবেই ঘোষণা করতেন। তবু এই ডিরোজিওর

---

৭৫. দ্রঃ 'রামমোহন রায়'

দল প্রকৃত প্রস্তাবে হয়ত রামমোহনের ব্রহ্মসমাজের নেতা ও ডিরোজিওর দলের অনেকে উত্তরকালে রামমোহনের ব্রহ্মসমাজের নেতা ও কর্মী হয়েছিলেন, আর বিদ্যা চরিত্রবল জনহিতৈষণা ইত্যাদি গুণে এঁরা যেভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছেন তাতে রামমোহনের বিদেহআত্মার স্নেহাশিষই হয়ত তাঁরা লাভ করেছিলেন।

রামমোহন ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চমৎকারিত্বের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মাত্র, কিন্তু সেই জ্ঞানের স্বাদ বাঙালি প্রকৃত প্রস্তাবে পায় ডিরোজিওর কাছ থেকে। এই স্বাদের চমৎকারিত্ব কত তা এই থেকে বোঝা যাবে যে বাংলার চির-আদরের মধুসূদন এই ডিরোজিও-প্রভাবের গৌণ ফল। তা ছাড়া সাধারণত বিদ্যানুরাগী বাঙালি হিন্দু এই ডিরোজিওর প্রদর্শিত পথে উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আজো বাঙ্গালি হিন্দুর বিদ্যানুরাগ কমে নি, কিন্তু ডিরোজিওর শিষ্য-প্রশিষ্যদের সেই আন্তরিকতার লালিমা একটু কেমনতর হয়ে গেছে বৈ কি।

কিন্তু এত গুণ ও কার্যকারিতা সত্বেও, স্বীকার করতে হবে, ডিরোজিওর দল দুই এক পুরুষের বেশী প্রাণ ধারণ করে থাকতে সমর্থ হন নি, আর আজ তাঁরা বাস্তবিকই নির্মূল হয়ে গেছেন। কেন এমন হয়েছে তা ভাবতে গিয়ে হয়ত বলতে পারা যায়, তাঁরা দেশের ইতিহাসকে একটুও খাতির করতে চান নি— পবননন্দনের মতো আস্তো ইয়োরোপ-গন্ধমাদন এদেশে বসিয়ে দিতে তাঁরা প্রয়াস পেয়েছিলেন। তবে অন্য একটি কথাও ভাববার আছে। তাঁরা যাই কেন করুন না দীনচিত্ত তাঁরা ছিলেন না— তাঁদের কামনা ভাবনা বাস্তবিকই রূপ নিয়েছিল তাঁদের জীবনে। আর সেই ডিরোজিওর শিষ্য প্রশিষ্যদের চাইতে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু যে সারাংশে উন্নততর জীব তাও হয়ত সত্য নয়। —তবু সেই ব্যক্তিত্ব ও সুরুচি-সমন্বিত প্রাণবান সারবান অপেক্ষাকৃত সরল-চিত্ত ডিরোজিও-দল আমাদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। অবশ্য চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন কিনা কে জানে। —কে জানে এত জাতি-সম্প্রদায় বিখণ্ডিত এত শাস্ত্র-উপশাস্ত্র-ভার-ক্লিষ্ট এত পূর্ণাবতার-খণ্ডাবতার নিপীড়িত বাঙালি-জীবন আবার কোনোদিন বলবে কি না— Derozio. Bengal hath need ot thee!

(৪)

রামমোহনের শ্রেষ্ঠ দান কি তা নিয়ে আগেও বাংলাদেশে তর্কবিতর্ক হয়েছে, ভবিষ্যতের জন্যও যে সে-তর্কবিতর্কের প্রয়োজনীয়তা চুকে গেছে তা নয়। তবে যে সমস্ত বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে তার মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের বাদানুবাদই সুবিখ্যাত। দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর-প্রেমিক পুরুষ ছিলেন।

হাফিজের যে সব লাইন তাঁ অতিপ্রিয় ছিল তার একটি এই— হরগিজম মোহরে তু আজ লওহে দিল ও জাঁন রওদ;[৭৬] তাঁর জীবনের সমস্ত সম্পদ-বিপদের ভিতর দিয়ে তাঁর এই প্রেমের পরিচয় তাঁর দেশবাসীরা পেয়েছেন। প্রথম জীবনেই যে পরীক্ষায় তাঁকে উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল তা কঠোর —সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সর্বস্ব দানে তিনি পিতৃঋণ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। সত্যের যাত্রাপথ "মহান মৃত্যুর"র এমনিভাবে সম্মুখীন হওয়া সমস্ত বাঙালি-জীবনে এক মহা-ঘটনা যাকে বেষ্টন করে বাংলার ভাবস্রোতের নৃত্য চলতে পারে —হয়ত চলেছে। কিন্তু গুহাপথের যাত্রী হয়েও দেবেন্দ্রনাথ গভীরভাবে জ্ঞানানুরাগী ও সৌন্দর্যানুরাগী ছিলেন। তবু সংসারনিষ্ঠা জ্ঞানানুশীলন সৌন্দর্যস্পৃহা সমস্তের ভিতরে ঈশ্বর-প্রেমই ছিল তাঁর অন্তরতম বস্তু। তাই তিনি যে রামমোহনকে মুখ্যত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারকরূপে দেখবেন এ স্বাভাবিক। কিন্তু অক্ষয়কুমার ছিলেন জ্ঞানপিপাসু; সে-পিপাসা এমন প্রবল যে এত দিনেও বাংলাদেশে সে রকম লোক অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। এই অক্ষয়কুমার মত প্রকাশ করেছেন যে রাজার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার। জ্ঞানানুশীলন অক্ষয়কুমারের কাছে এত বড় জিনিস ছিল যে এ ভিন্ন অন্য রকমের প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করতেন না। তাঁর সেই সুবিখ্যাত সমীকরণ বাংলার চিন্তার ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। শুধু প্রার্থনার যে কিছুমাত্র কার্যকারিতা নেই তা প্রতিপন্ন করবার জন্য তিনি লিখেছেন কৃষক পরিশ্রম করে শস্য উৎপাদন করে প্রার্থনা করে নয়। একেই তিনি একটি সমীকরণের রূপ দিয়েছেন এইভাবে :

$$\text{প্রার্থনা} + \text{পরিশ্রম} = \text{শস্য}$$
$$\text{পরিশ্রম} = \text{শস্য}$$
$$\therefore \quad \text{প্রার্থনা} = 0$$

অক্ষয়কুমারের এই মনোভাব কিছুদিন ব্রাহ্ম সমাজে ও সেইদিনের ছাত্র-মহলে কার্যকর হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রভাব ব্রাহ্ম সমাজে অক্ষুণ্ন হয় নি— হয়তো বা দেশের বৃহত্তর জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমন ফলপ্রসূ হয় নি।

শেষ পর্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানই রামমোহনের পরে ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করেছিল; আর নানা বিপর্যের পর আজো তাঁর নির্দেশই হয়তো অধিকাংশ ব্রাহ্মের মনোজীবনে কার্যকর রয়েছে।

---

৭৬. তোমার ছাপ আমার চিত্ত-ফলক থেকে কিছুতেই মুছবে না।

কারো কারো বিশ্বাস দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের যে রূপ দিয়েছিলেন তা রামমোহনের উদ্দেশ্য আদর্শ থেকে পৃথক বস্তু। কিন্তু তা সত্য নয় এই জন্য যে যে-দ্বৈতবাদের উপর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের ভিত্তি পত্তন করেছিলেন রামমোহনের জীবনে তারই প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সত্য বটে তিনি বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্য-অবলম্বন করেছিলেন; কিন্তু শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তাঁর মতভেদ বিস্তর; এমন কি, অধিকাংশ হিন্দু সাধক ও দার্শনিকের অবলম্বিত Pantheistic God-এর চাইতে হিব্রু প্রফেটদের ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত, পাপ পুণ্য ভাল-মন্দের নিয়ামক, ঈশ্বরের দিকেই তাঁর চিত্তের প্রবণতা হয়তো বেশী ছিল। তবে রামমোহনের চিত্তের প্রসার ছিল অনেক বেশী তাই ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্মের যে রূপ দিয়েছিলেন, কর্মী জ্ঞানী ও অন্তঃ প্রবাহী ভক্তিরস সমন্বিত রামমোহনের বিরাট ইচ্ছাধারা তাতে অবলীলাক্রমে প্রবাহিত হতে পারবে তা আশা করা সঙ্গত নয়। কোনো বড় স্রষ্টাই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পুরোপুরি ধরা পড়েন নি; রামমোহনের সূচিত ব্রাহ্ম-সমাজ যদি তাঁর বিরাট বিত্তের প্রতিচ্ছবি হয়ে না থাকে তবে তাতে দুঃখ করবার বিশেষ কিছু নেই।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্মের যে রূপ দিয়েছিলেন তাতে যে শুধু তাঁর ভক্তি উচ্ছলিত চিত্তের তরঙ্গাভিঘাতই বুঝতে পারা গেছে তা সত্য নয়। ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তিভূমি নির্ণয়ে তিনি যে মনীষার পরিচয় দিয়েছেন তাতে দেশের চিত্ত-বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর একটি বড় আসন লাভ হয়েছে। প্রথমে বেদকে ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি রূপে গ্রহণ করতে চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল বেদের সব কিছু আশানুরূপ সুন্দর নয়। তারপর তিনি নির্ভর করতে গেলেন উপনিষদের উপরে। সেখানেও মুশকিল যে উপনিষৎ বহু বহু রকমের, তাঁর উপর শুধু দ্বৈতবাদের প্রতিপাদক বচনই নয় অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদক বচনের সংখ্যাও তাতে কম নয়। এই সঙ্কটে জ্ঞানবীর অক্ষয়কুমারের পরামর্শ মতো "আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়" এর উপর ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করা হ'লো। এই ভাবে মানুষের চিত্তকে যে নূতন করে এক গরীয়ান আসন দেওয়া হলো, তার অর্থ কত, ইঙ্গিত কি বিপুল, দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলার জাতীয় জীবনের সামনে থেকে আজ সেসব চিন্তা দূরে স্থিত। তাই জাতীয় জীবনে অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথের এই দানের জন্য তাঁদের প্রতি তাঁদের স্বদেশবাসীদের অন্তরের শ্রদ্ধা-নিবেদন আজো তেমন পর্যাপ্ত নয়।

(৫)

আমরা বলেছি বাংলায় এ পর্যন্ত যে চিন্তা ও কর্মধারার বিকাশ হয়েছে তাতে মধ্যযুগীয় প্রভাব বেশী। দেবেন্দ্রনাথের কার্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি মানুষের চিত্তকে ব্রহ্ম পাদপীঠ বলে সম্মান দিয়েছেন, শুধু প্রাচীন ঋষিদের যে কেবল সে অধিকার ছিল তা তিনি মানেন নি। -কিন্তু এই আবিষ্কৃত সত্যের পুরো ব্যবহারে

তিনি যেন কেমন সঙ্কোচ বোধ করেছেন। এই "আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জলিত বিশুদ্ধ হৃদয়" কথাটি তিনি পেয়েছিলেন উপনিষৎ থেকে —নিজের জীবনের ভিতরে এ কথার সায় তিনি নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন। কিন্তু অনন্ত প্রয়োজনতাড়িত মানুষকে এই অমৃতের সাধনা জীবনের সমস্ত কর্ম সমস্ত অবসর সমস্ত প্রার্থনা সমস্ত অপ্রার্থনার ভিতর দিয়ে করতে হবে, শুধু বিধিবদ্ধ প্রার্থনার ভিতর দিয়েই নয়— এতটা অগ্রসর হতে তিনি যেন পশ্চাৎপদ হয়েছেন। হয়তো বৃহত্তর মনীষা নিয়ে তিনি যদি অক্ষয়কুমারকে আত্মসাৎ করতে পারতেন তা হলে ব্রাহ্মসমাজ তাঁর হাতে যে রূপ লাভ করত তা দেশের পক্ষে আরো কল্যাণদায়ক হতো।

দেবেন্দ্রনাথের এই যে অন্তরে অন্তরে সেই ব্রহ্মোল্লাস অনুভব করা, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যে তার দৈনন্দিন জীবনে জ্ঞান ও কর্মের ভিতর দিয়ে শ্রেয়ের অন্বেষণ করে যাবে, যে-অন্বেষণ মুখের প্রার্থনার প্রয়োজন সে অনুভব করতে পারে, নাও পারে, —অনন্ত কর্ম-ও প্রেম পুলকিত মানুষের জীবনে তার আরাধ্য হয়তো তারই জীবনের সুরভি, হয়তো তার জ্ঞানক্ষেত্রে বিশ্বজগতের নিয়মক, হয়তো বিশ্বজগতের জন্য তার প্রেমের বন্ধন, হয়তো কর্মক্ষেত্রে তার চিরজাগ্রত নেতা, অক্ষয়কুমারের ভিতর দিয়ে উৎসারিত এই আধুনিক মনোভাবকে তিনি তেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারেন নি, এইখানেই তাঁর মধ্যযুগীয়ত্ব; —এবং আধুনিক জীবনোযোগী জ্ঞানানুরাগ সুমার্জিত জীবন-যাপন ইত্যাদি সত্ত্বেও তিনি যে বৃদ্ধবয়সে ভাবের আতিশয্যে নৃত্য করতে পেরেছিলেন হয়তো তাঁর এই প্রগলভা মধ্য-যুগীয় ভক্তিই তার কারণ। অবশ্য মধ্যযুগীয় বলে সে জিনিসটি যে তাচ্ছিল্য বা অসম্ভ্রমের চক্ষে আমরা দেখতে প্রয়াস পাচ্ছি সে কথা মনে করলে আমাদের প্রতি অবিচার করা হবে। এখানে শুধু এই কথাটি আমার বলতে চাচ্ছি যে এত চেষ্টা সত্ত্বেও আধুনিক অগ্রসর জাতিদের সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে চলবার সামর্থ্য যে আমাদের হচ্ছে না তার এক বড় কারণ আমাদের যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁরাও খুব কমই আধুনিক জীবনের দিকে তাকিয়েছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রৌঢ় বয়সে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের নেতা হন। তাঁর উপর খ্রিস্টের জীবন ও বাইবেলের প্রভাব বিশেষরূপে কার্যকর হয়েছিল। কেশবচন্দ্রের প্রকৃতির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির যে বিশেষ পার্থক্য ছিল অনেকেই সে কথা বলেছেন। কিন্তু এক জায়গায় বড় গভীর মিলও ছিল, সেখানে হয়তো কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথেরই মানস-পুত্র—সেটি, প্রগলভা ভক্তি। দেবেন্দ্রনাথ রাশভারী লোক ছিলেন, তাই তাঁর অন্তরের এই প্রগলভা ভক্তি তাঁর বাইরের চেহারা ক্বচিৎ আলুথালু করতে পেরেছে। কিন্তু কেশবচন্দ্র আজন্ম "অগ্নিমন্ত্রের"র উপাসক। এই প্রগলভা ভক্তি তাঁকে প্রায় সব ধর্মের অনুষ্ঠান ইত্যাদির দিকে নিয়ে গেছে, নিত্য নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে, আর শেষে

জগতের সমস্ত ধর্মের সার সংগ্রহ করে এক "নব বিধান" বা নব ধর্মের পত্তনে অনুপ্রাণিত করেছে। কেশবচন্দ্র যে শেষ বয়সে পরমহংস রামকৃষ্ণের প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করেছিলেন সেটি কিছুমাত্র আশ্চর্য বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। বাংলার চির-পরিচিত প্রগলভা ভক্তি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার এই এক অদ্ভুত পুরুষ রামকৃষ্ণের জীবনে আশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছিল। যার প্রেরণায় কেশবচন্দ্র আজীবন নানা পথে ছুটাছুটি করেছেন তা এমন পর্যাপ্ত পরিমাণে কারো ভিতরে সঞ্চিত দেখতে পেলে সেখানে তিনি যে নিজেকে বিকিয়ে দেবেন এ যেমন স্বাভাবিক তেমনি সঙ্গত।

(৬)

সব ধর্মই কি সত্য? এ প্রশ্নের মীমাংসায় রামমোহন বলেছিলেন—বিভিন্ন ধর্মের ভিতরে পরস্পরবিরোধী অনেক নিত্যবিধি বর্তমান, তাই সব ধর্মই সত্য একথা মানা যায় না, তবে সব ধর্মের ভিতরেই সত্য আছে। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের এই মীমাংসা মেনে চলেছিলেন বলতে পারা যায় যদিও উপনিষদের দিকে তিনি বেশী ঝুঁকে পড়েছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের ভক্তি প্রধান প্রকৃতির কাছে রাজার এ মীমাংসা ব্যর্থ হলো। তিনি বললেন— Our position is not that there are truths in all religions, but that all established religions of the world are true. এই কথাই রামকৃষ্ণ আরো সোজা করে বললেন—যত মত তত পথ।—যত মত তত পথ তো নিশ্চয়ই; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—সে সব কথা একই গন্তব্য স্থানে নিয়ে যায় কিনা। রামকৃষ্ণ বললেন হাঁ তাই যায়, তিনি সাধনা করে দেখেছেন শক্তি বৈষ্ণব বেদান্ত সুফী খ্রিস্টান ইত্যাদি সব পত্রই এক "অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতিতে নিয়ে যায়। এ সব কথার সামনে তর্ক বৃথা। তবে এই একটি কথা বলা যেতে পারে যে মানুষ অনেক সময়ে বেশী করে যা ভাবে চোখেও সে তাই দেখে।[৭৭] রামকৃষ্ণ পরমহংসকে কেউ বলেছেন অবতার, কেউ বলেছেন উন্মাদ। কিন্তু যিনি যাই বলুন বাংলার হিন্দু চিত্তের উপর তাঁর কথার প্রভাব যে অত্যন্ত বেশী তাতে সন্দেহ নেই। পৌরাণিক ধর্মকে সরিয়ে দিয়ে তার স্থানে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন উপনিষদের ব্রাহ্মজ্ঞান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিন্দু জনসাধারণের কাছে প্রতিপন্ন হয়েছে—পৌরাণিক ধর্মের কিছুই বাজে নয়, তাই পরতে পরতে রয়েছে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, হয়তো বা তার চাইতেও ভাল কিছু।

---

৭৭. যত মত তত পথ—এ কথাটির ভিতরে চিন্তার কিছু শিথিলতা আছে। পথ বহু নিশ্চয়ই, কিন্তু যে চলতে চায় তার জন্য একটি বিশেষ পথই পথ, আর জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক সেই পথটি সে নির্বাচন করে বহু পথের ভিতর থেকে।

বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মচর্চার উপরে যে একটা মধ্যযুগীয় ছাপ মারা রয়েছে তা আমরা দেখেছি। কিন্তু বাংলার নববিকশিত সাহিত্যে যেন এই ত্রুটির ক্ষালণের চেষ্টা প্রথম থেকেই হয়ে আসছে। বাংলার নবসাহিত্যের নেতা মধুসূদন আশ্চর্য উদার চিত্ত নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; জাতি ধর্ম ইত্যাদি সঙ্কীর্ণতা যেন জীবনে ক্ষণকালের জন্যও তাকে স্পর্শ করতে পারে নি; আর এই উদারচিত্ত কবি ইয়োরোপের ও ভারতের প্রাচীন কাব্য কলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ যেভাবে অবলীলাক্রমে আহরণ করে' তাঁর স্বদেশবাসীদের উপহার দিয়েছেন সে কথা বাঙালি চিরদিনই বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। —তাঁর পরে সাহিত্যের যে নেতা বাঙালি জীবনের উপর একটা অক্ষয় ছাপ রেখে গেছেন তিনিও প্রথমজীবনে শিল্পী, সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা অস্পৃষ্ট। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে কবিজনসুলভ স্বপ্ন কম। তিনি বরং নিপুণ চিত্রকর ও বাস্তববাদী স্বদেশপ্রেমিক। তাই তাঁর যে অমরকীর্তি "আনন্দমঠ" তাতে হয়ত নায়ক নায়িকার গূঢ় আনন্দ-বেদনার রেখাপাত তেমন নেই,[৭৮] হয়ত এমন কোনো সৌন্দর্য-মূর্তি আঁকা হয় নি যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের নয়নে প্রতিভাত হবে a thing of beauty আর সেই জন্য a joy for ever. কিন্তু তবু এটি অমর এইজন্য যে এতে যেন লেখক কি এক আশ্চর্য ক্ষমতায় পাঠকের সামনে প্রসারিত করে ধরেছেন দেশের-দুর্দশা-মথিত তাঁর রক্তাক্ত হৃদয়— যে হৃদয় তার সুগভীর বাস্তবতার জন্যই সৌন্দর্যের রহস্যময় খনি।

সব সাধনা এক বিশেষ অনুভূতিতে নিয়ে যায়—এ কথাটির চারপাশেও কিছু স্থূলতা আছে। কাব্য সম্বন্ধে যেমন একটি নির্বিশেষ রসই একমাত্র কথা নয়, তেমনিভাবে সব ধর্মই সত্য বা সব ধর্মেরই লক্ষ্য এক এসব কথার উপরে বেশি জোর দিলে মানুষের অনেকখানি চেষ্টার সঙ্গে আমাদের অপরিচয় ঘটে। তাই এসব কথা থেকে জীবনে পর্যাপ্ত প্রেরণালাভ সম্ভবপর না হবারই কথা।

রামকৃষ্ণের এই সব উক্তি ভিত্তি করে তাঁকে একালের এক বড় সমন্বয়াচার্যরূপে দাঁড় করাবার চেষ্টা আমাদের কোনো কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি করেছেন। তাঁদের সেই চেষ্টার সফলতার পথে বিঘ্ন আছে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া সমন্বয় কথাটাও একটু বুঝে দেখা দরকার। সমন্বয় সাধারণত দুই ভাবে দেখা যেতে পারে—মতবাদের সমন্বয় ও জীবনের সমন্বয়। বলা বাহুল্য জীবনের সমন্বয়ই বড় কথা, মানুষের যারা নেতৃস্থানীয় তাদের মাহাত্ম্যের পরিমাপ এই থেকে। এই জীবনের বিরাটত্বের দিকে রামকৃষ্ণ যথেষ্ট অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন এ কথা বললে তাঁর প্রতি বোধ হয় অসত্যের আরোপ করা হবে। বরং তাঁর সম্বন্ধে বোধ হয় এইই সত্য যে তাঁর অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছিল মানুষের জন্য এক সুনিবিড় স্নেহ, তাই মানুষকে তিনি শুনিয়েছিলেন কিছু আশ্বাসের বাণী। তাই তিনিও আমাদের একজন বড় শিক্ষক—বন্ধু। কিন্তু আমাদের কোনো গুরু সম্বন্ধেই অতিরঞ্জিত বা অসত্যের ধারণা থাকা আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য অকল্যাণকর। (রামমোহন রায় দ্রঃ)

৭৮. স্বল্প পরিসরে ভাবানন্দের অন্তর্দ্বন্দ্ব অঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবল অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত শিল্পের ক্ষেত্রে থাকতে পারেন নি; শেষ বয়সে ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি অবতরণ করেছিলেন। তাঁর চরিতাখ্যায়কেরা বলেন, আত্মীয়বিয়োগে অধীর হয়ে তিনি ধর্মে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ধর্ম তত্ত্বে ও কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে শ্রমস্বীকার করেছেন, যে সুবৃহৎ আদর্শ স্বজাতির সামনে দাঁড় করাতে চেয়েছেন তাকে আর্তের কর্ম না বলাই সঙ্গত। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধর্মালোচনায়ও দেখতে পাওয়া যায় তাঁর দেশহিতৈষণা। তবু বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত দেশের অগ্রগতিকে খানিকটা সাহায্য করলেও বেশী সাহায্য করতে পারে নি, কেননা দেশ বলতে কেমন করে তিনি বুঝেছিলেন দেশেও হিন্দু তাও আবার সকল হিন্দু নয় সমসাময়িক শাসক ও সংস্কারকদের হাতে যে হিন্দু কিছু দিশেহারা হয়ে পড়েছিল সেই হিন্দু। এখানেও তাঁর সেই স্বদেশ-প্রেম; কিন্তু এ প্রেম খুব গভীর হলেও কিছু একরোখা, তাই শেষ পর্যন্ত জাতির ত্রাণকর্তার বড় আসন তাঁর স্বদেশবাসীরা হয়ত তাঁকে দিতে পারবেন না।

জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনায় রামমোহনের সুর শেষ পর্যন্ত তাঁর পশ্চাদবর্তীরা রাখতে পারেন নি" সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি মধুসূদন যে গ্রামে সুর ধরেছিলেন তা নেমে গেল। বঙ্কিমচন্দ্রই যখন নিজেকে দেশের কল্যাণের রাজপথে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারলেন না "অন্যে পরে কা কথা"। তাই তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের রচনার পরিমাণ যতই বেশী হোক, দশের করতালিতে যতই তাঁদের সাহিত্যিক জীবন মুখরিত হয়ে থাকুক, বাংলার চিত্তের সাধনে সাহায্য তাঁরা কিছুই করতে পারেন নি বললে চলে; বরং ধর্মের ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় ভাবোন্মত্ততা সুপ্রকট হয়ে উঠল, নানা ভাবে তাকেই তাঁরা প্রদক্ষিণ করেছেন।

(৮)

কিন্তু বাংলাদেশ এমনিতর একটা প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়েই চলেছে, বৃহত্তর জীবনের দিকে তার গতি রুদ্ধ, এতটা বলতে গেলে সত্যের অপলাপ করা হবে। রামমোহন যে কর্ম ও চিন্তার সূচনা করে গেলেন ও তাঁর পরে কেশবচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভিতর দিয়ে তার যে একটি প্রতিক্রিয়া হলো, এসব বিরোধ কোনো এক বীর্যবন্ত সামঞ্জস্যে উপনীত হয় নি, ও তার জন্য বাঙালির জাতীয় চরিত্র ও কর্মধারা একটা সুদর্শন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে নি, এ সত্য; কিন্তু এ বিরোধ চুকিয়ে দিয়ে একটা উদার বীর্যবন্ত জাতীয়তার দিকে চোখ দেবার চেষ্টা যে কারোই নেই তা সত্য নয়। জাতির এ নব প্রয়োজন দুইজন চিন্তা ও কর্মবীরের জীবনের ভিতর দিয়ে ফুটেছে—একজন বিবেকানন্দ অপরজন রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দ পরমহংস রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য ছিলেন, রামকৃষ্ণের

সাধনা ও সিদ্ধি ব্যাপারটি আমরা বুঝি আর নাই বুঝি কিন্তু এ সত্য যে তিনি বার বার জোর দিয়েছেন জগৎ-হিতের উপরে। এ উপেক্ষা করে বিবেকানন্দ মুক্তির প্রার্থী হয়েছিলেন, তার জন্য তিনি তাঁকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের ভিতরে দোষ কম নয়, প্রথমত রবীন্দ্রনাথের "গোরা"র মতো সব সময়ে তিনি যেন বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে লড়বার জন্য তৈয়ার, দ্বিতীয়ত সন্ন্যাস বেদান্তের তিনি গোঁড়া, তৃতীয়ত ব্রাহ্মদের যে তিনি নিন্দা করেছেন তাদের, ঐতিহাসিক বোধ নেই বলে সে অভিযোগটি তাঁর সম্বন্ধেও খাটে—ব্রাহ্মদের সংস্কারের প্রয়াসের কোনো অর্থ তিনি যেন খুঁজে পান নি, অথচ তিনি নিজে একজন ছোটখাট সংস্কারক ছিলেন না; চতুর্থত ভারত আধ্যাত্মিক ইয়োরোপ জড়বাদী ভারতকে ইয়োরোপের আচার্য হতে হবে এই ধরনের কতকগুলো কথা প্রচার করে স্বজাতির অন্তঃসারশূন্য দম্ভের সহায়তাই তিনি বেশী করেছেন; তবু মোটের উপর এই বীরহৃদয় সন্ন্যাসী সত্যকার স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন— মানব প্রেমিকও ছিলেন। তাই সেবাশ্রম প্রভৃতির সূচনা করে জাতীয় জীবনে তিনি যে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র রচনা করেছেন জাতির চিত্তপ্রসারের জন্য বাস্তবিকই তা অমূল্য, এবং জাতীয় জীবনের দৈন্যের জন্য নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই সব প্রতিষ্ঠান বাংলার হিন্দু যুবককে দেশের সত্যকার সন্তান হতে অনেকখানি সাহায্য করছে তাতে সন্দেহ নেই।

তারপর রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তার যে রূপ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্কীর্ণতা ভেঙে তাকে বৃহত্তর করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু তাঁর আদর্শের অনুপ্রেরণা এ পর্যন্ত বাংলার জাতীয় জীবনে কমই অনুভূত হয়েছে; এখন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়ত্বের আদর্শই দেশের জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে, বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কবি, তাও আবার সূক্ষ্ম-শিল্পি গীতিকবি, তাই যে মহা-মানবতার গান তিনি গেয়েছেন আমাদের স্থূল-প্রকৃতি জন-সাধারণের কত দিনে তার স্পন্দন জাগবে তা ভেবে পাওয়া দুষ্কর।

(৯)

হিন্দুর নিজের ভিতরেই মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সংগ্রামের যখন এই চেহারা,— তখন আর এক সমস্যা দেখা দিয়েছে— হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা যেভাবে উঠেছে তা একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের দুর্দশার প্রমাণ। মুসলমানের দুর্দশা এই জন্য যে এ সংগ্রামে সে যেভাবে জয়ী হবার স্বপ্ন দেখে তা থেকে বুঝতে পারা যায় তার স্বপ্ন দেখারই অবস্থা। বাস্তবিকই মুসলমানের অবস্থা খুবই বিস্ময়কর— এতদিন ধরে পরিবর্তিত অবস্থায় বাস করেও তন্দ্রার ঘোরে দুই একটি প্যানইসলামী বোলচাল দেওয়া ভিন্ন পারিপার্শ্বিক

অবস্থা সম্বন্ধে কোনরূপ জাগ্রত চিত্ততার পরিচয় সে আজ পর্যন্ত দেয় নি। আর হিন্দুর জন্য আফসোসের এই জন্য যে তার এত সংস্কার চেষ্টা এত সাধনা সত্ত্বেও এই সমস্যার একটা মীমাংসা করবার সামর্থ্য তার হলো না। এই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা যে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে বিধাতার জ্বালা এক তীব্র আলো, —এরই ঔজ্জ্বলে আমরা দেখে নিতে পারছি বর্তমান জগতের জ্ঞান ও কর্মের উৎসবে আমাদের স্থান কোথায়।

বাংলার যে প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে তা অনেক সময় এমন সামান্য কারণে হয়েছে যা থেকে বুঝতে পারা যায় প্রাচীন সংস্কার বাঙালির জীবনে কত বদ্ধমূল— চোখ খুলে জগতকে দেখতে সে কত নারাজ। এরই সঙ্গে কথাটি স্মরণ রাখা দরকার যে বাঙালি এ পর্যন্ত তার চোখ খোলার সাধনার বড় সাধক রামমোহনকে মোটের উপর প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। —এই প্রত্যাখ্যানের কারণ সম্বন্ধে দুটি কথা বলে যেতে পারে, —প্রথমত বাঙালি সাধারণত ভাবপ্রবণ, আর রামমোহন লোকটি যেমন আগা-গোড়া নিরেট কাণ্ডজ্ঞান, দ্বিতীয়ত বাঙালি হিন্দুর পরম আদরের প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে তিনি বেশ উচু গলায় কথা বলেছেন। —এই প্রতিবাদকারী অথচ মহাপ্রাণ রামমোহনকে বাঙালি হিন্দু শেষ পর্যন্ত কি ভাবে গ্রহণ করবে বলা সহজ নয়। কিন্তু বিশ্ব জগতের দিকে বাস্তবিকই যদি তার চোখ পড়ে তাহলে সে হয়ত দেখবে এই প্রতিবাদকারীর কথার ভিতরেই সত্যের পরিমাণ বেশী, তাই তাঁর পথ নির্দেশই অনেক পরিমাণে কল্যাণ পথের নির্দেশ। তাছাড়া রামমোহনকে গ্রহণ করা বাঙালি হিন্দুর জন্য যে শুধু আয়াস-সাধ্যই হবে এটি সঙ্গত নয় এই জন্য যে রামমোহনও বাঙালি-সন্তান, শুধু তাই নয়, তাঁর বিশাল দেহের ভিতরে যে চিত্তটি ছিল সমস্ত অভিনবত্ব সত্ত্বেও তা বাঙালিরই কোমল চিত্ত।

মনে হয়, বাঙালির রামমোহনকে গ্রহণ করার সব চাইতে বড় অন্তরায় এইখানে যে সে সাধারণত ঘর-মুখো আর রামমোহন আবাল্য ঘর-মুখো ছিলেন না। এই বাহির-মুখো হওয়ার সাধনাই হয়ত বর্তমান বাঙালি জীবনে বড় সাধনা —হয়ত এরই সাহায্যে সবলতর কাণ্ডজ্ঞান শ্রেষ্ঠতর পৌরুষ ইত্যাদি কল্যাণ পথের সম্বল আহরণ তার পক্ষে সহজ হবে। আর এই বাহির-মুখো হওয়ার উপায়ও তার অতি নিকটে। দৈব ঘটনায় বহু জাত বহু সম্প্রদায় দেশের বুকে এক জায়গায় মিলেছে, সেই মিলনকে অন্তরের দিক দিয়ে সার্থক করে তোলাই হচ্ছে বাহির-মুখো হওয়ার বড় উপায় —বাঙালির সৌভাগ্য-রূপী তার এ যুগের কবি বার বার একথা বলেছেন।

এরই সঙ্গে মুসলমানের জাগরণ যদি সত্য হয়, তাহলে কিছু বেশী সুফল লাভের সম্ভাবনা। যে গুরু তাকে উপদেশ দিয়েছেন —ক্ষুধা লাগলে খেয়ে নামাজ

পড়ো, তাঁর অনুবর্তিতায় বস্ত্রতন্ত্র তার পক্ষে স্বাভাবিক। আবার সেই জন্যই বস্তুর শিকলে বন্দী হওয়াও তার পক্ষে কম স্বাভাবিক নয়। ফলে মুসলমানের হয়েছেও তাই।—এই মনের বন্ধন সহজভাবে চুকিয়ে দিয়ে মুসলমান নব মানবতার ধ্বজা বহন করবার যোগ্য হবে কিনা, অথবা কতদিনে হবে, জানি না। যদি হয়, তবে বাংলার ধর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রে তার দান কম হবে না; তাহলে স্বাপ্নিক হিন্দু ও বস্তুতন্ত্র মুসলমান এ দুয়ের মিলনে বাংলার যে অভিনব জাতীয় জীবন গঠিত হবে— তার কীর্তি কথা বর্ণনা করবার ভার ভবিষ্যত সাহিত্যিকদের উপর থাকুক।

"মুসলিম সাহিত্য-সমাজের" দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।
ফাল্গুন, ১৩৩৪

সম্মোহিত মুসলমান

হজরত মোহাম্মদ যে একজন মহাপুরুষ, অর্থাৎ সত্য তিনি শুধু কথায় প্রচার করেননি তা তাঁর সমগ্র জীবনের ভিতরে এক আশ্চর্য-দৃঢ়রূপ লাভ করেছিল, সে সম্বন্ধে তর্ক বিচার করবার কাল বোধ হয় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখনো যাঁরা তাঁর মাহাত্ম্যের পানে সন্দিগ্ধ চিত্তে তাকান, কেননা, তিনি যুদ্ধ করেছিলেন, অথবা শেষ বয়সে বহু বিবাহ করেছিলেন, বলা যেতে পারে, কিছু সরল প্রকৃতি নিয়ে তাঁরা জীবনের জটিলতাবর্তে ঘুরপাক খেয়ে মরছেন। হয়তো তাঁদের সংস্কার আছে, মহাপুরুষের যে জীবন, শিশুর মতো সারল্যই তাতে প্রতিভাত হওয়া স্বাভাবিক ও শোভন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যাবে, তাঁদের এ সংস্কার শুধু এক মধুর খেয়াল—সত্যে, এর প্রতিষ্ঠা নয়। মহাপুরুষের জীবনে কেমন এক ঋজুতা আমরা প্রত্যক্ষ করি সত্য, আসলে কিন্তু সেটি ঋজুতার ভঙ্গিমা মাত্র। বহুভঙ্গিমতা বা মানব-মনের জটিলতা মহাপুরুষের জীবনে নিরাকৃত হয়ে যায় না; সে সমস্ত শুধু এক পরমাশ্চর্য অধিকারে একমুখিত্ব লাভ করে।

কিন্তু মহাপুরুষ মোহাম্মদের অভক্ত যে তাঁর জীবনের এই জটিলতায় বিড়ম্বিত হয়েছেন সে আর কতটুকু দুঃখের বিষয়। তার চাইতে অনেক বেশী শোচনীয় ব্যাপার তাঁর অনুবর্তী ভক্তদের ভিতরেই ঘটেছে, তাঁরাও তাঁর এই বিচিত্র অথচ ভগবন্মুখী জীবনে বিড়ম্বিত হয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মহাসাধনাকে বিড়ম্বিত করেছেন। তাঁরা তার পানে যে দৃষ্টিতে চেয়েছেন ও যে দৃষ্টিতে চাইবার জন্য অপরকে আহ্বান করেছেন, তাতে এই সহজ অথচ অতি বড় সত্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে, জগতের অনন্তকোটি মানুষের মতো হজরত মোহাম্মদও একজন মানুষ; —মানুষের ইতিহাসের এক বিশেষ স্তরে শক্তিমাহাত্ম্যে তিনি সুপ্রকট, কিন্তু তাঁর শক্তিমাহাত্ম্য-লাভই সে-ইতিহাসের চরম কথা নয়, তার চাইতে গভীরতর কথা এই, —জগৎসংসারের যিনি চির জাগ্রত নিয়ামক অনন্ত কাল ধরে তিনি এমনিভাবে শক্তিমান আর সাধারণ এই দুই শ্রেণীর চক্রের সমবায়ে সংসার রথকে চিরচলন্ত রেখেছেন। বাস্তবিক, মহাপুরুষ যে সর্বজ্ঞ নন, মানুষের সর্বময় প্রভু নন, মানুষের জীবন সংগ্রামে তিনি একজন বড় বন্ধু মাত্র—অবশ্য যেমন বন্ধু সমুদ্রচারী পোতের জন্য আলোকস্তম্ভ; তাঁর কথাও চিন্তার ধারা চিরকালের জন্য মানুষের পথকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে একথা বিশ্বাস করলে মানুষরূপে তাঁর সাধনাকে যে চরম অপমানে অপমানিত করা হয়, কেননা, সমস্ত সাধনার যা লক্ষ্য সেই আল্লাহর উপলব্ধি মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে রুদ্ধ হয়ে যায় যে আল্লাহ চিরজাগ্রত, চিরবিচিত্র, বিশ্বজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষের অন্তহীন শুভ চেষ্টায় যাঁর মহিমা প্রকটিত; হজরত মোহাম্মদের অনুবর্তীরা সেই প্রাণপ্রদ সদাস্মর্তব্য কথা অদ্ভুতভাবেই মন থেকে দূর করে দিয়েছেন;

হয়ত তারই ফলে অন্যান্য ছোটখাট প্রতিমার সামনে নতজানু হওয়ার দায় থেকে কিছু নিষ্কৃতি পেলেও "প্রেরিতত্ব" রূপ এক প্রকাণ্ড প্রতিমার সামনে নতদৃষ্টি হয়ে তাঁরা যে জীবন পাত করছেন আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা সাংসারিকতা সবদিক থেকেই তা শোচনীয়রূপে দুঃস্থ ও বিভ্রান্ত।

অথচ হজরত মোহাম্মদ সাধনার এই বিড়ম্বনা ভোগ কত বিস্ময়কর ব্যাপার! মানুষের সাষ্টাঙ্গ প্রণামকে পর্যন্ত এই মহাপুরুষ গ্রহণ করেননি। আর তাঁর আবিষ্কৃত যে বজ্রসার তৌহীদ (একশ্বরতত্ত্ব), তাঁর অবলম্বিত যে আশ্চর্য অনাড়ম্বর সাংসারিক জীবন, আগ্নেয় সাম্যবাদ, আল্লাহর পানে সে-সমস্তের যে প্রচণ্ড আকর্ষণ, কিসের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে। কিন্তু তাঁর মাহাত্ম্য যত বড়ই হোক, একথা অস্বীকার করবার কিছুমাত্র উপায় নেই যে, সেই আল্লাহর উপলব্ধি, অন্য কথায়, সমস্ত জগতের সঙ্গে প্রেম ও কল্যাণের যোগের উপলব্ধি, আজ তাঁর অনুবর্তীদের দৃষ্টির সামনে নেই। জীবনের অর্থই যেন আধুনিক মুসলমান বোঝে না। বুদ্ধি, বিচার, আত্মা, আনন্দ, এ সমস্তের গভীরতার যে আস্বাদ তা থেকে তাকে বঞ্চিত ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। জগতের পানে সে তাকায় শুধু সন্দিগ্ধ আর অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে— এর কোলে যেন সে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, একে যেন সে চেনে না। কেমন এক অস্বস্তিকর অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে সারা জীবন সে ভীত ত্রস্ত হয়ে চলেছে।

মুসলমানের, বিশেষ করে আধুনিক মুসলমানের, এই অবস্থা লক্ষ্য করেই বলতে চাই— সে সম্মোহিত। সে শুধু পৌত্তলিক নয়' সে এখন যে অবস্থায় উপনীত তাকে পৌত্তলিকতার চরম দশা বলা যেতে পারে; —তার মানবসুলভ সমস্ত বিচার বুদ্ধি, সমস্ত মানস উৎকর্ষ, আশ্চর্যভাবে স্তম্ভিত! বর্তমান তার জন্য কুয়াসাচ্ছন্ন দিগদেশবিহীন, অতীত ভবিষ্যৎ তার নেই। সময় সময় দেখা যায় বটে সে তার অতীতকালের বীরদের, রাজাদের, ত্যাগীদের মনীষীদের কথা বলছে। কিন্তু এ শেখানো বুলি আওড়ানোর চাইতে এক তিলও বেশী-কিছু নয়। জীবনকে সত্যভাবে উপলব্ধি করবার দুর্নিবার প্রয়াসের মুখেই যে উচ্ছিত হয় যুগে যুগে মানুষের বীরত্ব, ত্যাগ, শাস্ত্রজ্ঞান, মনীষা, তার প্রাচীন ইতিহাসে এর যোগ্য প্রমাণের অভাব নেই। হজরত ওমর ও ইবনে জুবেরের মতো বীর-কর্মীদের, সাদী-ওমরখাইয়ামের মতো মনীষীদের, গাজ্জালী-রুমির মতো সাধকদের, জীবনের অন্তস্থল দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ কথা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবনরহস্যের সেই গহনে উঁকি দেবে, এই সম্মোহিতের কাছ থেকে তা আশা করা দুরাশা! এ সমস্তই যে তার কাছে শুধু নাম-পঠন-অযোগ্য অক্ষরের মতো কালের পটে কতকগুলো আঁচড়। তার জন্য একমাত্র সত্য শাস্ত্রবচন। অথবা তাও ঠিক না; শাস্ত্রবচনের পিছনে যে সত্য— ও শ্রেয়ঃ অন্বেষী মানবচিত্তের

স্পন্দনের অপূর্বতা রয়েছে শাস্ত্রবচনের মাহাত্ম্য-উপলব্ধির সেই দ্বার তার জন্য যে রুদ্ধ। প্রকৃত সম্মোহিতের মতো তার জন্য একমাত্র সত্য প্রভুর হুকুম —স্থূলবুদ্ধি শাস্ত্রব্যবসায়ী প্রভুর হুকুম। সেই প্রভুর হুকুমে কখনো কখনো ভবিষ্যতের অসংলগ্ন স্বপ্ন সে দেখে কখনো 'প্যান ইসলাম এর স্বপ্ন, কখনো এই তের শত বৎসরের সমস্ত ইতিহাস, সমস্ত বর্তমান পরিবেষ্টন, যেন যাদুমন্ত্রে উড়িয়ে দিয়ে সেই তেরশত বৎসরের আগেকার 'শরীয়ত' এর হুবহু প্রবর্তনার স্বপ্ন। কত নিদারুণ তার জীবনের পক্ষে এই প্রভুর হুকুম তার প্রমাণ এইখানে যে, এর সামনে তার সমস্ত বুদ্ধি বিচার স্নেহ প্রেম শুভেচ্ছা, সমস্ত স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব, আশ্চর্যভাবে অন্তর্হিত হয়ে যায়, সে যে চিরদাস, চিরঅসহায়, অত্যন্ত অপূর্ণাঙ্গ মানুষ, এই পরম বেদনাদায়ক সত্য ভিন্ন আর কিছুই তার ভিতরে দেখবার থাকে না।

কিন্তু এই সম্মোহন আজ যত প্রবল চেহারা নিয়েই দাঁড়াক, অনুসন্ধান করলে বুঝতে পারা যাবে, এ নূতনই নয়, —পুরাতনও বটে। মনে হয়, এ সম্মোহনের এক বড় কারণ হজরত মোহাম্মদের মহাজীবনই। সে জীবন তপস্যায়, প্রেমে, কর্মে বিচিত্র, ও বিরাট; নানা দুঃখ দহনের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসার ফলে প্রখর ঔজ্জ্বল্য; তার উপর তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য মানুষের হয়েছে। সাধারণ মানুষ তো চিরকালই পৌত্তলিক; কিন্তু হজরত মোহাম্মদের ব্যক্তিত্বের এই প্রাখর্যের জন্যই হয়ত মুসলমান ইতিহাসের অনেক শক্তিধর পুরুষও তার সম্মোহনের নাগপাশ এড়িয়ে যেতে পারেন নি। —হজরত ওমর ও ইমাম গাজ্জালির কথা বলতে চাই। হজরত ওমরের ভিতরে দেখা যায়, তিনি তাঁর প্রকাণ্ড পৌরুষকে যেন আর সব দিকে লৌহ-আবেষ্টনে বন্ধ করে শুধু হজরত মোহাম্মদের অনুবর্তিতার পানে উন্মুখ রেখেছিলেন; সত্য আর হজরত মোহাম্মদের সাধনা এক ও অভিন্ন এই-ই যেন তাঁর মনোভাব। তাঁর নিজের জীবন সাধনার জন্য এই একান্ত অনুবর্তিতার প্রয়োজন সব চাইতে বেশী ছিল কিনা সে জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক, কেননা, মুসলমান জগতের সামনে মাত্র একজন বিশিষ্ট সাধক তিনি নন, তাঁর চাইতে সাধারণত তাঁর সমাদর এইজন্য যে, সর্বসাধারণ মুসলমানের জন্য তিনি এক অতি বা আদর্শ। ইমাম গাজ্জালিও তেমনিভাবে দেখা যায় দর্শনচর্চার বিরুদ্ধে এই অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করেছেন— সাপুড়ে তাঁর অল্প বয়স্ক পুত্রের সামনে সাপ খেলায় না, তাঁর ভয় এই, সে তাঁর বাপের অনুকরণ করতে গিয়ে বিপদ ঘটাবে; সর্বসাধারণের জন্য দর্শনচর্চাও এমনিভাবে বিপজ্জনক।[৭৯] —সর্বসাধারণের জন্য শাস্ত্রানুগত্যেও যে বিপদ কিছুমাত্র কম নয়,

---

৭৯. Confessions of Al Ghazzali নামক পুস্তক দ্রঃ।

তাতে তাদের সত্যানুসন্ধিৎসায় গ্লানি পৌছিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী, নিজে দার্শনিক আর সাধক হয়েও সে দিকে যে তিনি দৃষ্টি রাখেন নি তার স্বপক্ষে এই সামান্য কথা বলা যেতে পারে যে, তাঁর যুগে এ প্রতিবাদের হয়ত প্রয়োজন হয়েছিল,—বৃথাতর্কের প্রবণতা ঘুচিয়ে দিয়ে সত্যান্বেষীকে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন হজরত মোহাম্মদের মহাদৃষ্টান্তের। তবু গোটা দর্শন চর্চার বিরুদ্ধে তাঁর যে প্রতিবাদ তাকে অত্যন্ত দোষাবহ বলা ভিন্ন উপায় নেই। যুক্তি বিচার যতই অপূর্ণাঙ্গ হোক, জীবনপথে বাস্তবিকই এ যে মানুষের এক অতি বড় সহায়। এর সাহায্যের অভাব ঘটলে পূর্বানুবর্তিতা পাষাণভাবের মতনই মানুষের জীবনের উপরে চেপে বসে, দেখতে দেখতে তার সমস্ত চিন্তা ও কর্ম প্রবাহ শুষ্ক ও শীর্ণ হয়ে আসে।—কর্মে আত্মপ্রকাশ মানুষের প্রকৃতি চায়, এই-ই তার জন্য কল্যাণকর আর এই কর্মচেষ্টার জীবনে পূর্বানুবর্তিতা যে মানুষের পরম কাঙ্ক্ষিত কে না তা জানে। তবু মানব-প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও বহুধা সার্থকতার কথা মন থেকে দূর করে দিয়ে কর্মের আয়োজন যেখানে মানুষ করে সেখানে সে যে মরণের আয়োজনই করে চিন্তাশীলেরা একথা আজ বিশ্বাস করেন।

ইসলামের ইতিহাস বহুল পরিমাণে এক ব্যর্থতার ইতিহাস। হজরত মোহাম্মদের সংযমের সাধনা তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরই আরবের আদিম উচ্ছৃঙ্খলের ও পারস্যের বিলাস-মত্ততার আবর্তে পড়ে বিপর্যয় ভোগ করেছিল। সে- বিপর্যয় সামলে নিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করবার অবসর খুব কমই তার ঘটেছে। হয়ত সেই জন্যও কিছু বাড়াবাড়ির ছবি মুসলমান-ইতিহাসের প্রায় সব পর্যায়েই আমাদের চোখে পড়ে —কখনো চরম উচ্ছৃঙ্খলতার বাড়াবাড়ি, কখনো অন্ধ অনুবর্তিতার বাড়াবাড়ি। তবু হজরত মোহাম্মদের সাধনার পথে উদার বিচার-বুদ্ধি নিয়ে সহজ ছন্দে বেড়ে উঠলে মানুষের জীবনে যে কি অলৌকিক মহিমা প্রকাশ পায়, সৌভাগ্যবশত তার দৃষ্টান্তও মুসলমান-ইতিহাসে খুব বিরল নয়। মুসলমান সমাজ নূতন করে তাঁদের মাহাত্ম্যের কাহিনী পাঠ করবে যেন তারই অপেক্ষায় বিশ্বজগতে সৌরভ ছড়িয়ে অথচ নিজেদের ঘরে কতকটা অবহেলিত হয়ে নীরব মহিমায় তাঁরা বিরাজ করেছেন। বিশ্ববরেণ্য শেখ সাদী এই পুণ্যশ্লোক মুসলমানদের অন্যতম। তাঁর যে সমস্ত আনাড়ম্বর অথচ প্রাণ—ও বিশ্বাস-সঞ্চারী বাণী হজরত মোহাম্মদের তৌহীদ ও বিশ্ব-কল্যাণের সাধনাই ভব বিহ্বল হয়ে নয়, অন্ধ অনুবর্তিতার পথেও নয়,—সবল মনুষ্য প্রকৃতি ও উদার বিচার-বুদ্ধির পথে। মনীষী তিনি, সত্যদ্রষ্টা তিনি, মানুষকে তিনি দেখেছেন জাতি-ধর্মের, আচার-আড়ম্বের সমস্ত আবরণ ভেদ করে, সেই মুক্ত অবিচলিত দৃষ্টিতেই তিনি চেয়েছেন হজরত মোহাম্মদের পানে; দেখেছেন, মানুষের বিচিত্র আশা-

আকাঙ্ক্ষার, বেদনা-সম্ভাবনার, কি আশ্চর্য স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য-সাধন সে-জীবনে ঘটেছে, সেই জন্য তা কি সুন্দর, কি উজ্জ্বল কি বজ্ররোধী দৃঢ়তা তার অঙ্গে অঙ্গে-সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে তা মানুষের কত অবলম্বনযোগ্য! আর যদি জ্ঞানে ও মনুষ্যত্বে বিকশিত হয়ে জগতের কাজে লাগবার আকাঙ্ক্ষা মুসলমানের অন্তরে জাগে তখন এই মহামনীষী সাদী হবেন তাঁদের একজন শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা। বুদ্ধি বিচার প্রভৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্বল বিসর্জন দিয়ে নতজানু হয়ে মহাপুরুষের পায়ে গড় হওয়া যে তাঁরও প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা নিবেদন নয়, তাঁর প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা নিবেদন হচ্ছে, প্রকাণ্ড এই জগতের উপর দাঁড়িয়ে তাঁর সাধনাকে সমস্ত প্রাণ ও মস্তিষ্ক দিয়ে গ্রহণ করায়, এই সেই, অধিকারে, প্রয়োজন হলে, তাকে অতিক্রম করায়, সেই তত্ত্বের সন্ধান যাঁদের কাছ থেকে নব মুসলিমের লাভ হবে এই শ্রেষ্ঠ মুসলমান সাদী হবেন তাঁদের অন্যতম।[৮০]

জগতের জন্য ইসলামের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় নি। বরং ইসলামের যে একান্ত ঈশ্বরপরায়ণতা, সাম্য ও মৈত্রীর বীর্যবন্ত সাধনা, জগতের জন্য আজো সেই সমস্তেরই দারুণতম প্রয়োজন। কিন্তু এই কল্যাণময় ইসলামকে বহন করে জগতের আর্তক্লিষ্ট নরনারীর সেবায় পৌছে দেবে কে? নিশ্চয়ই সেটি সেই কৃপার পাত্রের দ্বারা সম্ভবপর নয় যে, "আলেম" বলে নিজের পরিচয় দেয়, কিন্তু হৃদয়ের দ্বার যার সাংঘাতিকভাবে বন্ধ! শত শত বৎসরের পুরাতন বিধিনিষেধের তুচ্ছ তালিকা থেকে চোখ উঠিয়ে আল্লাহর এই জীবন্ত সৃষ্টির অন্তহীন সুখ দুঃখ ব্যথার উত্তরাধিকার বংশসূত্রে নির্ণীত হয় না, গতানুগতিক শিষ্যত্ব-সূত্রেও নির্ণীত হয় না, হয় সাধনা-সূত্রেই। সাধক যে, নিজের রসনা দিয়ে সত্যের অমৃতস্বাদ গ্রহণ করবার আকাঙ্ক্ষা যাঁর চিত্তে জাগে, তাঁরই চোখে কেবল পূর্ববর্তীর সাধনার দ্বার উদঘাটিত হয়, আর যে বেদনায় ও শ্রদ্ধায় সেই সাধনাকে বহন করে নব নব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করে তাকে সার্থকতা দান করতে হয়, সেই পরম সৌভাগ্য অধিকারও তাঁর জন্মে। সেই সাধনার দ্বারা শক্তি ও যোগ্যতা অর্জনের কথা বিস্মৃত হয়ে মুসলমান হজরত মোহাম্মদের বিরাট তপস্যাকে বহন করতে গিয়েছিল শুধু অন্ধ অনুবর্তিতার লাঠিতে ভর দিয়ে! সে যে পিষ্ট পর্যুদস্ত হবে, তার মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্ত হবে, এ তার অপরিহার্য পরিণাম। সেই তপস্যাহীন, সুতরাং অর্ধবিকশিত মানুষ, মুসলমানই জগতের দুঃখ ব্যাধিতে ইসলামের সেবা পৌছে

---

৮০. সাদীর একটি অতি প্রসিদ্ধ বাণী এই "তরিকত বজুজ খেদমতে খলক নিসত বতসবিহ ও সাজ্জাদও দলক নিসত ; "সৃষ্টির সেবা ভিন্ন ধর্ম আর কিছু নয়। তসবিহ্ জায়নামাজ ও আলখাল্লায় ধর্ম নেই।—বোধ হয় এই বাণীটিই রাজা রামমোহন রায়ের অত্যন্ত প্রিয় ছিল ; নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত রামমোহনের জীবনী ৫২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দিতে হাত বাড়াতে পারবে, এ মোহ যে আজো আমাদের চিন্তা ও কর্মের নেতাদের অন্তরে প্রবল, একটা গৌরবময়-অতীতের-অধিকারী সম্প্রদায়ের পক্ষে এর বড়ো লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? আল্লাহর এ জগৎ বিরাট, অনাদ্যন্ত হর্ষে ক্ষোভে, ব্যথায় আনন্দে, এ বিচিত্র, এই বিরাট বাস্তবতার সঙ্গে যে যোগযুক্ত নয় জীবনে শ্রেয়োলাভের আসল দরজা তাঁর জন্য বন্ধ, নূতন করে এই সত্য আমাদের চিত্তে প্রেরণা সঞ্চার করুক; আমাদের দেহকোষাণু সমূহ অক্সিজেন-সংস্পর্শে প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ ও পুণর্গঠিত হয়, এমনি করেই দেহ সবল ও কার্যক্ষম থাকে, আমাদের চিত্তকেও তেমনিভাবে নব নব জ্ঞান ও প্রেরণার দহনে নিরন্তর দগ্ধ ও সঞ্জীবিত করতে হয়, নইলে জড়তার আক্রমণ প্রতিরোধে অসমর্থ হয়ে তা সম্পূর্ণ অকর্মণ্য ও জীবনের পক্ষে অভিশাপের মতো হয়ে দাঁড়ায়,—নতুন করে এ জ্ঞানের দহনে আমাদের সমস্ত জড়তা ভস্মীভূত হয়ে যাক; আর আমাদের চিত্ত বল সঞ্চার করুক এই নব বিশ্বাস যে, মানুষের চলার জন্য বাস্তবিকই কোনো বাঁধানো রাজপথ নেই,—জগৎ যেমন এক স্থানে বসে নেই মানুষও তেমনি তার পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনকে নিয়ে একস্থানে স্থির হয়ে নেই আর এই পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনের ভিতর দিয়ে পথ করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন অন্ধ অনুবর্তিতার নয়, সদাজাগ্রতচিত্ততার। হয়ত তাহলে আমাদের চোখের সম্মোহন ঘুচে যাবে। তখন জগতের সঙ্গে আমাদের অপরিচয়ের পর্যায়ের অবসান হবে। তখন হয়ত সহজ দৃষ্টিতেই আমরা দেখতে পাব, বিপুলা এ পৃথিবীর কত বিচিত্র প্রয়োজনে কত ধর্ম, কত নীতি, কত সভ্যতা কোন সভ্যতা কোন অনাদি কাল থেকে তার কোলে জন্মলাভ করে আসছে, আর এই অনন্ত জন্মপ্রবাহে ইসলামের অর্থ কি, তার নব নব সম্ভাবনা ও সার্থকতা কোন পথে। তখন প্রীতিতে আর শ্রদ্ধায়ই আমরা অবলোকন করতে পারব, আমাদের প্রিয় হজরত মোহাম্মদের সাধনার সঙ্গে যে সমস্ত মহাপুরুষের সাধনার হুবহু মিল নেই তাঁরাও কেমন করে সত্যের চির-অমল চির-আনন্দপ্রদ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার যে গৌরব ও অমোঘ কার্যকারিতা, তখন জগৎ ও ইসলামের জন্য সেই শ্রেষ্ঠ সার্থকতার সন্ধানে আমাদের চিত্ত উন্মুখ হবে।

মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে ইসলামের কিছুমাত্র বিরোধ নেই। বরং ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, ইসলামের যে প্রাণভূত তৌহীদের সাধনা, মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর আল্লাহকে যে জানতে চায়, তার চিত্তে ভিন্ন বিচার, কাণ্ডজ্ঞান অপরের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি মুক্তির লক্ষণ আর কোথায় যোগ্যভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া, ইসলামের তৌহীদের সাধনা জগতে কল্যাণ ও মুক্তির সহায়তা করে এসেছে, ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। তৌহীদের বিশ্বাসী দার্শনিক ইবনে রোশদের (Averroes) লেখা দ্বাদশ শতাব্দীতে

ইয়োরোপীয় চিত্তে শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় সন্দেহ জন্মেছিল, প্রাচীন শাস্ত্রের বন্ধন থেকে বুদ্ধির এই মুক্তির স্থান ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসে অনেকখানি; মধ্যযুগের ঘোর তামসিকতার ভিতরে নানক, কবীর প্রভৃতি ভক্ত সত্যকার আধ্যাত্মিকতার দীপ ভারতে পুনঃ প্রজ্জলিত করেছিলেন, তাঁদের সামনেও শিখারূপে জ্বলেছিল ইসলামের তৌহীদ ও সাম্যবাদ; আর বাঙালি মুসলমানের জন্য সব চাইতে বড় সুসংবাদ এই যে, ভারতের নবজাগরণের যিনি আদি নেতা সেই মহাত্মা রাজা রামমোহনের উপরে ইসলাম আশ্চর্যভাবে প্রভাবশালী হয়েছিল। বাংলার চণ্ডীমণ্ডপের অবরুদ্ধতা ও নিরুদ্বেগের ভিতরে তিনি যে প্রবাহিত করতে পেরেছিলেন সকল কাণ্ডজ্ঞান, চিন্তা ও কর্মের বিশ্বধারা, সে সমস্তের যোগ্য প্রেরণা চিত্তবিকাশের মহামুহূর্তে তাঁর লাভ হয়েছিল হজরত মোহাম্মদের সাধনা থেকে, —তাঁর প্রচলিত তৌহীদ, সাম্য, নরনারী নির্বিশেষে সবারই জীবনের মর্যাদাবোধ, আধুনিক যুগের এই মহাপুরুষের কল্যাণ ও মুক্তির পথে অমূল্য পাথেয়রই কার্য করেছিল।

কিন্তু, "চেরাগকে নিচে আন্ধেরা!" সেই ইসলামের অনুবর্তী বলে আজ যারা নিজেদের পরিচয় দেয়, সমস্ত রকমের মুক্তির সঙ্গে তারা অপরিচিত। —কেন এমন হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমাদের নূতন কোনো কথা বলবার নেই। সত্য ও সত্যসাধকের মহৈশ্বর্যময় প্রকাশের সামনে মুসলমান চকিত সম্মোহিত হয়েছে, জগতের সমস্ত সাধনাকে জীবন গঠনের উপাদানরূপে ব্যবহার করা যে মানুষের চিরন্তন অধিকার, সে কথা সে শোচনীয়রূপে বিস্মৃত হয়েছে— বার বার এই কথাটাই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে; একটা বড় সম্প্রদায় হিসাবে এই-ই মুসলমানের চরম দুর্ভাগ্য যে, তার যে সমস্ত পরমাত্মীয় পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য-প্রকৃতি নিয়ে গভীর শ্রদ্ধা ও গভীর আত্মবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ইসলাম ও হজরত মোহাম্মদের দীপ্তিতে অন্ধ হয়ে সম্মোহিত হয়ে আস্ফালন করেছেন তাঁদের প্রচণ্ডতা, তাকে আকৃষ্ট করেছে, বেশী, আর আজ পর্যন্ত সেই আকর্ষণই তার পক্ষে প্রবলতম!

তবে, শুধু নৈরাশ্যে একান্ত ম্রিয়মান না হলেও আধুনিক মুসলিম সাধকদের চলে। একটা বড় সত্যসাধনার পূর্ণ পরিস্ফুটনের জন্য তের শত বৎসর খুব দীর্ঘকাল নয়। বিপুল ভবিষ্যৎ তাঁদের সামনে। সেই ভবিষ্যতে ভীত সম্মোহিত মুসলমানের পরিবর্তে মুক্তদৃষ্টি ভূমার প্রেমিক মুসলমানকে জগৎ পাবে, তা করে' বিশ্বমানবের আত্মপ্রকাশের চিরসংগ্রামে এক দৃঢ় মেরুদণ্ড-সমন্বিত অকুতোভয় সৈনিক জগতের লাভ হবে, ইসলামও এক অপূর্ব সার্থকতার শ্রীতে মণ্ডিত হবে— এই আশায় ও বিশ্বাসে তাঁরা তাঁদের অতীত ও বর্তমানের সমস্ত ব্যর্থতা ও লজ্জা বহন করতে পারেন।

জৈষ্ঠ, ১৩৩৩

রামমোহনের তিরোধানের পরে ১১৬ বৎসর গত হলো। এই কালে তাঁর জন্মভূমি বাংলায় বহু শক্তিমানের জন্ম হয়েছে; ধর্ম সাহিত্য স্বদেশসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁদের কয়েকজন শুধু বাংলায় বা ভারতে নয়, জগতে বরেণ্য হয়েছেন। যে কোনো দেশ বা জাতির জন্য এমন একটা যুগ গৌরবের যুগ।

এই মহাগৌরবময় যুগের প্রবর্তয়িতা রামমোহন। সে-সম্মান তাঁকে সবাই অকুণ্ঠিতচিত্তে নিবেদন করে থাকেন। আজকার এই স্মরণ-বাসরে, যদি শুধু এই ব্যাপারটাই আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি তবে তাতেও তাঁর মহিমা-কীর্তন কম হবে না। কাল তো চির পরিবর্তনশীল। বহুকাল পূর্বে গ্রীক দার্শনিক বলেছিলেন, আমরা একই নদীতে দুইবার স্নান করি না। জীবনের সব ক্ষেত্রেই এ স্বীকৃত সত্য। তাই রামমোহন যদি বাংলার ও ভারতের এই গৌরবযুগের প্রবর্তয়িতা মাত্র হন, অন্য কথায়, তাঁর দেশ যদি কর্মে ও চিন্তায় কালে কালে এতখানি ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করে থাকে যে তাঁর সেই শতবর্ষ পূর্বের নির্দেশ তার জন্য আর সার্থক নির্দেশ বলে' গণ্য করা সম্ভবপর না হয়, তবে তাও তাঁর জন্য শোচনীয় নয়, বরং শ্লাঘনীয় পুত্র ও শিষ্যের কাছে পরাজিত হওয়া তো মানুষের সৌভাগ্যের কথা।

কিছুদিন থেকে আমাদের কোনো কোনো খ্যাতনামা লেখক রামমোহনের সাধনার এই ধরনের মূল নিরূপণে ব্যাপৃত আছেন। তাঁদের চেষ্টার ফলে যদি জাতির সাধনা ও সম্ভাবনার ছবি স্পষ্টতর হয়, নব নব সার্থকতার পথে তার প্রেরণা লাভ হয়, তবে তাঁরা জাতির ধন্যবাদার্হ হবেন নিঃসন্দেহ। তাঁদের প্রধান বক্তব্য দাঁড়িয়েছে এই রামমোহন শক্তিমান নিঃসন্দেহ; খ্যাতিমানও যথেষ্ট; কিন্তু জাতির হৃদয়-সিংহাসনে তাঁর আসন লাভ ঘটেনি। সেই আসন বাংলাদেশে বিশেষভাবে লাভ হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের, আর বিশাল ভারতে মহাত্মা গান্ধীর। জাতির মন-প্রাণ-আত্মার সত্যকার নেতৃত্ব এঁদেরই লাভ হয়েছে, যদিও দেশের একালের জাগরণ সূচিত হয়েছিল রামমোহনের দ্বারা।

এঁদের বিচার উপেক্ষণীয় নয়। যে সমস্ত নেতার জনপ্রিয়তার কথা এঁরা বলেন তাঁরা যে দেশের আপামর সাধারণের সমাদর রামমোহনের চাইতে অনেক বেশী লাভ করেছেন তা অনস্বীকার্য। তাছাড়া এঁরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের, অসাধারণ শক্তিমানও বটে। এঁদের মধ্যে তিন জন তো বিশ্ববরেণ্য। কাজেই এঁদের মতো পূজনীয় ব্যক্তি যদি জাতির সত্যকার সমাদর লাভ করে' থাকেন তবে রামমোহনের বিদেহ আত্মার প্রসন্নতার কারণই তো সেটি হয়েছে, কেননা তা হলে জাতি উন্নতির পথে নিশ্চিতরূপেই অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু এইখানেই যে সমস্যা। বৃক্ষঃ ফলেন পরিচীয়তে— সেই ফলের পরিচয় এই নূতন মূল্য-নিরূপয়িতাদের অনুকূলে নয়। কিছুদিন পূর্বে দেশে মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল; সেদিনে দেশের অনেক-শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে-কালোবাজারী মুনাফায় দেহ মন উৎসর্গ করেছিল; এই সব মহাপুরুষের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা সেই দুর্গতি থেকে তাদের রক্ষা করতে পারে নি। তারপর এসেছে দেশের স্বাধীনতা। সে-স্বাধীনতা আজো যে দেশের সর্বসাধারণের জন্য সার্থক হয়ে উঠলো না তার মূলে অবশ্য এমন কতকগুলো কারণও আছে যার উপরে দেশের লোকের হাত নেই। কিন্তু এমন অনেকগুলো কারণও আছে যার প্রতিকার দেশের লোকের করায়ত্ত। সেই কল্যাণ-চেষ্টা, জনগণের প্রতি দায়িত্ব, সর্বসাধারণের কথা থাকুক দেশের শিক্ষিতদের মনেও কি সক্রিয় হয়েছে! —যে শিক্ষিত-সমাজ ইংরেজের সঙ্গে লড়াই কম করেনি, আর বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর প্রতি যাদের অনুরাগের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ করবার কোনো হেতু নেই! কেন এমন হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বুঝতে দেরী হয় না, এই সব বরেণ্যের এমন জনপ্রিয়তা লাভের মূলে তাঁদের ধর্মবোধ মনীষা বা মহাপ্রাণতা নয়, এর মূলে বরং তাঁদের কোনো কোনো কথায় ও আচরণে দেশের শিক্ষিত-সমাজের এবং কখনো কখনো অশিক্ষিত-সমাজের আত্ম-অভিমান যে লালিত হবার সুযোগ পেয়েছে সেই ব্যাপারটি। এ ব্যাখ্যা ভিন্ন পরীক্ষার দিনে তাঁদের অনুরাগীদের এমন শোচনীয় পরিচয়ের আর কোনো হেতু খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। বায়ুমণ্ডলের কার্যক্ষমতার উপরে নির্ভর করে তার চারপাশের শিক্ষিত-সমাজের গুণগ্রাহিতার উপরে। আমাদের দেশের শিক্ষিত-সমাজ আমাদের একালের বরেণ্য নেতাদের তপস্যা কি ভাবে ব্যর্থ করেছে সে-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা কিঞ্চিত বিস্তৃত করে' বললে হয়ত অসঙ্গত হবে না।

রামমোহনের কথা ধরা যাক। কি নির্দেশ তিনি রেখে গেলেন দেশের লোকদের সামনে? সৌভাগ্যক্রমে তাঁর রচনা দুষ্প্রাপ্য নয়; তাই কোনো ব্যাখ্যা তার উপরে নির্ভর না করে' যে কেউ ইচ্ছা করলে তাঁর মতামতের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে তাঁর নির্দেশ এই : (ক) পৌরাণিক দেবদেবীর আরাধনার পরিবর্তে উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ও যুক্তিযুক্ত কল্যাণ-ক্রমের অনুষ্ঠান; (খ) প্রাচীন শাস্ত্র অশ্রদ্ধেয় নয় কিন্তু তার ব্যাখ্যা করতে হবে বিচারবুদ্ধি ও লোকশ্রেয়ের আলোকে— অনিষ্টকর আচার প্রাচীন হলেও বর্জনীয়। কিন্তু তাঁর নির্দেশের প্রতিক্রিয়া দেশের শিক্ষিতদের উপরে কি হলো? তাদের মধ্যে যারা তাঁর বিরোধী হলো—তারাই সংখ্যায় অনেক বেশী— তারা সোজা বললে: চিরাচরিত আচার বিসর্জন সম্ভবপর নয়, বিসর্জন দিলে সমাজশৃঙ্খলায় ব্যাঘাত

হবার সম্ভাবনা। আর যারা তাঁর অনুরাগী হলো তাদের উপরে প্রতিক্রিয়া এই হলো যে তারা প্রতীক-চর্চার প্রতি বিমুখ হলো সোৎসাহে, কিন্তু উন্মুখ হলো লোকশ্রেয়ের দিকে তত নয় যত ভগবদ্ ভক্তির আতিশয্যের দিকে। রামমোহনের ঈশ্বরানুরাগের অথবা ব্রহ্মানুরাগের সঙ্গে লোকশ্রেয় নিত্যযুক্ত, সেই চিরন্তন উদার পথ তাঁর অনুরাগীদের জগতে এই ভাবে বেঁকে গেল।

রামমোহনের পরে মহাসাধক রামকৃষ্ণ। রামমোহন পৌরাণিক ধর্ম পরিত্যাগ করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন; রামকৃষ্ণ নিজের অপূর্ব সাধনায় নিঃসন্দেহ হলেন পৌরাণিক ধর্ম পরিত্যাগের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। কিন্তু রামকৃষ্ণের সাধনা কি সত্যই প্রচলিত পৌরাণিক ধর্মের সাধনা? যে দেবতার আরাধনা তিনি করলেন তাঁর কাছে কি বর তিনি চাইলেন? ভক্ত তার দেবতার কাছে সাধারণত যে সব বর চায় সেই ধন জন মান স্বর্গ এমন কি মুক্তিও তিনি চাইলেন না, তিনি চাইলেন অচলা ভক্তি। দেশের লোক চমৎকৃত হলো তাঁর এমন তপস্যা দেখে। কিন্তু চমৎকৃত হয়ে এই মহাতাপসের কাছ থেকে কোন দীক্ষা তারা গ্রহণ করলে? তাঁরই মতো আচলা ভক্তির দীক্ষা কি? না, তা নয়। তারা চলচ্চিত্ত হয়েছিল সংস্কারকদের সমালোচনায় এঁকে দেখে নতুন করে' তারা প্রতিষ্ঠিত হলো সনাতন ধারায়, নিঃসন্দেহ হলো সংস্কারকদের চেষ্টায় অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে। আর বিবেকানন্দের অপূর্ব আবিষ্কার 'দরিদ্র-নারায়ণ' তাঁর অগণিত দেশবাসীর জন্য এটি হলো একটি সুন্দর কথা মাত্র; সে প্রমাণ তারা নিঃশেষে দিলে গত পঞ্চাশের মন্বন্তরে। তাঁর যে সব কথা সত্যই তাদের মর্ম স্পর্শ করল তার একটি এই ভারতকে ইয়োরোপের আচার্য হতে হবে। এদের পরে বাংলার শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নেতা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর অনুরাগীরা দেখলে হিন্দুত্বের নবসংস্থানরূপে তাঁর হিন্দুত্বের অন্তরে যে ছিল সুনিবিড় মানবিকতা, সুগভীর ধর্মবোধ, সে-সব তদের চোখে কমই পড়লো। আর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমুখিতাকে তাঁর অনুরাগীরা বুঝলে ইয়োরোপমুখিতা বলে'— তার বিশ্বমুখিতার অর্থ সে সত্যমুখিতা, প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে নিবিড় মৈত্রী-বন্ধন, মানুষের জন্য সুগভীর কল্যাণ-কামনা, সে-সব অর্থ পূর্ণ হলো না তাদের চিন্তায়। পরিশেষে মহাত্মা গান্ধীর জনশ্রদ্ধালাভের কথা ভাবা যাক। তাঁর সাধনার প্রধানত দুটি স্তর। প্রথম স্তরে তিনি সব ধর্মকেই জানতেন স্বয়ং-সম্পূর্ণ বলে। দ্বিতীয় স্তরে তিনি ভগবান বলতে বুঝলেন সত্য : প্রত্যেক কর্মকেই জানলেন কিছু কিছু ত্রুটিপূর্ণ আর সেজন্য প্রত্যেক ধর্মের মহত্তর বিকাশ প্রয়োজনীয় জ্ঞান করলেন, ধর্ম বলতে তিনি বুঝলেন নিরবচ্ছিন্ন ও নিষ্কলুষ সত্য-প্রীতি ও জগৎ-হিত সাধনা, —কোনো সাম্প্রদায়িক বা আচারপরায়ণ জীবন নয়। কিন্তু অগণিত জনচিত্তে তিনি লাভ করলেন কী রূপ? তাঁর অপূর্ব সত্য-প্রীতি,

মানবপ্রীতি, জীবপ্রীতি তাঁর অনুরাগীদের অনুধাবনের বিষয় হলো না। তাদের জন্য সত্য হলো তাঁর মূর্তির ও স্মৃতির সাড়ম্বর পূজা-প্রদক্ষিণ, তাঁর জগৎজোড়া খ্যাতির অংশীদার এইভাবেই তারা হলো।

কিন্তু কেন এমন হলো? বলা কঠিন। দেখা যাচ্ছে কয়েক শত বৎসর পূর্বে কবীর দুঃখ করে' বলছেন দেশের হিন্দু ও মুসলমানের সৎমতি হোক এজন্য বহু চেষ্টাই তিনি করলেন, কিন্তু

হিন্দু পূজে দেবতা
তুর্ক কাহু না হোঈ

হিন্দু কেবল দেবতারই পূজো করে, আর মুসলমানের কারো জন্য মায়া মমতা নেই। অথবা সমস্যাটা এর চেয়ে গুরতর। বর্তমানকালে বৃহত্তর জগতে দেখা যাচ্ছে মানুষের এত কালের জ্ঞান বিজ্ঞান ও মনুষ্যত্বের সাধনার পরে মানুষের ভিতরকার আদিম বর্বরই প্রবল হয়ে উঠেছে—ভোগ ও প্রধান্য-স্পৃহা, চক্রান্ত, জিঘাংসা আজ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে মানুষের কাম্য হয়ে উঠেছে।

তা বৃহত্তর জগতের কথা থাকুক। যারা কাজ করতে চায় তাদের সংহত হতে হয় বিভিন্ন কেন্দ্রে। যারা বিশ্বাস করে দেহই মানুষের বড় ব্যাপার, তার প্রয়োজন মিটিয়ে যদি সময় পাওয়া যায় তবে 'আত্মা' 'সত্য' এ সব কথা ভেবে দেখা যেত পারে, তাদের পথ তারা অনুসরণ করে' চলেছে। কিন্তু আমরা যারা বিশ্বাস করি আত্মা, অর্থাৎ মনোজীবন, যদি সক্রিয় না হয়, সত্য যদি সম্পুজিত না হয়, তবে কোনো প্রাচুর্যেই মানুষের কল্যাণ নেই, তাদের কি কর্তব্য? তারা কোন কেন্দ্রে সংহত হবে?

অতন্দ্রিত জ্ঞান ও লোকশ্রেয়ের পথের মহাপথিক রামমোহনের স্মরণ-দিনে আমরা, তাঁর অনুরাগীরা, যদি এই প্রশ্নটি যথাযথভাবে নিজেদের অন্তরাত্মার সামনে উপস্থাপিত করতে পারি তবে তাতে করেই সেই অমরবীর্য সাধকের প্রতি আমাদের সত্যকার শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে; আমরা নিজেরাও সার্থকতার পথে সুনিশ্চিত পা বাড়াবো। কেননা বড় কথা দলে ভারী হওয়া নয়, বড় কথা অন্তরাত্মাকে সক্রিয় করে' তোলা সত্যদৃষ্টি ও দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর মতো মহাজন দেশে বিপুলভাবে আদৃত হয়েও ব্যর্থ হচ্ছেন এই বড় কারণে যে তাঁদের তপস্যা সক্রিয় হতে পারে নি তাঁদের অনুরাগীদের অন্তরাত্মায়, তাঁরা বরং ব্যবহৃত হয়েছেন তাদের অভিমান, মুখ্যত স্বধর্মের অভিমান, চরিতার্থতার কাজ। কিন্তু অভিমান তাদের জীবনে অনর্থ না ঘটিয়ে কি আর করবে? অভিমান কেন, স্বদেশ-প্রীতির মতো মূল্যবান ভাবও মানুষকে সত্যকার কল্যাণ-পথে বেশী দূর এগিয়ে নিতে পারে না যদি সেই

স্বদেশ-প্রীতি গূঢ়ভাবে যুক্ত না থাকে সত্য-প্রীতি ও সর্বমানব-প্রীতির সঙ্গে। রামমোহনের নিরাকার পরমব্রহ্ম ও লোকশ্রেয়ের সাধনা স্বরূপত অতন্দ্রিত সত্য ও কল্যাণ-সাধনা, কোনো মোহকেই তা প্রশ্রয় দেয় না— না সাম্প্রদায়িক মোহকে, না অতীতের মোহকে, না অতি-প্রাকৃত মোহকে, জড়বাদ ও ভোগবাদের অন্ধতাকে ত নয়ই— তাই বহু পুরাতন ও বহুজটিল ভারতীয় জীবনের সার্থক নেতৃত্বের অধিকার তাঁরই তা যত বিলম্বে ও যত বিড়ম্বনার ভিতর দিয়েই দেশ সেকথা বুঝুক। কিন্তু আমাদের একালের অপূর্ব নব-জাগরণ আজ যখন ব্যর্থ হতে দাঁড়িয়েছে তখন আমাদের বিড়ম্বনা ভোগ যথেষ্ট হয়েছে ভাবা যেতে পারে; আশা করা যায় এবার দেশ তার পরমনির্ভরযোগ্য জ্ঞান-সাধক ও কল্যাণ-সাধকের মর্যাদা যথাযোগ্যভাবে বুঝবে; তার ফলে একালের অন্যান্য সব সাধকই যোগ্য সার্থকতা লাভ করবেন, যোগ্য মর্যাদায় ভূষিত হবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কথিত, ১৯৪৯

Collect More Books >
From Here

জীবনপঞ্জি

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ	বৈশাখ মাসের প্রথম শুক্রবার জন্ম।
(১৩০৯ বঙ্গাব্দ)	স্থান: নদীয়া ও বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার জগন্নাথপুর গ্রাম (মাতুলালয়)। পৈত্রিক তদানীন্তন বাসস্থান ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার বাগমারা গ্রাম। পিতামহ : কাজী ইয়াসিন আলী। পিতা : কাজী সৈয়দ হোসেন ওরফে ছগীর কাজী। মাইনর ক্লাশ পর্যন্ত লেখাপড়া। কোলকাতা রেলওয়েতে চাকুরী শুরু, হাওড়ার স্টেশন মাষ্টার হিসেবে সমাপ্তি। মাতামহ : পাঁচু মোল্লা। বাগমারার অদূরবর্তী হোগলা গ্রাম। প্রতাপশালী জোতদার। দুই পুত্র দারোগা, এক পুত্র শিক্ষা বিভাগের বড় চাকুরে।
১৯০৯	পাবনা ইনস্টিটিউশনে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি। প্রাথমিক শিক্ষাগুরু জগন্নাথপুর মাইনর স্কুলে, ষষ্ঠ শ্রেণী নরসিংদীর সাটিরপাড়া হাইস্কুল; অষ্টম-নবম শ্রেণী ঢাকা জেলার মুড়াপাড়া হাইস্কুল।
১৯১৩	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ। মাসিক দশ টাকা হারে বৃত্তি ও রৌপ্যপদক লাভ।
১৯১৬	বড় মামার মেয়ে জমিলা খাতুনের সঙ্গে বিয়ে।
১৯১৭	কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ।
১৯১৯	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. পাশ।
১৯২০	ঢাকার ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলার লেকচারার পদে নিযুক্ত।
১৯২৬	ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য-সমাজ প্রতিষ্ঠা।
১৯৩৫	বিশ্বভারতীতে 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধ' সম্পর্কে নিজামবর্তৃতা।
১৯৪০	টেক্সট বুক বোর্ডের সেক্রেটারী রূপে কলকাতায় গমন। কিছুকাল পরে রেজিষ্ট্রার অব পাবলিকেশন্স-এর দায়িত্ব লাভ।
১৯৪৭	দেশ বিভাগের পর কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত।
১৯৫২	সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। ওপরওয়ালাদের অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে দু-দুবার চাকরিতে ইস্তফা দান, শেষ পর্যন্ত সহকর্মীদের অনুরোধে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার।
১৯৫৪	স্ত্রীর মৃত্যু।
১৯৫৬	বিশ্বভারতীতে 'বাংলার জাগরণ' সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক বক্তৃতা দান।
১৯৫৭	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শরৎ স্মৃতি বক্তৃতামালা' প্রদান।
১৯৭০	শিশির কুমার পুরস্কার লাভ।
১৯ মে, ১৯৭০	মৃত্যু।